য়ার আলো

উপন্যাস

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীদিলীপকুমার রায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩৪৩

সাড়ে তিন টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীরঘুনন্দন দাস
মুদ্রিত—শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস
পণ্ডিচেরি

রাজা ধী[illegible]রায়ণ রায়

[illegible] করকমলে

ভাই ধীরেন!

একদিন গান[illegible]নে [illegible]জেই যারে করেছিলে তুমি বরণ

স্বপন-[illegible] বলি' এ-স্বপনহারা বসুন্ধরায়,

প্রাণখানি ত[illegible]নিলে দেখিতে—নাই নাই কভু তার মরণ

না চা[illegible] যে চিরসুরেলার শ্যামলমন্ত্র পায়।

দিলীপ

জুন, ১৩৪৩

ছায়ার স্বপ্নে-গাওয়া গান

আমার চেয়ে তুমি বড় এই কথাটি যদি জানি,
কী আসে যায় এ-জীবনে আর কিছু মানি না মানি?
এই জানাতে আজ যেন তাই
তিল-ফাঁকিও না পায় ঠাঁই,
তাহ'লে এ-সান্ধ্য জীবন পাবে তোমার জ্যোৎস্নাখানি :
দাহের পরে চিরঘুমের শান্তি পাবে অভিমানী ॥

চিন্তা-জ্বালা নিভিয়ে কি তাই আনলে নির্ভাবনার পারে?
যে-চোখে রোজ আমায় দেখি—যায় না দেখা হায় তোমারে!
অন্ধকারেই হারিয়ে আমায়
খুঁজব কেঁদে যখন তোমায়,
কালোর কোলেই আলোর চরণ-চতুর্দোলে নেবে টানি'
অতীত-মরণ পথে দিতে অনাগতের মন্ত্রবাণী ॥

অবিস্মরণে

A.E.

Though the crushed jewels drop and fade,
The Artist's labour will not cease,
And of the ruins shall be made
Some yet more lovely masterpiece.

বহ্নি-মণিকা যদি আজ নিভে যায়,
ব্রতী হবে নব সৃজনে রূপেশ্বর:
কালো অঙ্গার হ'তে সে যে পুনরায়
রচিবে মণিকা আরো আলোসুন্দর।

হাওড়ার স্টেশনে নেমে অসিত তো অবাক। সশরীরে রাজা উদার রায়! রাজাধিরাজ নাই হ'ল—রাজা তো! পিছনে রাজ-চক্রবর্তীর অনুবর্তী—সেক্রেটারি সুভদ্র বাবু—ভদ্রতার মূর্তিমান্ বিগ্রহ।

অবাক্ হবার ওর কারণ ছিল। উদারের সঙ্গে ওর আলাপ যদিচ বছর কুড়িরো উপর—গুনলে পঁচিশ না হোক চব্বিশের কাছাকাছিও উঠতে পারে—কিন্তু গত পাঁচ সাত বছরের মধ্যে অসিতের সঙ্গে উদারের দেখা হয়েছিল ক্বচিৎ। কেননা উদারের মাতামহ মহারাজ বিক্রম রায় অতিস্থবির হ'লে চাইতেন তাঁর উত্তরাধিকারী নাতিকে কাছে কাছে রাখতে। তাই অসিত যখন কলকাতা আসত উদার থাকত ওদের রাজধানীতে—বলেশ্বরে। শেষবার একেবারে অকস্মাৎ ওদের দেখা হয় শিলঙে-সেই দারুণ ১৯৩৯ সালে—মোটর-দুর্ঘটনার মাস খানেক আগে। কিন্তু সেও ক্ষণিকের জন্যে। উদারের অভ্যুদয় হয়েছিল ঝড়ের উদার ছন্দেই বটে কিন্তু তিরোধান হ'ল শীতের সুইডেনে সূর্যের মতন। "দেখতে দেখতে অন্ধকার—" উদারের দিলদরিয়া অট্টহাস্যের তিরোধানের পর ছায়াই বলেছিল কথাটা—শিলঙে—অসিতের আজো স্পষ্ট মনে আছে।

শিলঙের সে-দিনটার কথা অসিত ভুলবে না। উদারের ধরণ-ধারণ ভোলা শক্ত। ছায়াকে ও শেখাচ্ছে ওর সবে-বাঁধা গান "রূপে বর্ণে ছন্দে আলোকে আনন্দে—"এমন সময়ে হঠাৎ ওর

অভ্যুদয় প্রকাণ্ড রোল্‌স রয়েস মোটরযানে, সঙ্গে বরকন্দাজ ও সুভদ্রবাবু। আর বরকন্দাজের হাতে ওর নিত্যসঙ্গী সেই রাজকীয় রুপালি ফরশি। এর পরেই ওর মনে পড়ে ঐ শিলঙেই সেদিন সন্ধ্যাবেলা মোটরে বেড়িয়ে ফিরতে অসিতের সঙ্গে উদারের ফের দেখা—দুজনে দুখানা মোটরে। উদার হেঁকে বলেছিল: "দাঁড়াও অসিত।" দুটো মোটর দাঁড়িয়ে পাশাপাশি পোস্টাফিসের সামনে। উদার সহাস্যে "এতবড় সুযোগ ছাড়া নয়" ব'লেই ওর ফরশির নল বার ক'রে ওর হাতে সমপণ ও অসিতের হাসিমুখে তাম্রকূট-সেবন। ও-মোটরে ফরশি এ-মোটরে বাবু। সঙ্গে ছিল ছায়া, সে তো হেসে কুটি কুটি। "এর নাম কী দেব ভাই?" উদার জলদমন্দ্রে বলেছিল: "Making history —দুই বন্ধুতে. এ-দিনদুনিয়ায় নানা কাজ করেছে প্ল্যান ক'রে কিন্তু এ কেউ করে নি সৃষ্টির আদিম মানবচেতনার সূর্যোদয় থেকে—আমি বাজি রেখে বলতে পারি।" দেবদা তথা প্রীতিও হেসে অস্থির। কেবল প্রতিমা বলেছিল "ও"। এ-ধরণের রাজকীয় মেজাজ সে বেচারি তো দেখেনি এর আগে কখনও।

অসিত ফরশিতে টান দিতে দিতে বলেছিল: "জানো উদার! আমার এক আইরিশ বান্ধবী প্রায়ই আমাকে বলতেন যে আইরিশ-দের প্রাণবস্তুটি ঝড় দিয়ে তৈরি। আমার মনে হয় পূর্বজন্মে তুমি আইরিশ ছিলে।"

উদার অমনি অমর কবির "মন্দ্র" থেকে আবৃত্তি সুরু ক'রে দিল নবদ্বীপ কবিতা:

'দুর্দম বন্যার ম'ত পড়িল আসিয়া
ভৈরব মধুর স্বনে, দিল ভাসাইয়া
ভাঙিয়া বিচূর্ণ করি' নিয়ম আচার
সমাজনীতি ও ধর্মনীতি ও প্রথার
পুরাতন জীর্ণ বাঁধ···আসিল উন্মত্ত
উচ্ছৃঙ্খল উপদ্রবে প্রেমের রাজত্ব।'

ব'লেই থেমে: "কিন্তু তাই ব'লে ভাই যেন ঠাউরে বোসো না যে আমি এই সূত্রে চোরাগোপ্তা নিজেকে তুলনা করেছি সেই দুর্দান্ত প্রেমোন্মাদের সঙ্গে। উচ্ছৃঙ্খল হ'লেই গৌরাঙ্গ হওয়া যায় না।"

অসিত: কিন্তু তোমাদের যে মহাবৈষ্ণব বংশ—

উদার (জিভ কেটে): ঐ একটি জিনিস একেবারে ভুঁইফোড় রে ভাই, ভুঁইফোড়—না নির্ভর করে বংশের উপর, না টাকার, না প্রতিভার, না বিদ্যাবুদ্ধির। 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'—যে পেল সে বিনা-কড়িতে পেল আর যার পাবার জো নেই সে বুকে হেঁটে ভূভারতে পরিব্রাজক হলেও—উঁহুঃ। গৌরাঙ্গ হবেন দেব্‌তা ভাই—সাক্ষাৎ অবতার, ঈশ্বরকোটি; আমি দীন দরিদ্র জীবকোটি—

অসিত (সপরিহাস সান্ত্বনার সুরে): কী যে বলো—আহা! রাজপুত্তুর—

তখনো উদার রাজা হয় নি। বলেছিল: "পু-র স্থলে পৌ প্রত্যয়—মনে রাখতে আজ্ঞা হয়।"

অসিত : এহ বাহ্য রে ভাই—আসল কথা যখন গদীশ্বর হওয়া নিয়ে—তুমিই যখন heir apparent—

উদার : হা হা হা ! হাত মেলাও ভাই হাত মেলাও সার্থক তোমার দেবভাষা-অধ্যয়ন অসিত ! কী তর্জমা রে—মরি মরি—গদীশ্বর ! সাজাহানে জাহানারার ইডিয়মে—'আবার বলি : চমৎকার' !

অসিত : বাংলা ও সংস্কৃতে সব্যসাচী ব'লে, না নতুন পরিভাষা আবিষ্কার করলাম ব'লে ?

উদার : তুমি স-ব বোলো অসিত, কেবল উটি বোলো না । না —না—না । কারণ তুমি কাউকেই আবিষ্কার করতে পারো না— করতে পারো শুধু তিরস্কার ।

অসিত : সে কি ?

উদার : তোমার ব্যক্তিত্বটাই একটা তিরস্কার যে । তাই তো তুমি আমাকে রাজপুত্তুর বললেও আমি মাথা হেঁট করি—যদিও এ-মাথা আর কারুর কাছেই নিচু হয় না—এক অমর কবির কাছে হয়েছিল—মনে পড়ে তাঁর আলেখ্যের সেই 'রাজা' উঃ আমাদের তিনি কী ধমকেই না দিয়েছিলেন ! রাজাকে দাঁড় করালেন কিনা খাড়া—হা হা হা—(আবৃত্তি রাজা থেকে) :

'তোমার টাকা আছে ? আছে না হয় টাকা,
তোমার কাছে আমি কিছু চাচ্ছি না কো ।
যে চায়—মাথা নিচু করুক তোমার কাছে
মাথা নিচু করতে আমি যাচ্ছি না কো' ।

উঃ ! কী মানুষই ছিলেন তিনি (উদ্দেশে প্রণাম)—এই-ই তো চাই

ভাই—কাব্যে এই সিংহগর্জন, এই পৌরুষের দীপ্ত প্রতিভা—মনে পড়ে বাইরণের উদ্দেশে তাঁর লেখা—আমি তাঁকে উদ্ধৃত ক'রেই করি গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে—(আবৃত্তির স্বরে) :

'তোমার কবিত্বরাজ্য সমুদ্রের ম'ত। তুমি কভু উপহাস
করিয়াছ—কভু ব্যঙ্গ—কভু ঘৃণা—ফেলিয়াছ বিষাদ নিশ্বাস
কভু—গাঢ় অনুতাপ—গম্ভীর গর্জন কভু—কভু তিরস্কার—
আগ্নেয়-গিরির ম'ত দ্রবীভূত জ্বালা কভু করেছ উদ্গার।'

অসিত নিজেও বারবারই পড়ত অমর কবির কাব্য নাটক, গাইত তাঁর গানই সবচেয়ে বেশি, মানত তাঁকেই বাংলার শ্রেষ্ঠ গীতিকার ও সুরকার ব'লে, কিন্তু তবু এভাবে এমন খুঁটিয়ে তো সে পড়েনি তাঁর রচনা। বলত হেসে :

"উদার! বলো তো, তাঁর লেখা এত মুখস্থ হ'ল তোমার কেমন ক'রে? রবীন্দ্রনাথের লেখা হ'লেও বুঝতাম।"

"বোলো না ভাই, বোলো না। রবীন্দ্রনাথ মহাকবি, অদ্ভুতকমা, বাংলার নবযুগের স্রষ্টা সবই মানি। কিন্তু আমি তপনের চেয়েও ব্রাহ্মণকে বাসি ভালো—তাই রবিব্রত নই দ্বিজব্রত—ঠিক পতিব্রতার মতনই একনিষ্ঠ, কেবল অন্ধকারটুকু বাদ। (সোচ্ছ্বাসে) কী অপূর্ব মানুষ—কী সুন্দর মহান তেজস্বী—বাংলা দেশে এমন মানুষ কটা জন্মেছে? দেখে যেন আশ মেটে না রে!—মনে পড়ে তাঁর তাজমহলের সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস? আমি ফিরিয়ে দিই তাঁকেই। সত্যি ভাই তাঁর—ঐ দেখ—" (ওর রাজবাড়িতে অমর কবির প্রস্তর মূর্তি দেখিয়ে—আবৃত্তির সঙ্গতে) :

"আমি কহি,—না না, আমি কিছু নাহি কহি।
আমি শুদ্ধ চেয়ে চেয়ে দেখি, আর স্তব্ধ হয়ে রহি।"

উদার নাম ওকে কে দিয়েছিল? অসিত ভাবত কত সময়েই। এক একটা নাম কী যে খাপ খায়!

"তোমার নামকরণ করেছিল কে বলতো ভাই উদার?"

উদার: কেন বলো তো ভাই জিজ্ঞাসু?"

অসিত: এক একটা নাম শুনেই মনটা খুসি হয়ে ওঠে—সমস্ত মানুষটাকে দেখা যায়। যেমন ধরো শরৎচন্দ্র বা শেলি। নামটা শুনলেই মনে হয় কবির—

The sound must seem an echo to the sense.

উদার: আমাকে যত উদার ভাবছ আমি—

অসিত: ততই উদার। না সত্যি উদার! এ আমার আবিষ্কারও নয়—

উদার: তিরস্কারও নয়—মানি ভাই। (অসিতকে বাহুবন্ধনে বেঁধে) যেহেতু এর নাম পুরস্কার। কেবল—(দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কৃত্রিম উচ্ছ্বাসে) 'এত সুখ সইবে না'—মনে পড়ে নূরজাহান? কিন্তু তোমার ওকথাটা সত্যিই লাখ কথার এক কথা—সত্যি এক একটা নাম খুব happy—আমার সত্যি মনে হয় দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যমহিমা আজো যে ব্যাপক ভাবে স্বীকৃত হয় নি তার একটা কারণ ওঁর নামটা কবিত্বময় হয়নি—যেমন ধরো শরৎচন্দ্র বা শেলির নাম —বা বাইরণ কালিদাস। ভবভূতির যে তেমন নাম হ'ল না অমন কবিত্ব সত্ত্বেও তার জন্যেও খানিকটা দায়ী, মনে হয়, তাঁর নাম।

—না অসিত, এ আমার একটা সত্যিকার দুঃখ যে আমাদের দেশের এতবড়় একজন কবি এখনো পেলেন না তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা। তাঁকে শুধু বড় নাট্যকার বা হাসির গানের কবি বললে আমার দুঃখ হয়। ওসব সত্যি কথা মানি। কিন্তু The greatness of a man is the greatness of his greatest moments. নয় কি? —তুমিই বলো না? দ্বিজেন্দ্রলালের তুঙ্গতম মুহূর্ত এসেছিল তাঁর কাব্যে ও গানে।

অসিত: এক মত—হাতে হাত দাও।

উদার: বলো—বুকে বুক দাও (ফের ওকে বুকে জড়িয়ে ধ'রেই গুন্‌গুনিয়ে) 'এসো এসো বঁধু বাঁধি বাহুডোরে এসো বুকে ক'রে রাখি বুকে ধ'রে মোর আধ ঘুম ঘোরে—সুখে ভোর হয়ে থাকি'।

অসিত (বিব্রত): হয়েছে হয়েছে—এবার ছাড়তে আজ্ঞা হয়।

উদার (স-দাপটে): কিছুতে না। কিন্তু কী সব প্রেমের গান ওরা আজকাল গায় ভাই, চাঁদ চামেলি নিয়ে! প্রেমের গান গাইতে হয় তো দ্বিজেন্দ্রলাল। মনে পড়ে তাঁর—

'এ জীবনে পুরিল না সাধ ভালবাসি
ক্ষুদ্র জীবন হায় ধরে না ধরে না তায়
আকুল অসীম প্রেমরাশি।'

অসিত: বুঝলাম। কিন্তু এত প্রেমও সয় না—ছাড়ো, ওহে শোনো—

উদার (ওকে বাহুবন্ধনে আরো চেপে ধ'রে):

'তোমার হৃদয় খানি আমার হৃদয়ে আনি'
রাখি না কেনই যত কাছে—
যুগল হৃদয় মাঝে কী যেন বিরহ বাজে
কী যেন অভাবই রহিয়াছে!'

(ছেড়ে দিয়ে): বলতে ইচ্ছে হয় না—'অপরূপ'? বলো তো বুকে হাত দিয়ে এরকম প্রেমের গান কটা বেরিয়েছে জগতে প্রেমিকতমেরও হাত দিয়ে?—আহা—(চোখে অশ্রুআভাস):

'হউক অসীম স্থান হউক অমর প্রাণ
ঘুচে যাক সব অবরোধ
তখন মিটাব আশা দিব ঢালি' ভালবাসা
জন্ম ঋণ করি' পরিশোধ।'

সত্যি এত সহজে ওর চোখে জল আসত! অসিত সময়ে সময়ে অবাক হ'ত, বলত হেসে: "ভাই উদার, তোমার উদার নামটা সাথক হয়েছে মানি কিন্তু বজ্রবারি নাম হ'লে আরো সার্থক হ'ত কি না সময়ে সময়ে ভাবি—সত্যি ভাবি, বিশ্বাস কোরো।"

"বজ্রবারি! হা হা হা! এ-নামের বোধোদয় কোত্থেকে?"

"তোমার বর্ণ-পরিচয় থেকে। শিকারী তুমি অথচ এত কোমল প্রাণ —কথায় কথায় চোখে জল! বলিষ্ঠ তুমি, ছ ফুট লম্বা অথচ জনসমাজে এত লাজুক—"

সত্যি, অন্তরঙ্গ-মহলে ও যেমন কল্লোলময়, বহিরঙ্গ-সভায় কি ঠিক তেমনি লাজুক!

অসিতের ওর সঙ্গে ভাব হ'য়ে গিয়েছিল প্রথম দর্শনেই—যাকে বলে "দোঁহে দোঁহা দরশনে উপজিল প্রেম"—সেই চব্বিশ বছর আগে দার্জিলিঙে। হাজারো সুকমার সুকুমারীদের সঙ্গে পথে ঘাটে পরিচয় হয়েছে বৈ কি এদেশে ওদেশে—কিন্তু রাজকুমার সম্প্রদায়ের সঙ্গে ওর সবপ্রথম পরিচয় হয় উদারেরই ঔদার্যে—কেননা এখানে ওর সব সঙ্কোচ উদারই প্রথম ভেঙেচুরে একাকার ক'রে দেয় তার বলিষ্ঠ উচ্ছ্বাসে, নির্বাধ ছন্দে সুরে—সবচেয়ে বেশি—দ্বিজেন্দ্র-ভক্তির প্লাবনে। বলতে কি, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি ওর অনুরাগ গভীর হ'লেও উদারের মতন উচ্ছ্বসিত ভক্তি নিয়ে সে যে তাঁর লেখা পড়ে নি এ ভাবতে সত্যি সত্যিই তার অনুতাপ আসত। কী কাণ্ড! পদ্য তবু মনে রাখা যায়। কিন্তু গদ্য? ও অনেক সময়েই মজা দেখত উদারকে উস্কে দিয়ে: "সত্য সেলুকস"—ব'লে। অম্নি উদার আবৃত্তি করত: চন্দ্রগুপ্তর প্রথম দৃশ্য থেকে সেকেন্দর শার জবানিতে:

"সত্য সেলুকস, কী বিচিত্র এই দেশ। দিনে প্রচণ্ড সূর্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়; আর রাত্রিকালে শুভ্র চন্দ্রমা এসে তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়। তামসী রাত্রে অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে যখন এর আকাশ ঝলমল করে—" এইভাবে। ও ব'লে চলে সমানে—সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। উদার আবৃত্তি করতও বড় সুন্দর। অসিত যেন ওর আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে অমর কবির গদ্য ভাষার অনির্বার ছন্দধারাকে নতুন ক'রে আস্বাদ করত—আবিষ্কার করত তার মধ্যে এক অ-পূর্বশ্রুত কল্লোল।

অসিতের আরো ভালো লাগত উদারের থেকে থেকে খামকা রেগে-ওঠা দেখতে। উদার অমর কবির নানা গদ্য পদ্য আবৃত্তি করতে করতে টেবিলে ঘুঁষি মেরে ব'লে উঠত: "একদিন না একদিন লোকে মানবেই যে হীরে আর পাথর সমান দামি নয়। কিন্তু এতে কি হীরের মান বাড়ল না জহুরির আশ মিটল? তুমি আমাকে ধৈর্য ধরতে ব'লে অধৈর্য ক'রে তুলো না। দেশে লোকে পৌরুষের মহিমা বুঝতে ভুলে গেল যে। আর কতদিন কাব্যে শুনব মেউ-মেউ-ময় হুতুশিপনা ?—না, রবীন্দ্রনাথের কথা হচ্ছে না। তিনি মহাকবি সবাই মানবে। কিন্তু তাঁকে যাঁরা ভক্তি করে সেই সব হাজারো তরুণ কবিদের মধ্যে এ কী গদ্যছন্দের ন্যাকামি বলো তো ?

ঐ খানে কাক খাচ্ছে টিকটিকির নড়ন্ত ল্যাজ…
এখানে আমি ব'সে লিখছি খাতায়…
কী সুন্দর ছেঁড়া ল্যাজ।
কাকের মুখে তোমার এ সৌন্দর্য…
অখণ্ড থেকে খণ্ড…
দেখব
এমন কবির চোখে…
জানত কে ?
ব্যাঙের মধ্যে ঋষিত্ব দেখেছি…
কিন্তু টিকটিকির ছেঁড়া ঠ্যাঙের
মহিমা

দেখালো যে কাক…
তাকে
নমো হে নমো।
আর এতদিন যে দেখতে পাই নি
তোমার কাব্য মহিমা, হে টিকটিকির ঠ্যাং!—
তার জন্যে
ক্ষমো হে ক্ষমো॥

বলো তো অসিত, রবীন্দ্রনাথ এদের গদ্য ছন্দ যদি আজ পড়তেন অমরাবতীর গাড়িবারান্দায় ব'সে—তাহলে বলতেন না কি :

রবীন্দ্রেরে দগ্ধ কে রে করলি তরুণ উচ্ছ্বাসী।
স্বর্গেও যে রম্ভা-ভোজে স্বাদ মনে হয় সব বাসি।

না, আমি কিছুতেই মানতে পারি না যে রবীন্দ্রনাথ দেশের কাব্যে পৌরুষ নিভে যাওয়ার এ-দৃশ্যে পুলকিত হ'তেন। তিনি প্রতিভা চিনতেন তাই চিরদিন দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যপ্রতিভার গুণ-গ্রাহী ছিলেন মনে প্রাণে।"

অসিত উদারের এই বেপরোয়া চঙটি চেখে চেখে উপভোগ করত যে, কাউকেই ও রেয়াৎ করত না। সাহিত্যরসের পূজা উদারের কাছে স্বধর্ম ছিল, কিন্তু পেলব সাহিত্যের না। 'পেলব'—এইতৎসম বিশেষণটিকে ও তর্জমা করত "মিনমিনে" এই তদ্ভব শব্দটি দিয়ে।

কিন্তু তবু অসিতের বেজেছিল যখন ও আশ্রমে চ'লে যাওয়ার পর থেকে উদার ওর সঙ্গে পত্রালাপ বন্ধ করল। শৈলাবাসে উদার ওকে কী আদর যত্নই না করেছে একদিন—মনে হ'ত

ওর। উদারকে ও ভালোবেসেছিল—যদিও উদার সেকথা জানত না। বলত প্রায়ই: "অসিত, তুমি ভাই স্রোতের ফুল—স্রোতের নিচে যে অন্তঃশীলা ধারা তার খোঁজ নেবে কেন?—এই নিয়েই তোমার সঙ্গে আমার আড়ি চিরন্তন হ'য়ে রইল।"

না, উদার ওকে অনেক সময়েই ভুল বুঝেছে। মৌখিক প্রকাশে অসিত উচ্ছ্বাসী নয় ব'লে "মান" করেছে অগুন্তি বার। কিন্তু তবু এটা ও জানত যে উদার ওকে বরণ করেছিল ওর অকৃত্রিম স্নেহের মালা দিয়ে। দিলদরিয়া ওর প্রকৃতি: তাই অসিতকে কত যে উপহার দিত যখন তখন! কত সময়ে ওর গানের সভায় চ্যারিটি কন্সার্টে পঞ্চাশ ষাট সত্তর টাকার টিকিট কিনে এনেছে ওর আসর সরগরম করতে। অসিতের মুখে দ্বিজেন্দ্রলালের গান শুনতে শুনতে উদার সময়ে সময়ে উঠত উদ্দাম হ'য়ে। আরো কত নিদর্শনই তো অসিত পেয়েছে ওর অহেতুক অকৃপণ স্নেহের। আর এমন উচ্ছ্বসিত সর্তহীন স্নেহ! সংসারে বন্ধুর বন্ধুত্ব কত বড় জিনিষ এ নিয়ে যখন ও ছায়ার কাছে উঠত উচ্ছ্বাসী হ'য়ে তখন উদারের উদার বন্ধুত্বের কথা ওর খুব বেশিই মনে হ'ত। ছায়ার কাছে অসিত প্রায়ই ওর গল্প করত। কিন্তু প্রথম বার ১৯৩৭ সালে কলকাতায় ফিরে উদার ওর দেখাই পেল না। ও রইল বলেশ্বরেরই মাটি কামড়ে। দ্বিতীয়বার দেখা হ'ল প্রথম সেই শিলঙে, তা-ও বৈশাখী ঝড়ের মতন—ওলট পালট হ'তে না হ'তে—অন্তর্ধান।

সেদিনকার কথা ওর কতবারই যে মনে হয়েছে কত সময়ে! সেই ছায়াদের বাড়ি এসেই ওকে জড়িয়ে ধ'রে গান ধরা:

দাও না কেন দেখা ওগো ধিক্ ডুমুরের ফুল।
শিল্পী হ'য়ে কুল ছেড়ে কেউ চায় অকূলের rule?
ছায়া সেদিন হেসে অস্থির ওর ছড়া শুনে।

"হাসছ কি ছায়া?" বলল উদার "তোমার এই অসিদাটি is not a straight man।"

"ও মা! এমন কথা তো কখনো শুনি নি।"

"ইংরিজিতে শোন নি, কিন্তু বাংলায় শুনেছ নিশ্চয়ই, আমি বাজি রেখে বলতে পারি।"

"বাংলায়—মানে?"

"অসিতদা is not a straight manএর বাংলা তর্জমা করো তাহ'লেই বুঝতে পারবে।"

ছায়া ভেবে বলল: "অসিতদা? is not a straight man—ও—" হাততালি দিয়ে "অসিতদা তুমি সোজা লোক নও—বলছেন কুমার বাহাদুর।"

"কুমার বাহাদুর? ছি দেবি! তোমার এত বড় ভক্তকে—কবির ভাষায় মিনতি জানাই:
যত অপরাধ—যত অত্যাচার—যাহা করি না কো
সব করো ক্ষমা—হাসি মুখে দেবি, তুমি চেয়ে থাকো।—অবিশ্যি শেষ লাইনটা একটু বদলাতে হবে—ওখানে বসাও: হাসিমুখে দেবি দাদা ব'লে ডাকো।

ছায়া এধরণের কাব্যোচ্ছ্বাস কখনো শোনে নি—বিশেষ প্রথম পরিচয়ে। খুব কুণ্ঠিত হ'য়ে "আসছি অসিদা" ব'লেই প্রস্থান।

"কী চমৎকার!" বলল উদার।

অসিত খুসি হ'য়ে উঠল: "ওকে কি আগে দেখ নি?"

"দেখি নি? মানে! রবীন্দ্রনাথের একটা জলসায় ওর গান শুনে এলাম স্বকর্ণে—তোমারি শেখানো—

আজি তোমারি কাছে ভাসিয়া যায় অন্তর আমার!"

অসিত, কী অপরূপ গাইল এ গানটি ও। উঃ! অমর কবির সমস্ত প্রেমের বেদনা তুলল মুহূর্তে এমন মূর্তিমতী ক'রে যে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত 'আহা' বলতে বাধ্য হ'লেন বাংলাগানে তান থাকা সত্ত্বেও।"

"আহা বললেন তাতো বলে নি ছায়া।"

"ওর নিজের গান ব'লেই বলে নি।"

"সত্যি 'আহা' বলেছিলেন?"

"বলেন নি? বাঃ স্বকর্ণে শুনলাম!"

অসিতের খুসির মধ্যে গর্বের ভাব দেখা দেয়, বলে: "তবু তুমি বলো আমি কাউকেই আবিষ্কার করতে পারি নি কোনোদিন?"

"যোগাশ্রমে গিয়ে হয়েছে বুঝি এ-বিভূতি লাভ? হা হা হা!"

"আশ্রম নিয়ে ঠাট্টা কেন?"

"না ভাই—লক্ষ্মীটি! আমি কিছু ভেবে বলি নি" ব'লেই ওকে ফের জড়িয়ে ধরা।

"আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে। ছাড়ো।"

হঠাৎ ছায়া ঢুকল: "অসিদা! একটি মেয়ে দেখা করতে এসেছে তোমার সঙ্গে।"

"কে?"

"নাম জানি না। একটি আসামী মেয়ে। বড্ড কাঁদছে।"

"কাঁদছে? কেন?"

"তোমাকে বলবে বললে। কিন্তু একা।"

অসিত উদারকে "একটু আসছি ভাই, তুমি ছায়ার সঙ্গে গল্প করো" ব'লেই বেরিয়ে গেল।

* * * *

* *

মিনিট পনের বাদে ফিরে দেখে উদারের সঙ্গে ছায়ার বেশ ভাব জ'মে গেছে। উদার খুব স্যাণ্ডউইচ খাচ্ছে আর চায়ের পেয়ালায় চা ঢেলে নিচ্ছে থেকে থেকে। আর ছড়া কাটছে আর গল্প—অসিতের প্রাক্-যোগ-জীবনই যার প্রধান উপজীব্য।

অসিত ফিরতেই ছায়া হাততালি দিয়ে বলে: "কী চমৎকার গল্প বলেন কুমার—থুড়ি, উদারদা।"

"হ্যাঁ, উদারদা! লক্ষ্মী মেয়ে। তোমারই যদি দাদা না হ'তে পেলাম তবে কী হবে শুনি একগুষ্ঠি মিথ্যে বোনের ঝক্কি পুইয়ে?"

"অনেকগুলি বোন বুঝি আপনার—অসিতদার মতন?"

"তোমার অসিতদার সঙ্গে কার তুলনা? ওর বোন তো শুধু বাংলা দেশে নয় হিল্লি দিল্লি মক্কা মদিনা কাবুল কান্দাহার লণ্ডন এডিনবরা বার্লিন ফ্রান্স মস্কো বুদাপেস্ত—কোথায় নেই বলো? তবে বোধহয় আসামী বোন লাভ এই প্রথম?" ব'লেই

ওর চোখের দিকে চেয়ে: "কিছু মনে কোরো না ভাই—হবে, উদার গম্ভীর হবে। (গম্ভীর সুরে) নিমচাঁদের ভাষায়—তিনি হন কে?"

অসিত মৃদুস্বরে বলল: "একটু আস্তে। তিনি স্বয়ং ড্রয়িং-রুমে ব'সে।"

"কী ব্যাপার?"

"বিধবা। একটি কাজ পেয়েছে দিল্লিতে কিন্তু সেখানে যায় কার সঙ্গে? আর ট্রেনভাড়াই বা—"

"কী করে?"

"কী আর করবে আমাদের দেশের অনাথা মেয়ে? তবে ছবি আঁকতে জানে—এই দেখ না" ব'লে অসিত ওকে একটি খাতা দেখায়।

"চমৎকার আঁকে তো।"

"হুঁ। একটি ধনী পরিবারে ও চাকরি পেয়েছে। ছবি আঁকা শেখাবে তাদের মেয়েদের। হয়েছে কি এখানে ওর থাকা চলে না আর—বাড়ির কর্তা নজর দিচ্ছেন। খুব ফুঁপিয়ে কাঁদল, বলল যদি অনাথার জন্যে একটা ব্যবস্থা করি—মানে, charity concert ক'রে হোক বা যে ক'রে হোক—কিন্তু আজকাল আমার স্টেজে নামতে এত বাধে—"

"কত টাকা চাই?

"শো তিনেক না হ'লে ও ওর দেনা শোধ ক'রে যেতে পারছে না।"

উদার পকেট থেকে একতাড়া নোট বার ক'রে পাঁচখানি একশো টাকার নোট অসিতের হাতে দিয়ে বলল: "এই বাড়তি দুশো টাকা ওর সঙ্গে যে যাবে তার জন্যে। এতে হবে তো?"

*   *   *   *

*   *

ওর মনে পড়েছে কতবারই উদারের এ-ঔদার্যে ছায়ার মুগ্ধ দৃষ্টি। সব চেয়ে বিচলিত হ'ত ও দানশীলতায়—ঔদার্যে। উদারকে তাই ছায়ার প্রথম থেকেই ভালো লেগে গিয়েছিল।

কিন্তু তার পরেই ফের উদারের সেই চিরকেলে আকস্মিক অন্তর্ধান। ছায়া থেকে থেকে জিজ্ঞাসা করত: "উদারদা কোথায় অসিদা?"

"ও কোথায় যে কখন থাকে কেউ কি জানে রে?" বলত অসিত, "অদ্ভুত মানুষ—দেখা হ'লে কী কাণ্ড—তার পর যেই—out of sight out of mind?"

"অতটা না, "বলত ছায়া চিন্তিত সুরে, "তবে কিরকম যেন!"

অসিত হেসে জিজ্ঞাসা করত: "শুনি রাণীর কী রায়?"

ছায়া হেসে বলত: "ও! তুমি বুঝি নাটুকে ভঙ্গিটা উদারদার কাছেই শিখেছ?"

"খানিকটা। তবে নাটুকে ভাষাটা ও যেরকম গুলে খেয়েছে সেরকম কি আর আর কেউ পেরেছে?"

"সত্যি, কিন্তু অসিদা, জানো? উনি যখন চন্দ্রগুপ্ত সাজাহান দুর্গাদাস এই সব নাটক থেকে আবৃত্তি করেন কিরকম যেন একটা

—কি বলব?···ভালো লাগে।"

"একথা ওকে বলব।"

"খবর্দার! উদারদা তারপর দিন থেকে হয়ত ঘরোয়া ভাষা একেবারেই ছেড়ে দেবেন।"

"বেশ বলেছিস—হাঃ হাঃ হাঃ।"

"তোমাদের দুই বন্ধুরই খু-ব খোলা হাসি!" বলে ছায়া চোখ বড় বড় ক'রে। "যাদের হাসি খোলা নয়—জানো আমার মনে মনে হয় অবিশ্যি—যদিও আমার মনে হওয়ার কী-ই বা মূল্য বলবে হয়ত উদারদা—তবু বলব, মানুষকে বেশি চেনা যায় তার হাসি থেকে। ধরো তোমার ঐ আত্মীয় ম-বাবুর হাসি। একটুও ভালো লাগে না। মনে হয় হাসির মধ্যেও যেন জিলিপির প্যাঁচ। হয় না? উদারদার নামটা যে ঠিকই হয়েছে সব চেয়ে মনে হয় ওঁর হাসি থেকে।"

"একদিনের তো আলাপ সেই শিলঙে। তবু এত কথা তোর মনে এল কেমন ক'রে বল্ তো।"

"কি জানি, ওঁকে আমার ভারি ভালো লেগেছে। আর সত্যি, কিরকম ভালোবাসেন উনি ডি এল রায়ের গান! তোমার মুখে আর কোনো গান শুনতেই চান না। আচ্ছা এত ভালো-বাসলেন উনি কী ক'রে ডি এল রায়কে? সেদিন কী কাণ্ড করলেন জানো যখন তুমি ওঘরে গেলে?

"কী?"

"তুমি গেলে তো সেই আসামী মেয়েটির সঙ্গে কথা কইতে? উনি ধরলেন আমাকে গাইতেই হবে ডি এল রায়ের 'এমনিই

এসে ভেসে যাই'। গানের পর দেখি চোখে ওঁর জল! সত্যি জল, অসিদা! অতবড় লম্বা চওড়া মানুষটার চোখ একেবারে চিক্ চিক্ ক'রে উঠল।—আচ্ছা উনি বোধহয় জীবনে খুব দুঃখ পেয়েছেন, নয়?

"রাজপুত্তুর, অগাধ টাকা—ঝাড়া হাত পা, তার আবার দুঃখ কী বল্ তো?"

"ঐ ফের তুমি ফ'স্কে যাচ্ছ, যা—ও!"

"যাব বৈ কি। শুনব তার পর কী বলল ও।"

"তারপর কত কী যে বলতে লাগলেন ডি এল রায়ের সম্বন্ধে। কী আশ্চর্য মানুষ ছিলেন তিনি! পথে চলতেন দুজনের দুপাটি চটি পায়ে দিয়ে—গান বেঁধেই ছুটতেন ওঁর শালী শালাজদের শেখাতে—নোটশুদ্ধ জামার পকেট ধোপা বাড়ি চ'লে যেত কাচতে—ব'লে সে কী হা হা হা হাসি।"

"তারপর?"

"সে আরো কত কথা। বললেন ডি এল রায়ের কত হাসির গল্প। একটা এমন মজার। রবীন্দ্রনাথকে না কী আবির মাখিয়ে লা—ল ক'রে দিয়ে বলেছিলেন: 'কবিবর মাপ করবেন, আপনার সামনে বললে খোসামোদ করা হয়--আপনাকে এবার ঠিক আমাদেরই মতন আহাম্মক দেখাচ্ছে—'বলতে বলতে ছায়া হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ে। গল্পটা সত্যি না কি অসিদা?"

"সত্যি বৈ কি। কিন্তু তার পর কী বলল ও শুনি?"

"আমার কি তোমার মতন স্মরণ শক্তি আছে যে বলতে পারব পর পর কী কথা হ'ল? কিন্তু ওঁর স্মরণশক্তি বোধহয় তোমার চেয়েও বেশি।"

"কেমন ক'রে জানলি?"

"ও মা! প্রমাণ দিলেন হাতে হাতে—জানব না? করলেন কি জানো?" বলতে বলতে ওর ডাগর চোখ দুটো আরো ডাগর হয়ে ওঠে উৎসাহে: "কাছেই ছিল তোমার নিজের নাম লেখা বাঁধানো 'দ্বিজেন্দ্র গ্রন্থাবলী' একখণ্ড। বললেন পাতা উল্টিয়ে: 'বাঃ বেশ বাঁধানো তো। যাহোক অসিতের আশা আছে ও যখন ডি এল রায়ের লেখা এত যত্ন ক'রে পড়ে।"

"আমি বললাম: 'আপনি কি ধ'রে নিয়েছিলেন অসিদার আশা নেই?' উদারদা বললেন: 'না। তবে আমার ভালো লাগে না ও যখন আজে বাজে লোকের গান গায়। ডি এল রায়ের গান থাকতে আর কারুর গান গাওয়ার কী দরকার?' ব'লেই চোখ বুঁজে আবৃত্তি ক'রে গেলেন 'পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে' গানটা। আর কী সুন্দর যে সে আবৃত্তি অসিদা! আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল—এই দেখ ফের—" ব'লেই দেখালো ওর হাতের লোম সব খাড়া হ'য়ে উঠেছে।"

"তুই ওগানটা শুনিয়ে দিলি না কেন? দেখতিস ওরও গায়ে কাঁটা দিত।"

"দিই নি আবার! উনি কি ছাড়বার পাত্র? আমি যেই 'আহা' ব'লে উঠেছি, অমনি ধ'রে পড়লেন 'গাও।'

"তারপর?"

"আমার ভয় ভয় করতে লাগল। ওঁর অমন আবৃত্তির পর কি গাওয়া যায় কখনো? কিন্তু নাছোড়বন্দ বলে কাকে?—নিজেই

ধ'রে দিলেন—কাজেই আমাকেও গাইতে হ'ল—আহা অসিদা, বলো না, কী সুন্দর শেষের দিকটা—সেই 'পরিহরি ভব সুখ দুঃখ যখন মা—সত্যি কী যে—"

"গা তো দেখি। ওটা কতদিন যে শুনি নি।"—পরে অসিতের কতবার মনে পড়েছে পরে ছায়ার মুখে গাঁওয়া এই শেষ চারটি অপূর্ব লাইন :

"পরিহরি' ভব-সুখ দুঃখ যখন মা, শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব, বরিষ সুপ্তি মম নয়নে.
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে,
মা ভাগীরথি! জাহ্নবি! সুরধুনি! কলকল্লোলিনি গঙ্গে!

"এ গানটা কি এত ভালো গেয়েছিলি সেদিনো?" বলে ও ছায়ার কণ্ঠবেষ্টন ক'রে।

"ভালো টালো জানি না। তবে গাইতে খুব আনন্দ হচ্ছিল।"

"গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল তো?"

"ফের ঠাট্টা?"

"না রে না। (আমার কত যে আনন্দ হয় যখন শুনি ভক্তির গানেও তোর গায়ে কাঁটা দেয়।')

("কিন্তু কেন দেয় অসিদা? আমি তো ভগবানের কথা ভুলেও ভাবি না।")

"উদারকে জিজ্ঞেস করলি না কেন?"

বলতেই ছায়া হাততালি দিয়ে বলল: "আশ্চর্য! জানো, —কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিলাম সত্যিই।"

অসিত উৎসুক কণ্ঠে বলল: "কথাটা উঠল কেমন, ক'রে?"

ছায়া বলল: "ঠিক বলতে পারব না—তবে—হ্যাঁ বলতে ভুলেছি। ঐ দেখ, স্মরণশক্তি খারাপ হ'লে কী মুশ্কিল। গান গাবার আগে দ্বিজেন্দ্রগ্রন্থাবলী হাতে নিয়ে বলেছিলেন 'অসিত কিন্তু তেমন ক'রে ডি এল রায়ের বই পড়ে নি যেমন ক'রে আমি পড়েছি।' আমি তাতে ঠাট্টা ক'রে টুকলাম: 'আপনার বুঝি ডি এল রায় মুখস্থ?' তাতে উনি একেবারে যাকে বলে উজিয়ে উঠলেন। বললেন 'শুধু মুখস্থ নয় ছায়া বুকস্থ—' বলেই ফের সেই হা হা ক'রে হাসি।"

"তারপর?"

"আমি বললাম—কী বললাম মনে নেই। তবে হঠাৎ উনি বললেন: 'ধরো বইটা। যেকোনো পাতা খোলো—বলো যেকোনো একটা কথা। আমি ব'লে দেব—কে বলছে।' ও মা! জানো অসিদা, খুব মজা লাগল, একেবারে যাকে বলে অম্লান-বদনে জেরা সুরু করলাম মাষ্টারনীর মতন: একটা পাতা খুলেই কী যেন—হ্যাঁ—বললাম: বলুন কে বলছে: 'মানুষমাত্রকেই ভালোবাসি।' উদারদা বললেন: মানসী বলছে অজয়কে—মেবার পতনে। শোনো তারপর আমিই বলি: অজয় মেয়েলি ভঙ্গিতে ব'লে উঠল: 'নিষ্ঠুর!' তাতে মানসী বলল ছেলেমি ভঙ্গিতে: কী যেন?—হ্যাঁ বলল মানসী: 'কেন অজয়? তোমাকে ভালোবাসি ব'লে কি আর কাউকে ভালোবাসতে নেই? তুমি কী স্বার্থপর।' আরো কী কী কথা বলেছিল মানসী

আমার মনে নেই কিন্তু উদারদা ব'লে গেলেন একটানা।—আশ্চর্য নয়, অসিদা?"

"আরো জেরা করিসনি এর পরে?"

"করিনি তো কী? বলি নি—স্কুলমাষ্টার ব'নে গিয়েছিলাম তখনকার মতন? তারপরে কী একটা নাটকে—হ্যাঁ চন্দ্রগুপ্তে বুঝি—বললাম বলুন কে বলছে: 'এ কি উচিত হচ্ছে বাবা?' উদারদা বললেন : বোধহচ্ছে হেলেন বলছে সেলুকসকে—যার উত্তরে সেলুকস বললেন 'আমি কন্যার বক্তৃতা চাই না শুনতে চাই না'—না?"

বলতে বলতে ছায়ার চোখ ফের বড় বড় হ'য়ে উঠল, বলল: "আমার ওঁকে এত ভালো লাগল এই জন্যেই অসিদা।"

"কী জন্যে?"

"এই উৎসাহ। এই ভক্তি। মানুষ মানুষকে এতখানি ভক্তি করতে পারে শুনলেও আমার ভক্তি হয় তার ভক্তির জন্যে।" অসিত ওকে আদর ক'রে বলল: "মনে আছে—আনন্দ তোর এই ভক্তির কথাই বলেছিল কবে—সেই এলাহাবাদে?"

ছায়া মুখ নিচু ক'রে বলল: "পড়ে। কিন্তু—"

"কী?"

"একে তো তোমরা ভক্তি বলো না।"

"বলি না?"

"তোমরা তো বলো ভগবানকে ভক্তি না করলে সে-ভক্তি কিছুই না।"

কি, অসিত দুমেলে ফিরলে পর উদার একবার ছায়াকে ওদের বালিগঞ্জের প্রকাণ্ড প্রাসাদে নিয়ে যায় নিমন্ত্রণ ক'রে। (ছায়া রাজবাড়ি শুনে প্রথমটায় ভড়কে গিয়েছিল কিন্তু উদার একবার ধরলে তো ছাড়বার পাত্র নয়—প্রতিমাকে অনেক ব'লে ক'য়ে ছায়াকে আনিয়েছিল। প্রীতি ও কান্তি এসেছিল ওর সঙ্গে।) সেখানে এক মস্ত বাইয়ের গান ছিল—চন্দ্রাবাই—ডাকসাইটে নাম। জাতে মারাঠি।

ছায়া আসতেই উদার খুব আদর ক'রে ওর কাছে নিয়ে যায়। ছায়া তো ভয়ে আমসি! এতবড় বাই—তার কাছে ওকে নিয়ে যাওয়া আবার কী! কিন্তু এ তো—উদারের ভাষায়—সবে কলির সন্ধে। ও ছায়াকে এই ব'লে আনিয়েছিল যে গান শোনাবে। ছায়া তখন সুরেশ্বরের কাছে হিন্দি গান শিখছে কাজেই ঔৎসুক্যও ছিল, যদিও মেয়ে ওস্তাদের গান ছায়ার প্রায়ই ভালো লাগত না। তবু "এত বড় বাই—শুনেই আসি না—ভালো লাগতেও তো পারে" —জপতে জপতে এসেছিল ও।

এর একটি গৌরচন্দ্রিকা আছে। একটু পিছু হটতে হবে। উদারের এক ওস্তাদিপন্থী গীতশ্রী ভাইঝি একবার রোখ ক'রেই বলে যে, পশ্চিমে বাইজিদের কাছে বাঙালি মেয়ের কণ্ঠ দাঁড়াতেই পারে না। শুনে উদার অগ্নিশর্মা—বাজি রাখল নিশ্চয়ই পারে। গীতশ্রী বললেন: "কিন্তু ভালো বাইজির কাছে mind you!"

"I am minding it—don't you worrry। কাকে ডাকব বল্?"

সে বলল : "চন্দ্রাবাই—of course."

"অ—ল রাইট" ও সদম্ভে পাঠালো সেক্রেটারি সুভদ্রবাবুকে। তিনি বললেন চন্দ্রাবাইকে গিয়ে যে তার গাইতে হবে রাজা উদার রায়ের বাড়ি—কেবল সব শেষে একটি বাঙালি মেয়ে গাইবে।

চন্দ্রাবাই এ-প্রস্তাব আদৌ পছন্দ করে নি। ওদের এ দস্তুর নয়—তাছাড়া ওর সামনে বাঙালি মেয়ে কী-ই বা গাইবে বলল ও মুচকে হেসে।

বিফলমনোরথ। উদারেরও রোখ চেপে গেল। যার কাছে—money is no consideration তাকে ঠেকায়ই বা কে? স্বয়ং গেল ওর রোল্‌স্‌ রয়েস হাঁকিয়ে।

বাইসাহেবা এতবড় মোটর দেখে দারুণ সেলাম ঠুকে বসালেন গায়িকা সাধারণ বাই নন। বড় ঘরের মেয়ে—পশ্চিমে ব্রাহ্মণ ঘরের। সবাই জানত। একজনকে ভালবেসে ঘর ছাড়েন। সবে মাস তিনেক কলকাতায় এসেছেন দিগ্বিজয়ে। বম্বেতে ছিলেন একজন মস্ত অভিজাতের অন্তঃপুরিকা। কথাবার্তা অতি মোলায়েম—সংযত ভাব ভঙ্গিও।

উদার বাইসাহেবাকে কখনো দেখেনি, দেখতে চায়ও নি। বলতে কি, ও হিন্দুস্থানি গান তেমন ভালোবাসত না। শরৎচন্দ্রের ছিল ও মহাভক্ত এবং তাঁর কাছে গিয়ে হিন্দুস্থানি গানের ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার করা ছিল ওর একটি অতি প্রিয় নিত্যকর্ম। শরৎ-চন্দ্রের কাছে ও একদিন গিয়েছিল অসিতেরই সঙ্গে। অসিত তাঁকে ধরেছিল : আবদুল করিমের গান শুনতে আসতেই হবে।

শরৎচন্দ্র তাতে হেসে বলেছিলেন : যেতে পারি যদি একটা ভরসা দাও।

"কী ?"

"সে থামে তো ?"

উদার একথাটি প্রায়ই উদ্ধৃত করত। ও ছিল মনে প্রাণে বাঙালির বাংলা সংস্কৃতির ঐকান্তিক পূজারী। গানে কেবল সেঁইয়া মেইয়া তুম্ তা না না না—এসব কী ? কোকিল ডাকুক, পাপিয়া আসুক, ঝরুক চাঁদের আলো, মলয় আসিয়া ক'য়ে যাবে যেসব কথা সুর তাকেই তুলুক ফলাও ক'রে। ছায়াকে ভালো-বেসেছিল ও আরো এই জন্যে। অসিতকে একথা চিঠিতে লিখেছিল যে মেয়েদের গানে গভীরতম রস পাওয়া যায় বাঙালির আশ্চর্য উপমায়, ছন্দে, ভাবলালিত্যে :—

কেন এত সুন্দর শশধর ?—ও সে তারি মুখ অনুকারি'।
কেন এত সুবর্ণ শতদল ?—ও সে তাহারি বর্ণ হারি'।
কেন এত সুললিত পিকসঙ্গীত ?—
তারি কলবাণী করে ঝংকৃত।
এত সুগন্ধ স্নিগ্ধ মলয় ?—পরশ বাহিয়া তারি।

"আহা, অসিত"—লিখেছিল ও সোচ্ছ্বাসে অমর কবির এই গানটির মাত্র প্রথম চার চরণ উদ্ধৃত ক'রে—"কী সব প্রপাগাণ্ডা করে বাঙালিরা ওস্তাদি গানের নামে ? ওসব কি গান ? গাইতে হয় তো এম্নি গান। কিম্বা

বঁধু কী আর কহিব আমি
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হোয়ো তুমি।

এ হৈন উদার পরোয়া করবে কোন্ চন্দ্রাবাইয়ের? ওর মনের প্রাণের জগৎ ছিল ঝোঁকালো। যার উপর ওর ঝোঁক পড়বে তার বাইরের জগত ওর কাছে 'অসিদ্ধ' না হোক' অবাস্তব'। ঝোঁকের বশে বাজি রেখেছে—প্রাণ গেলেও মান রাখতেই হবে। অতএব একদা প্রভাতে চন্দ্রাবাইয়ের জাজিমের উপর ওর শুভাগমন— এই হ'ল সাইকলজি।

কিন্তু চন্দ্রাবাইও তো গানে অভিজাত। তাঁর পরে বাঙালি মেয়ে গাইবে? "য়ে হো নাহি সকৃতা সাব্—মাফ কীজিয়ে।"

উদারের হিন্দিতে যেমন আশ্চর্য দখল তেমনি তৎপরতা, তৎক্ষণাৎ বলল: "মাফ করনে হোগা আপকোই বাইসাহেবা। বাঙালি স্ত্রী জাতি—দ্যুৎ—আওরৎকো ভজনও তৌ শুন্নে হোতা।"

বাই সাহেবা ওর হিন্দি শুনে হেসে ফেললেন। কিন্তু তার পরে তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন তাঁর পরে গাইবে এমন 'বঙালিন্' ভূভারতে কে আছে? "নহি, সাব্ মাফ্ করনা। য়ে দস্তুর নহি।" কিন্তু উদারও নাছোড়বন্দ—শেষটায় চন্দ্রাবাই বললেন: "আচ্ছা রাজা সাব্, ময় জাউঙ্গি মগর গাউঙ্গি নহি।"

উদারের রোখ চেপে গেল। বলল: "আপকো জানে তো হোগাই—গানেও হোগা। আপ না না বোলনেসে তো হম ছাড়েঙ্গে নেই। সুনিয়ে, হাজার রুপিয়া লিজিয়ে। হমারা কুছ অভিসন্ধি —দ্যুৎ—মৎলব হয়। ঐ বালিকাকো—দ্যুৎ—আওরৎকা কীর্তন নহি শুননেসে চলেগা নেই।"

সঙ্গে সঙ্গে সুভদ্রবাবু একতাড়া নোট বের করে বাইজির হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন: "হাজারটাকা—গুনে নিন।"

চন্দ্রাবাই এরকম কখনো দেখে নি। ডবল মুজরা তার উপর অগ্রিম। ব্যাপার কি? এতগুলো গন্‌গনে টাকা। কী কাণ্ড! রূপচাঁদের যুক্তিকে নাকচ করতে পারে কজন? বাইসাহেবার সুর বদ্‌লে গেল, বললেন "খু—ব আচ্ছি গাতি?"

"বুল্‌বুল—বাইসাব্‌—সুননেসে তাক্‌ লাগ্‌ যায়েগা।"

বাইসাহেবা হেসে বললেন: "মগর্‌ আপকা মৎলব কেয়া হয়? বতানা তো চাহিয়ে।"

"আভি পারেগা নেই বাইসাহেবা। মাফ কিজিয়ে গা। আচ্ছা অব উঠতা হুঁ—নমস্‌—দ্যুৎ—সেলাম আলেকম্‌।"

"সেলাম জনাব!"—ওষ্ঠাধরে তার সম্ভ্রমের রেখা, কিন্তু সঙ্গে একটু কৃপার ভাবও ঈষৎ প্রত্যক্ষ: লোকটা পাগল নয় তো। হোক্‌, কিন্তু রইস বটে—এককথায় হাজার টাকা!! দিলদরিয়াকে দেখে প্রকাশ্যে হাসা চলে হয়ত, কিন্তু গহনে তবু কোথায় একটু সমীহও আসে যে!—

ছায়ার কাছে অবশ্য উদার এসব কথার বিন্দুবিসর্গও ফাঁশ করে নি—শুধু চন্দ্রা বাইয়ের উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতিই করেছে। উদার আরো একটু চাল চেলেছিল—সাবধানের মার নেই—অজয়ের কাছে বলেছিল যে অনেকেই বলে চন্দ্রাবাইয়ের কাছে কি আর অসিত মুখ খুলতে পারে কখনো?—পাগল!

অজয় যথাকালে অসিতনিন্দাটি ছায়ার কানে বহন ক'রে এনে দেয়। প্রীতির কাছে পরে অসিত শুনেছিল: "কী অবজ্ঞা যে ফুটে উঠলো তোমার নয়নতারার মুখে জানো না? বলল কি জানো?

'রেখে দিস অজয় বাবু, ওসব লোকের হাসাহাসি শুনলে মনে হয় যে ভগবানকে যদি ডাকতে পারতাম তবে ওদের জন্যেই শুধু ডাকতাম যীশুখৃষ্টের মতন—'ওদের ক্ষমা কোরো প্রভু, ওরা জানে না কী বলছে—ব'লে।'

সভা তো বসেছে (লিখেছিল উদার অসিতকে, এসবই অসিত উদারের কাছ থেকে জেনেছিল পরে ওর সঙ্গে পত্রালাপে)—সভাসদগণও বেশ মুরব্বি হ'য়েই সুখাসীন—যাদের মধ্যে কদরদানও আছেন তারিফ করতে—নম্বরে প্রায় সাড়ে সাতজন। কারণ একটি বাঙালি মেয়ে ছিল (উদার লিখেছিল অসিতকে) বয়স তার মাত্র চোদ্দ, কিন্তু কী লম্বা লম্বা কথা! তার কথা শুনলে মনে হবেই হবে—পূর্বজন্মে সে ছিল তানসেনের নাৎবৌ—শুধু পথ ভুলে এজন্মে বাঙালি হ'য়ে জন্মেছে আচম্‌কা। তার সোজা ঠোঁট দুটি হ'য়ে ওঠে ধনুকের মতন বাঁকা বাংলা গানের নাম শুনলে। 'হা পাপীয়সী'! ব'লেছিল উদার ছায়ার কাছে এ-মেয়েটির নাম ক'রে: রেয়াৎ ক'রে কথা বলবার পাত্র ও নয়।

"পাপায়সী! ও কি কথা?"—ছায়া হেসেছিল, যদিও ওরও রাগ কম হয় নি।

"কোদালকে যদি কোদাল না বলি তবে কোহিনুরকে কোহিনুর বলতেও ভুলে যাব যে!"

সুরু হ'ল চন্দ্রাবাইয়ের গান—চৌষট্টি-বর্তিকা ঝাড়লন্ঠনের নীচে মোটা কার্পেটে। উদার কিন্তু ডেকেছিল ওর এক ডজন নাট্যবন্ধুকে—চন্দ্রাবাইয়ের গানের সামনে কাঠ হয়ে বসে থাকতে।

আর টিপে দিয়েছিল বুবু আর টুটুকে—সম্পর্কে ওর দুই ভাগনি। ওরা ছিল ছায়ার ভীষণ ভক্ত। উদার বলত ওদের হেসে: "যদি পরের বার ছায়া জন্মায় ফের রাধা হ'য়ে তো তোরা নিশ্চয়ই হবি ললিতা আর বিশাখা।" (বুবু আর টুটু এধরণের ঠাট্টা পছন্দ করত না একেবারেই। তারা কলেজে উঠেছে সবে ফার্স্ট ইয়ারে—ললিতা বিশাখা! শে—ম্)

"কী গাইব?" শুধালো চন্দ্রাবাই অজয়কে। (অজয়কে ও চিনত। কারণ অজয়ের এক জমিদার বন্ধুর বাড়িতে দিনপনের আগে একটি গানের গরম আসরে চন্দ্রা ওর তব্‌লার লহরা শুনে সত্যিই মুগ্ধ হয়েছিল।) অজয় বিব্রত হ'য়ে বলল: "মর্জিমোতাবেক।"

চন্দ্রাবাই খুসি হ'য়ে ধরল চাঁদনি কেদারা।

ছায়া শুনে অবাক। ফিশ ফিশ ক'রে অজয়কে শুধায়: "কেদারায় কোমল নি।"

"চাঁদনি কেদারায় কোমল নি লাগে যে।"

"ও!"

সত্যি অতি সুন্দর সুরু করল চন্দ্রা। কিন্তু থেকে থেকে ও দেখে ডানদিকে বার চোদ্দটি লোক একেবারে কাঠের মতন ব'সে। ও বিরক্ত হ'য়ে উঠল। এরা কেন আসে ভালো গানের আসরে? বার বার তাকায় তাদের দিকে—কিন্তু কিছুতেই তাদের না দোলে ঘাড়ে মাথা, না জ্বলে চোখে আলো! বাইসাহেবার বিরক্তি ঝাঁঝালো রাগের দিকে মোড় নিল। ফলে গানটা জমল না।

উদার মহাখুসি : **everything is going according to plan**—এইই তো চাই।

চন্দ্রাবাইয়ের কেদারা শেষ হ'তে না হ'তে কাষ্ঠপুত্তলীদের একজন, কালাচাঁদ, বললেন : "একঠো বাংলা গান ফরমাইয়ে না।"

চন্দ্রা (সরোষ কটাক্ষে) : বাংলা গান! ময় নহি গাতি হুঁ।

কালাচাঁদ (ভাঙাহিন্দিতে) : কেঁ্যা! বাংলা গান কি মন্দ বোলনে চাতে হেঁ?

চন্দ্রাবাই (বিরক্ত হয়ে অজয়কে) : ক্যা বোলতা?

কালাচাঁদ : বোলতা যে, বাংলা গান অতি সুন্দর হোতা। হিন্দি গানা কেয়া বাংলা গানকা পাসমে দাঁড়ানে সক্তা?

ছায়া তো অবাক। এ কী কাণ্ড!

অজয় (বিব্রত স্বরে) : এসব তর্ক এখানে কেন কালাচাঁদ বাবু?

কালাচাঁদ (বিজ্ঞহেসে) : আরে মশাই, চিরটাকালই কি আমরা নিজবাসভূমে-পরবাসী হ'য়ে থাকব বলতে চান? (চন্দ্রাবাইকে) বাইসাহেব, হমলোগ তো আপকা গানা গাতা—আপ বাংলা গান নাহি গায়েঙ্গে এ ক্যায়সা বাত হয়?

চন্দ্রাবাই (দীপ্তকণ্ঠে) : রাজাসাব্! য়ে বেকুফকো নিকাল দিজিয়ে।

উদার খুব অনুতপ্ত তথা সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে মাফ চেয়ে কালাচাঁদের দিকে রোষকটাক্ষ করল—কালাচাঁদ খুসি হ'য়েই বেরিয়ে গেল। ওর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। উদার ওকে ব'লে দিয়েছিল—যে ক'রে হোক চন্দ্রাবাইয়ের মেজাজটি খারাপ ক'রে দেওয়াই চাই—তার পর ম্যাও ধরার ভার মৈনাকের।

অতঃপর উদার বাকায়দা চন্দ্রাবাইয়ের কাছে মাফ চাইল, কেবল এইটুকু ব'লে ফেলল—যেন মুখ ফস্‌কে—যে ভালো বাংলা-গান হয়ত বাইসাহেবা শোনেন নি।

চন্দ্রাবাই, ফুটন্ত মেজাজের তপ্ততেলে যেন ছ্যাঁক্ ক'রে লঙ্কা পড়ল, ব'লে উঠল রুষ্ট স্বরে: "বাংলা গান! ছোঃ! সুর তাল সব গলতি হয়।"

ছায়ার মুখ রাগে কালো হ'য়ে এল। বলল অজয়কে "এ কী বলছেন উনি অজয়দা?"

অজয় (জনান্তিকে): আহা, রাগ যখন চ'ড়ে যায় তখন কি আর কেউ ওজন ক'রে কথা বলে?

উদার (শুনতে পেয়ে): তবু বাংলা গানের এ ধরণের নিন্দে শুনলে অসিত কী ভাবত?

ছায়া (চাপা কণ্ঠে): ঠিকই তো। না অজয়বাবু, এ খুব অন্যায়—আপনি যাই বলুন। আমাদের দেশে ব'সে আমাদের গানকে যা তা বলবে আর আমরা শুনে যাব?

চন্দ্রাবাই এতক্ষণ সারঙ্গিওয়ালাদের বলছিল কেদারা থেকে মালকোষের পরদায় সুর বাঁধতে, কিন্তু ওদের চাপা গলায় ফিশ ফিশ শুনে উত্ত্যক্তও বোধ করছিল বৈ কি। বলল: "লড়কি ক্যা বোলতি?"

অজয় একথায় বিরক্ত হ'ল, জানিয়ে দিল বিনীত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে যে উদ্দিষ্টা 'লড়কি' নন ওস্তাদ।

চন্দ্রা (ভ্রূভঙ্গি ক'রে): বঙালিন্—ওস্তাদ! (সারঙ্গিওয়ালাকে) ধরো। ওরা ধরল।

চন্দ্রা গাইল একটি লক্ষণগীত মালকোষে:

তব মালকোঁস শুনি চতুর গায়
যব গম ধনিকো বিকরত বনায়
মেল করত মৈঁ রবিমধ্যমস্থর—ইত্যাদি

শেষ ক'রেই সে কী সার্গমের চরকি বাজি! সভায় সবাই অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল। কারণ এবার চন্দ্রাবাই গান গাইছিল আনন্দ-আবেশে নয় সবাইকে যেন ধম্‌কে দিতে। এক একটা সাড়ে সাত গজি তান ছাড়ে আর সেই কাঠের মতন জন এগার শ্রোতার দিকে থেকে থেকে অবজ্ঞাভরা তেরছা দৃষ্টি হানে।

গান শেষ হ'তেই তাদের মধ্যে একজন, মহীতোষ, বলল: "বা বা! ক্যা ঠুংরি!"

চন্দ্রা (কৃপাভরে): ঠুম্‌রী। য়ে মালকোঁসকা খ্যাল হয়।

মহীতোষ: খ্যাল। ও। হাঁ হাঁ। হম স্থনা: ধ্রুপদকো লড়কা, না বাইসাহেব?

(ঘরের মধ্যে হাসির গুঞ্জন)

চন্দ্রা (উদারকে): জনাব। য়ে সব বেওকুফ্‌ কোঁ্যা দিক করতে হৈঁ?

উদার (কৃত্রিম কোপে "মহীতোষ" ব'লে গর্জন ক'রে উঠে): বাইসাহেবা! শাস্ত্রমে বোল্‌তা যে অগর্‌ নীচ উঁচা বোলনেসে স্থবুদ্ধি—দ্যুৎ—বুদ্ধি যিস্কো হয় ও হঁসকে উড়ায় দেতা।

চন্দ্রা ওর হিন্দি শুনে হেসে ফেলল। ওর বিনীত ভঙ্গিতে একটু প্রসন্নও হ'তে হ'ল বৈকি। পরে বেশ গালভরা গোঁফের

একটা লেকচার দিল গান ও কদরদান সম্বন্ধে। তার সবটা ছায়া বুঝতে পারে নি, যেটুকু বুঝল তার মর্ম এই যে মালকোষ কী বস্তু বাঙালি জানবে কী ক'রে?

ছায়ার খুব রাগ হ'ল, বলল চাপা গলায় অজয়কে: বাঙালিদের এ ভাবে অপমান! ব'লেই উঠে যায় আর কি।

চন্দ্রাবাই কথাটা ব'লেই বুঝেছিল যে তার এধরণের কটূক্তি অন্যায় হ'য়ে গেছে। ভদ্রতা ক'রে বলল ছায়াকে বসতে।

ছায়া বসতেই ও ভদ্রতার সুরে জিজ্ঞাসা করল যার বাংলা তর্জমা হবে: হে বালিকা! তুমি কি মালকোষ রাগ চেনো যে অত রাগ করলে?

বালিকা (হঠাৎ শান্ত অথচ দৃঢ় সুরে): শুধু চিনি না —গাইতেও পারি।

চন্দ্রা (ভ্রূভঙ্গ ক'রে ঈষৎ হেসে): একঠো সুনানা। পেটি মঙাউঁ?

ছায়া অকুণ্ঠে বলল হার্মোনিয়াম দরকার নেই ওঁর সারঙ্গি ও তান্‌পুরার সঙ্গেই গাইবে।

উদার তো অবাক্‌। ছায়া যে রুখে উঠে গাইতে পারে এ যে অভাবনীয়! অজয়ও একটু নার্ভাস হ'য়ে পড়ল, বলল ছায়াকে: "চন্দ্রাবাইয়ের সামনে মালকোষ গাইতে পারবে ছায়া? ভেবে দেখো। এ রাগটার তো তেমন রেয়াজ তুমি করোনি। তার উপর ওড়ব রাগ—ধরো, তান টানে যদি ভুল হয়?"

অবিস্মরণে

ছায়া দৃঢ় কণ্ঠে বলল: হবে না। ব'লেই গর্বিত কণ্ঠে সারঙ্গিওয়ালাদের ইঙ্গিত ক'রেই চন্দ্রাবাইয়ের তানপুরোর সঙ্গে ধ'রে দিল মালকোষ ঝাঁপতাল—অসিতেরই শেখানো গান:

রাঙা জবা রাঙা করে রাঙা জবা রাঙা পায়।
রাঙা মুখে রাঙা হাসি রাঙা উষা শিহরায়।
(এলে রঙে রঙে মহাকালী
বলে কে বলে তুমি করালী?
ঝলে তোমারি কিরণমালী
কালো গগন-মেঘমালায়)

চরণের পরিমলে ধায় অলি দলে দলে
অাঁধারে আলোক জ্বলে রাঙা রবি উছলায়।

সমীপে সুদূর রাজে মনের ময়ূর নাচে
ধরা অভিসারে সাজে রাঙা রাগ মহিমায়।

এসো মা করুণাময়ী আড়াল থেকো না সহি',
অমৃতে বেদনাজয়ী করো রাঙা চেতনায়।

চন্দ্রাবাই প্রথমটা অবজ্ঞাভরেই শুনতে আরম্ভ করেছিল—শুধু অবজ্ঞা নয়, ওর মনের মধ্যে ছিল একটা বিরূপ ভাব। ওর পরে কোনো এমেচার বঙালিন্ গান গাইবে নির্ভয়ে—এতটা ও কী করে স'য়ে যায়। চিরদিন সব জায়গায় ও প্রথমার মর্যাদা পেয়েছে—ওর পরে বড় বড় ওস্তাদরাই গাইতে ভয় পেত—এ হেন গায়িকার সাম্‌নে গাইবে কিনা এক অখ্যাত অজ্ঞাত গৃহস্থ ঘরের কুমারী

মেয়ে, এ হয় কখনো ?—কিন্তু বড় ঘরের মেয়ে তো—তার উপর গান বোঝে, কৃতিত্ব কাকে বলে তারও খবর রাখে। নিজে প্রতিভাময়ী—প্রতিভাকে না চিনে পারে? মুখে স্বীকার করার কথা আলাদা—নানা কারণে হয়ত এক প্রতিভা আর এক প্রতিভাকে বড় জেনেও ছোট করতে চাইতে পারে, কিন্তু মনে মনে গুণী কখনো না জেনে পারে গুণীর গুণপনা? সে না জানলে জানবে কে?—নিকষ তো গুণী রসজ্ঞেরই মন। আলোর সবচেয়ে বড় গ্রহীতা কে আয়না ছাড়া? সুরের সাধনায় যার শ্রুতি হ'য়ে উঠেছে সূক্ষ্মতাভিমানিনী—তার মন বিরূপ হ'লেও ঠিক ঠিক সুরের আনন্দে প্রাণ কি পারে কখনো উদাসীন থাকতে? উদার খুব সাগ্রহে লক্ষ্য করছিল ওর মুখের আলোছায়ার পট-পরিবর্তন। প্রথম সেখানে ছিল অবহেলার কালো মেঘ। ছায়া আস্থায়ী ধরতে সে-মেঘের কৃষ্ণ আভা হ'য়ে এল পাণ্ডুর। যখন আস্থায়ীতে হঠাৎ ঝাঁপতাল থেকে আঁখর দিল একতালায় "এলে রঙে রঙে বনমালী—"তখন চন্দ্রা উঠল চমকে। তালের উপর এ কী আশ্চর্য নৈপুণ্য! বিষম-পদী তাল থেকে একতালায় নামল এত সহজে অথচ একটু হোঁচট পর্যন্ত খেল না—এ যে কতখানি ছন্দসাধনা হ'লে সম্ভব হয় তার খবর তো সে রাখে। তারপর আবার এ কী কাণ্ড!—ঝাঁপতালে ফিরে অন্তরা সেরেই হঠাৎ "সমীপে সুদূর বাজে—" সুরু হ'তেই আড় কাওয়া-লির অভ্যুদয়—এমন অকুতোভয়ে—অব্যর্থসন্ধানে!! আর এইটুকু মেয়ে!—চন্দ্রা দেখতে লাগল ছায়ার মুখ একদৃষ্টে। দেখতে দেখতে ওর চোখের দৃষ্টিতে আলো জ'লে উঠল—বড় কোমল আলো—সঙ্গে

তার যেন ঈষৎ অনুশোচনার ছোঁওয়া লেগে !—উদার লক্ষ্য করছে চন্দ্রাকে অনন্যমুখী অভিনিবেশে। অন্য সবাইও দেখছিল এই অভাবনীয় নাট্যরঙ্গ। সবশেষে চন্দ্রার চোখে বিস্ময়ের মশাল উঠতে থাকে ঝিলিক দিয়ে—একবার নয়, বারবার—যেই নানা স্বরবর্ণে ছায়া তান দিতে লাগল—কখনো "আ—জি" কখনো "মা—গো" কখনো "এ—লে" আঃ কী নিটোল স্বরবর্ণ। যেমন প্রাণবন্ত তেমনি কি সুরেলা! অথচ সেই সঙ্গে এমন নরম উদার! সব শেষে বিস্ময় তার রূপ নিল সম্ভ্রমে যখন ছায়া তানের পর তানের ঝলক ছড়াতে লাগল—কখনো তিনের কদমে, কখনো বা চারের, কখনো পাঁচের—অথচ সব ফিরে ফিরে এসে মিশে যায় আস্থায়ীর ধুয়োয়—সে কী অবলীলাক্রমে!

কিন্তু তবু ওর আত্মাদর উঠল মাথা চাড়া দিয়ে।

ও বলল যে এ-সুরূপ তো হিন্দুস্থানি থেকেই ধার করা।

ছায়া (সাশ্চর্যে): ধার করা?

চন্দ্রাবাই: থোড়িসি মিশ্র হয় মান্‌তি হুঁ। মগর মালকোঁস তো হমারী ঘরানি চীজ।

উদারের মুখ রাঙা হ'য়ে উঠল, বলল ছায়াকে একটা কীর্তন ধরতে।

ছায়া ধরল তৎক্ষণাৎ:

শ্রীচরণে নিবেদনে জানাই এ-মিনতি:
ছায়ায় আমার জাগাও তোমার আকুলতার জ্যোতি
(প্রভু ছায়ায় আমার আলো
তোমার আকাশ আকুল-আলো

ছায়ার আলো

আমার ঘুচাও সকল কালো
বধুঁ বাসাও তোমায় ভালো)
অশ্রু সাঁঝে এসো কাছে হ'য়ে ব্যথার ব্যথী
(পরে) ফুলের বাঁশি বাজিয়ে—নাশি' কাঁটার ক্ষত ক্ষতি

ব'লেই তাল ফের একতালা থেকে আড়কাওয়ালি :—

কূলে কূলে দুলে দুলে বিলাও অকূল-আলো
সুরে সুরে নীল নূপুরে উধাও শিখা জ্বালো
(কূল ছাড়ি না—নৈলে আমরা কূল ছাড়ি না
অকূল আলো নৈলে যে মোরা কূল ছাড়ি না)
গানে গানে উছল বানে বহাও রূপের গতি

ফের একতালায় প্রত্যাবর্তন :—

তোমার আশায় তোমার ভাষায় জ্বালাও প্রেম-আরতি
(হৃদি-মন্দিরে নাথ আরতি তোমার জ্বালাও
গীতি-যমুনায় বধুঁ জোয়ার তোমার জাগাও
প্রীতি-মূর্চ্ছনে বধুঁ বাঁশরী তোমার বাজাও)

গেয়েই তালফের একতালা থেকে ধামার :

তোমার আঁখির মিলন-মদির বিরহে মোর জ্বালো
তোমায় হিয়া সব সঁপিয়া চায় বাসিতে ভালো

সেই শিহরে ধায় সাগরে আমার হিয়ার নদী
(তোমার সাগরে—শিহর জাগরে—
তোমার অকূল-উছল আঁখরে)
ফের একতালায় প্রত্যাবর্তন :—

সীমা তরি' অসীম বরি' হোক সে নিরবধি।

চন্দ্রাবাইয়ের চোখে জল! গলার মালা খুলে ওর গলায় পরিয়ে দিয়ে বলল। "ধন্য, আপ ধন্য হৈঁ।"

ছায়া তো নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারে না। উদারের মুখ চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। ও চেঁচিয়ে উঠে বলল আমার মাথায় একটা কবিতা এসেছে। ব'লেই কুর্ণিশ ক'রে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করল নাটুকে ভঙ্গিতে (ছায়াকে লক্ষ্য ক'রে):

গাইলে যে-গান মায়াময়ী, বিজয়নিশান উড়িয়ে গো।
আনন্দের তরঙ্গ তুলে—ধুলায় মণি কুড়িয়ে গো!
অসীম উধাও সুরের হাওয়ায় গানের তরী ভাসিয়ে রে
এমন দোলে হৃদয়-তলে তুফান দেবে জাগিয়ে কে—
একটু ছুঁয়ে একটু ডেকে আকাশ ভরা সঙ্গীতে
অন্ধ নিশায় ছন্দদিশা চিকিয়ে লাজুক ভঙ্গিতে!
আধফোটা যে তারা তুমি তাই কি বাদল মান্‌ল হার?
আড়াল তো দুদিনের তরে—তোমার প্রকাশ আনল যার
মন্ত্র-যাদু—শ্যামল তিনি, তাই শ্যামলী সুন্দরী।
ছায়া তোমার অঙ্গে, আলো কণ্ঠে ওঠে গুঞ্জরি'!

কিন্তু—লিখেছিলো উদার অসিতকে—কী বলব ভাই; এ শুনে ও যেন এতটুকু হইয়া গেল। বলল বাধাদিয়ে মাঝপথেই: 'কেন আমাকে এভাবে বাড়িয়ে লোক হাসান্ উদারদা—আমি আর কখনো যদি আপনাদের এখানে আসি!—এ আমার ভালো লাগে না। না—না—না—' ব'লে চোখের জল চেপে হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে গিয়ে বসল গুম্ হ'য়ে ওর মোটরে। প্রীতি ও কান্তি অবাক হ'য়ে ওকে সান্ত্বনা দিতে ছুটল।

"অদ্ভুত মেয়ে নয় অসিত?"—লিখেছিল উদার সব শেষে পুনশ্চ দিয়ে।

অসিত হেসেছিল: একথা অসিতের চেয়ে বেশি কে জানে?

অদ্ভুত না? কতদিন অসিত ভেবেছে! উদার চিঠিতে ওকে এ ব্যাপারটা লিখেছিল ও যতটুকু জানে। কিন্তু সে জানত না ছায়া কেন চন্দ্রার পরে গেয়েছিল। সে-কথা জানত এক প্রীতি। প্রীতি ওকে লিখেছিল ব্যাপারটা তার দিক থেকে। সব বর্ণনা ক'রে লিখেছিল শেষে:

"কান্তি তো অবাক অসিদা। যে-মেয়ে চিরদিন গান করতে হবে ভেবে ভয়েই সারা—সে কি না বলতে না বলতে চন্দ্রাবাইয়ের মালকোষের পর মালকোষেরি গান দিল ধ'রে! কিন্তু আমি হইনি অবাক। আমার কাছে শুয়ে ও সেদিন গভীর রাতে বলেছিল ওর সব তাপ ভুলে: কী জাহিরিপনা হ'য়ে গেল মাসিমা!

'তবে গাইলি কেন পাল্লা দিয়ে?'

'না গাইলে অসিতদার অপমান হ'ত না?'

কথাটা কত বড় তুমি বুঝবে জানি। কিন্তু কজন বুঝবে অসিদা?"

সত্যি কথা—ভাবত অসিত প্রায়ই সম্প্রতি। অথচ এই ছায়াকে ও-ই কি বুঝত দুদিন আগে? শুধু দুদিন আগেই বা কেন? আজই কি খুব বোঝে?

উদারকে প্লাটফর্মে দেখে ওর মনে প'ড়ে যায় এই সব কথা। আরো কত কথা! ট্রেনটা কী কারণে প্লাটফর্মের কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। দেখে ও মুখ বাড়িয়ে। উদার ওর রেশমি ডোরা কাটা রুমাল নাড়ছে ঘন ঘন। কিন্তু তবু ট্রেনটা দেরি করে। তাই এসব স্মৃতিচারণের একটু সময়ও পায় বৈ কি।

উদারের ওখানে ওঠার কোন কথাই ছিল না অসিতের। বলতে কি, গত তিন চার মাস ও উদারের কোন পাত্তাই পায় নি। উদার ছায়া-চন্দ্রা-বিভ্রাটের খবর দিয়ে যে-চিঠি লিখেছিল মাস ছয়েক আগে তার উত্তর ও দেয় নি কারণ খবর পেয়েছিল ছায়ার কাছ থেকে যে উদার শিকারে গেছে—কিন্তু কোথায় তার কোন খবরই ছায়া দেয় নি। উদারের কাছ থেকে অসিত বহু দিন চিঠিপত্র পায় নি। উদার শরৎচন্দ্রের একটি কথার প্রায়ই প্রতিধ্বনি করত অট্টহাস্যের সঙ্গতে যে (চিঠি লেখাটা ও সংসারের কোন কাজের চেয়েই কম কঠিন মনে করে না) কাজেই ও যে ওর বালিগঞ্জের প্রাসাদে আছে এমন কথা ওর মনেও হয় নি। বলতে কি, ছায়া শয্যা নেওয়ার পর থেকে অসিত ছায়ার

কথাই ভাবত এত বেশি যে আর কারুর কথা যদি বা মনে আসত সে ছায়ার ভাবানুষঙ্গে—ওর সঙ্গে জড়িয়ে যাদের কথা মনে পড়ে শুধু তাদের চিন্তার রোমন্থন আর কি। তাই ও আরো চমকে গেল যখন প্লাটফর্মে নামতেই উদার ওকে ওর বিশাল বক্ষে লুটে নিয়ে বলল: "আর ছাড়ান নেই—এ-যাত্রা আমার ওখানেই কারাবাস তোমার বিধিলিপি।"

"সে কি? আমাকে যে চঞ্চল লিখল তাদের ওখানে থাকতে হবে?"

"চঞ্চলকে আমি অচঞ্চল মুষ্টিতে গলা টিপে খুন ক'রে যেদিন ফাঁসি যাব কেবল সেদিন পাবে তুমি সেখানে তার প্রেতাত্মার আতিথ্য—হা হা হা। সুভদ্র বাবু, দেখুন অসিতের মালগুলো—অন্য গাড়িটা ঠিক আছে তো?"

নিপুণ সেক্রেটারি মাথা নেড়ে বললেন: "আপনার কিছু ভাবতে হবে না। কেবল অসিত বাবুর টিকিটটা।"

* * * *
* *

রথ রাজপ্রাসাদে পৌঁছল বেলা বারটায়। টেলিফোন বেজে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

"কে?"

"আমি প্রীতি। অসিদা?"

'হ্যাঁ। ছায়া কেমন?'

'এখন একটু ভালো। তোমার এত দেরি? ট্রেন লেট বুঝি?'

—'হ্যাঁ প্রায় দেড় ঘন্টা। ছায়া খেয়েছে?'

—'এইমাত্র খাওয়া হ'ল। তুমি কখন আসছ?'

—'এক্ষুনি।'

—'খেয়েছ?'

—'ক্ষিদে নেই। ছায়াকে দেখে ফিরে খাব।'

—'না না। অমন কোরো না, ভাই। অনিয়ম করা কি ভালো?'

—'অনিয়মে আমাদের কিছু হয় না প্রীতি।'

অসিত হাসল। 'আমি রওনা হচ্ছি উদারকে নিয়ে—এক্ষুনি, ছায়াকে বোলো।

উদার বাধা দিল: "না না। ব'লে দাও আমি এখন যাব না। এখন তুমি একাই যাবে। এখন কি আর কারুর যাওয়া চলে—দ্যুৎ।"

অসিত ফের বলল টেলিফোনে: 'না উদার বলছে আমাকে একাই ও পাঠিয়ে দেবে।'

—'সে-ই হয়ত ভালো। উনি কেমন আছেন?'

—'সদানন্দ। কপালং কপালং কপালং মূলম্ ভাই—দাদু বলতেন মনে নেই?'

প্রীতি হেসে উঠল। কিন্তু সে-ঝঙ্কার আর নেই ওর হাসিতে।

* * * *
* *

ছায়ার আলো

দুবছর বাদে অদূরে সেই বাড়ি। কত আনন্দেই না কেটেছে এখানে দিনের পর দিন। আর আজ?

বুকের মধ্যে ওর কেমন ক'রে ওঠে।

* * * *
* *

উদারের 'রোল্‌স্ রয়েস' ছায়াদের গাড়িবারান্দার সামনে স্—স্ ক'রে দাঁড়াতেই অজয় নেমে এল। মুখ ওর বিষণ্ণ। কিন্তু হাসল তবু।

অসিত নামতেই প্রণাম ক'রে: চঞ্চল বাবু ফোন করেছিলেন এইমাত্র হাইকোর্ট থেকে।"

"ছায়া কেমন আছে?"

উত্তর না দিয়ে অজয় শুধু বলে: "চলুন।"

অসিতের মনের মধ্যে কালোছায়া আরো ঘনিয়ে এল। কিন্তু আর জিজ্ঞাসা করল না।

"চলো।"

সেই চিরপরিচিত ড্রয়িংরুম। সাম্‌নেই দেবদার মস্ত ছবি। নিচে ফুল। ধূপ জ্বলছে। অসিত বসল সেই মস্ত কাউচে। সাম্‌নেই গাড়িবারান্দা—ওধারে ছায়ার ঘর দেখা যাচ্ছে।

কমলা বেরিয়ে এল ধীরপদক্ষেপে।

"কখন এলে?"

"এইমাত্র।"

"সাড়াশব্দ পাইনি তো।"

অসিত ম্লান হাসে: "এবার নহে ধ্বনির অভিযান—একটা কবিতা আছে না?"

কমলা চোখ নিচু ক'রে একটু চুপ ক'রে রইল।

অজয় বলল: "ছায়া কি ঘুমিয়ে পড়ল হঠাৎ?"

"না। একটু সেঁক দেওয়া হচ্ছে ওর বুকে পিঠে—কাল ব্যথাটা বড্ড বেড়েছিল কি না।"

প্রতিমা ঢুকল। এ কী মূর্তি। অসিত চম্‌কে উঠল। মনে পড়ে শকুন্তলার ছবি:

বসনে পরিধূসরে বসানা
নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণী—

কেবল সেই ম্লান, স্নিগ্ধ হাসির ভগ্নশেষ থেকে একটু অনুমান করা যায় অক্ষুণ্ণ অবস্থায় সে-হাসিতে কী আলো জ্ব'লে উঠত।

"এসো ভাই। ভালো আছ?"

অসিত মাথা নাড়ল।

"বসো—কেবল—" ব'লেই প্রতিমা তাকালো অসিতের মুখের পানে।

"কী ব্যাপার?

প্রতিমা একটু চুপ ক'রে থেকে বলে: "ওর খুব কাছ ঘেঁষে না বসলেই ভালো।"

"কী যে বলো তুমি?"

"আমি না—ও-ই বলেছে তোমাকে বলতে।"

"কে? ছায়া?—ও আবার কী বলবে?" অসিত জোর ক'রে হাসে।

প্রতিমা ম্লান হাসে। বলে: "ঠিক সে ছোট্ট মেয়েটি তো আর নেই ভাই। এ-দুবছরে ও দশবছর বেড়েছে, এ-ও ওরি কথা।"

অসিত জিজ্ঞাসা করে: "আমি আসছি শুনে কী বলল?"

কমলা বলে সে-ইতিহাস। ছায়ার কাছে অসিতের আসার কথাটা একটু একটু ক'রেই ভাঙা হয়েছিল—নৈলে পাছে হিতে বিপরীত হয় আর কি। প্রতিমা অলক্ষ্যে অশ্রু গোপন করে।

"কী বললে ওকে?,,

এবার প্রতিমাই কথা কইল খুব মৃদুস্বরে: "ওকে প্রথম বলা হ'ল তুমি হয়ত আসতেও পারো। ও বিশ্বাস করল না। তাতে বলা হ'ল হয়ত দুএকদিনের মধ্যেই আসবে আশ্রমের কী একটা কাজে। তার পর—তুমি বলো কমলা।"

কমলা বলল: "প্রথমটায় ওর চোখ ছল ছল ক'রে উঠল। বলল: এ-গুজবটা সত্যি হ'লেও হ'তে পারে। তখন কী আর করি, বলতেই হ'ল সত্যিকথাটা—যে ওকে দেখতেই তুমি আসছ—আশ্রমের কোনো কাজে নয়।"

"তারপর?"

"সে বলা যায় না ভাই। ওর রক্তহীন মুখেও যেন রক্তের আভাস দেখা দিল। কিন্তু তার পরে ম্লানকণ্ঠে বলল: "এবার আর গান শেখা হবে না কমলাদি।"

কমলা আর বলতে পারল না চোখ মুছল।

* * * *

* *

চৌকাঠের উপরেই প্রীতি। নত হ'য়ে পায়ের ধুলো নিতে যায়—অসিত তাকে জড়িয়ে ধরে: "থাক্ ভাই থাক্।"

"নিতে দাও ভাই, কখন যে কী হবে কেউ জানে না—পায়ের ধুলোই তো হবে তখন পারানি।"

অসিত চম্‌কে যায়। এ-ধরণের কথা প্রীতির মুখে! ওর চোখের দিকে তাকাতেই সন্দেহভঞ্জন হয়? কোথায় আজ ওর সেই চঞ্চলা আনন্দময়ী মূর্তি? চোখের কোলে এমন ক'রে কালি মেড়ে দিলে কে! আহা!

কমলা প্রীতি প্রতিমা তিনজনে মিলে অসিতকে নিয়ে গেল অদূরে ছায়ার বিছানার কাছে। মনে পড়ে আজও সেকথা। সংসারে পথ দিয়ে পথিক চলে হাজার হাজার। এর থেকে ওর মুখের ভেদ তো থাকেই কিন্তু মনে থাকে না কাউকেই। তবু এক একটা মুখ স্মৃতির পাষাণে দাগ কেটে যায় যেন। স্বপ্নেও তাদের দেখা যায়। অগুন্তি অনামী দিনের মধ্যে এক একটা দিনের বেলাও বোধ হয় এম্‌নিই হয়। এ-দিনটির প্রতি কথা ওর মনের ফলকে উৎকীর্ণ হ'য়ে গেছে—থাকবে সে-দাগ জেগে বহু বিস্মরণের মাঝেও।

সেই হাসি, সেই চাহনি, ডাগর চোখে জল চিক্ চিক্ ক'রে ওঠা, সামলে নিয়ে ফের হাসা (ভাবটা—যেন কিছুই হয় নি, সবই ঠিক তেমনি কাছে।) সেই ধীরে ধীরে ওর শীর্ণ হাতটি বাড়িয়ে দেওয়া।

চম্‌কে যায় অসিত ওর শীর্ণতা দেখে। কিন্তু আরো চম্‌কে যায় বুঝি ওর দৃষ্টিপাতে। প্রতিমা ভুল বলে নি: সে ছায়া আর নেই।

বালিকা কৈশোর পেরিয়ে আজ যৌবরাজ্যের বিস্ময়লোকের রাণী—যদিচ কুমারী রাণী। অথচ—আশ্চর্য—সেই অবিস্মরণীয়া এ পরিবর্তনের মধ্যেও সমান জীবন্ত। "এক নদীতে মানুষ দুবার স্নান করে না"—বলেছেন গ্রীক দার্শনিক। অথচ করেও।

পর পর ওর কথাগুলি এত স্পষ্ট মনে হয় আজও এই সুদূর কাশ্মীরে। ওর সেই প্রায় যেন এক তরফা কথা—থেমে থেমে :—

"ট্রেনে কষ্ট হয় নি অসিদা ?—

"তুমি আসবে—কে ভেবেছিল ?—

"আগে আসতে বলি নি কেন ?—জানো না ?—

"গান শোনাবে? রো—জ ?—

"সত্যি বলছ ? আর কোনো কাজে আসো নি ? শুদ্ধু আমার জন্যে ?—

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ? না থাক্—

"করব ? আচ্ছা বলো তাহ'লে কারুর হুকুমে আসো নি তো আমাকে দেখতে ?—

"আচ্ছা অসিদা ! তোমার বুলবুল ওস্তাদ ব'নে যাবে কী ক'রে বিশ্বাস করতে পারলে বলো তো ? কে বলে তোমার মধ্যে অবিশ্বাস প্রবল ? তোমার যোগি-বন্ধুরাই জানেন তোমায় সবচেয়ে কম। অসম্ভব জিনিষে বিশ্বাসে তোমার জুড়ি নেই।—

এম্নি কত কথা।...

হঠাৎ সেই খোলা হাসি—একটিবার মাত্র :

"উদারদা বলেছে ? কেমন চন্দ্রাদেবীর সাম্নে তোমার বাংলা

গান গেয়ে দিয়েছি? বিশ্বাস করতে পারতে এ আমি পারি? অথচ কী বড়াই ক'রেই না ছক কেটে দিতে এই-এই আমি পারি, আর এই এই আমার সাধ্যের বাইরে। আর করবে অমন?"

সবচেয়ে করুণ হ'য়ে বেজে ওঠে দেহের শীর্ণতার পাশে ওর কথার বলিষ্ঠতা, নিয়তির অস্বাভাবিক নিষ্করুণতার পাশে ওর হাসি-গল্পের অদ্ভুত স্বাভাবিকতা। প্রাণের উচ্ছলতার রাঙা আলোর পাশে দেহের দুর্বলতার কৃষ্ণচ্ছায়া যেন উজ্বল শোকাবহতার ছবি-খানি হ'য়ে ফুটে ওটে।

ছায়ার ওখান থেকে বেরুতেই দেখে রাজসারথি কিঙ্কড় সিং মোটরের দোর খুলে দাঁড়িয়ে। বলল: "হুজুর—জনাব ইধর।"

বলতেই মোটর থেকে মুখ বাড়িয়ে উদার হাসে।

"এ কী ব্যাপার।"

"বাড়ি যাবে না?"

অসিত ঢুকল। বিরাট মোটর চলল—শ্—শ্—শ্।

"মোটরে ঠায় ব'সে?" বলে অসিত।

"গরজ বড় বালাই ভাই—বেদেই আছে।"

"কিন্তু মোটরে ব'সে কেন? একটা খবরও তো দেয় মানুষ?"

উদারের সহাস্য মুখ গম্ভীর হ'য়ে গেল: "আহা ওর কাছে এসেছ—কতদিন বাদে।"

অসিত প্রসঙ্গ বদ্‌লাতে বলল: "তোমার হাতে ও কী?"

"বাংলার গান—মাসিক পত্রিকা।"

"বাংলার গান?"

"হ্যাঁ প্রথম সংখ্যা। তুমি পাও নি?"

অসিত বলল: "হয়ত আশ্রমে গেছে আমি বেরুবার পর।"

"নিশ্চয় গেছে। আমি বলেছি—তবে তোমার তো পাওয়ার কথা তোমার রওনা হবার আগেই।"

"ডাকের গোলমাল আজকাল যা বেড়েছে—যুদ্ধে। —কিন্তু" কয়েকটি পাতা উল্টিয়ে: "এ কী? তুমিই এডিটর?"

উদার (আবৃত্তিভঙ্গিতে): রাজার কুমার হ'তে এডিটার
পারে না কি ভাই—হা দশা।
প্রশ্নে এ হেন আমি আজ যেন
দ—য়ে মজিলাম সহসা।

অসিত হেসে পাতা উল্টাতেই মুখ ওর গম্ভীর হ'য়ে গেল: "এ কী?"

তানপুরো নিয়ে ছায়ার ছবির—চমৎকার ব্লক। নিচে লেখা অসিতকুমারের বুলবুল—শ্রীমতী ছায়া দেবী।

"এ সব কেন? অসিত ভ্রূকুটি করে।

"কেন মানে?—বাংলা গানের কী দুর্দশা হয়েছে খবর তো রাখো না —ছায়াই তো আমাদের একমাত্র ভরসা মেয়েদের মধ্যে। ও গেলে কি আর—ও কী—।"

অসিত মুখ নিচু করে।

উদার ওর কণ্ঠবেষ্টন ক'রে বলে: "মাপ কোরো ভাই"—

অসিত জোর ক'রে হাসে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে—কেবলই ওর চোখের সাম্‌নে ভাসতে থাকে শ্যামলীর সেই ছায়াময়ী মূর্তি

"ছাড়ো ছাড়ো। এম্নি একটু—"ব'লে দুচারটে পাতা দ্রুত উলটিয়ে : "এ কী? বীরবালা?—কে?"

উদার মৃদুকণ্ঠে বলে : "ছায়া"।

অসিত : ছায়া? তার নামে ছড়া? এ আবার কার নাম? (হেসে) নিজবাসভূমে পরবাসী শ্রীহীন দুঃখীরাম যুগল? কাঁরা?

উদার : মহীতোষ আর কালাচাঁদ। মনে নেই? সেই?

অসিত : ও। চন্দ্রাবাইয়ের সভায় সেই দুই বঙ্গবীর?

উদার : বীর না হ'লে কি আর বীরবালা-প্রশস্তি মানায় ভাই? হা হা হা।

অসিত : কিন্তু এসব কেন? বীণা নিয়ে লাঠিবাজি?

উদার : ওসব রাবীন্দ্রিকী উপমা রাখো। ভালোমানষি ক'রে ক'রে বাঙালি যে দ-য়ে মজতে বসেছে সে-খবর রাখো?

অসিত : কি রকম?

উদার : চন্দ্রাবাই-পর্বের কন্টেক্স্ট-টি ভাবলেই মালুম হবে। (ত্রস্তস্বরে) ভাবো তো ভাই, আমারই ঘরে আমারই ভাইঝি কি না বলে 'বাঙালি মেয়ের গান আবার গান!' আত্মঘাতিনী!! ব'লে গর্জে উঠেই না আমি চন্দ্রাবাইকে ডাক দিলাম। কিন্তু এসব তো লিখেছিলাম খুলেই। ভুলে গেলে এরি মধ্যে?

অসিত : না না ভুলিনি—কেবল—

উদার : কেবল টেবল কিছু নেই। আমাদের করতেই হবে এর প্রতিকার, তাই তো কাগজ বার করেছি। অসিত ভাই, তুমি একাজে সহায় না হ'লেই নয় কিন্তু—না না আশ্রমে আর না—"

এসো আমাদের মধ্যে ফিরে। বোলো না দুর্গাদাসের মতন: "পারলাম না এ-জাতিটাকে টেনে তুলতে" ওকি? ছড়াটা? দাও আমি পড়ি—(ওর হাত থেকে পত্রিকা কেড়ে নিয়ে আবৃত্তি ভঙ্গিতে):

গানের স্বদেশে আসিয়া ঘোষিলা মারাঠিনী বাই সজনী:
"বাংলা গানের গগনে হায় রে ঘনায়ে এখনো রজনী।
তান-তাণ্ডব কোথা হেথা? —'দূন চৌদূন' সে-দুরন্ত?
হররা লঙ্কাকাণ্ড কোথায়?—চরকিবাজি জ্বলন্ত?
কোথায় শ্রোতা ও সমজদারের "শোম' নিয়ে সে-প্রাণান্ত?
বাঙালির গান 'কীর্তন'! সে কি গান রে মতিভ্রান্ত!
কালোয়াৎ সাথে তালিয়াৎদের কোথায় তাদের দাঙ্গা?
কাব্যের ফেন ছাড়ি' সুরমদে কবে হবি তোরা চাঙ্গা?
শিখিবি কবে সে-বাঁটের ঝটিকা, তুফান-তান-হলক রে?
পলাবে হস্তী কবে—হেরি' গলা-কুস্তিগীর ঝলক রে?
কথা নিয়ে ভাবাবেশ? ছি ছি! কোথা সার্গম অফুরন্ত?
অর্ধমুণ্ডপাত ক'রে কবে খেলবি নিয়ে কবন্ধ
'তেরেকেটে-ধেরেকেটে-ইলিমিলি'-গেণ্ডুয়াদের ছুড়ে হায়?
গানের কথারো মানে কি রে? শুনে গুণীর বুক যে ফেটে যায়।
'কানু কানু' ব'লে যত কাঁদে রাই, তত কাঁদে দেখ্ কানুরা।
কান্নার এ কী কম্পিটিশন—ধিক্ ধিক্ নতজানুরা।"
নিজবাসভূমে পরবাসীদল নাড়ে মাথা তারে তুষিয়া
দেখিয়া উঠিলা বীরবালা এক নাগিনীর সম ফুঁশিয়া:

অবিস্মরণে

"লঙ্কাকাণ্ড চায় যারা যেন শ্রীহনুর লেজ বরে গো।
হুংকার যারা চায়—শুধু যেন ঢাকেঢোলে কাটি ধরে গো।
আমরা বাহিব কাব্যতরণী তুলি' পাল সুরপবনে,
কবিতার মেঘে সবিতার ভায় রাঙি' জলধনু গগনে।
সুষমায় জাগে প্রাণ আমাদের, সংযমে রূপসিদ্ধি,
লাজুক স্বপনী সাধিবে বঙ্গে সুকুমারী পরিতৃপ্তি।
আঁখরের রংরেখায় আমরা ভাবের চিত্র রচিয়া
যুগল-মিলন-রাসে দিব ডুব চিরসুন্দরে ভজিয়া।
অশ্রুর মিড়ে গভীরের গাথা, ছায়াবুকে আলোবেদনা
আনে পরিচিতি গানে তাঁর—ব্যথা বিনা যাঁরে জানা যেত না।
গান-তাণ্ডবে কী সার্থকতা—বাঙালি যেন গো না জানে,
গান হোক তার প্রিয়ের প্রসাদ, জাহিরি যেন সে না মানে।
সভানটী! গান গাওয়া যায় শুধু সভাগৌরব ত্যজিলে।
গানে কভু মিলে গানের গোপালে প্রেমে তাঁর নাহি মজিলে?
মজিবার স্বাদ কেমন নটিনী, চাও যদি তুমি জানিতে
মুরলীর পথে অচিন বঁধুর অভিসার হবে মানিতে।"

বলিয়া বঙ্গবালা ধরে গান—কীর্তন প্রেমদীপ্ত:
সুরে ও ছন্দে সে কী অপরূপ নীলনির্ঝর-নৃত্য।
মধুমুরছনে, কোমল গমকে, ফুলতালে হেম-আঁখরে!
ভাবিনী ভাসিল, ভাসালো সবায় শ্যামলের প্রেমসাগরে

ছল ছল চোখে কহিলা মারাঠি বাই : "লো বিরহ-বালিকা।
চাহি ক্ষমা—ধরো কণ্ঠে তোমার আমার বরণ-মালিকা।
আমরা তো আজো জানি না কাব্য কারে বলে—সেই লজ্জা
করিতে গোপন বহি তনুদেহে গুরুভার সুরসজ্জা।
জানি না আমরা শোভনার বাণী, সুষমার পরিমিতি লো।
উচছ্ঙখল সুরের বিলাসে হারাই প্রাণের গীতি লো।"

* * * *

* *

শ্—শ্—মোটর ঢুকল উদারের মস্ত রাজপ্রাসাদের গেটের মধ্যে। অসিত নামতেই দেখে গাড়িবারান্দার সামনেই দাঁড়িয়ে চঞ্চল।

অসিত (চঞ্চল প্রণাম করতেই) : চঞ্চল? এ-ঠিকে দুপুরে?

চঞ্চল : কী করি দাদা—মহম্মদ যখন পর্বতের কাছে না যান—তোমার হাতে ও কী কাগজ? "বাংলার গান" না? (মৃদু হেসে) পড়েছ তো?

অসিত : মোটরে উদার শোনালো। একেবারে প্রপাগণ্ডা।

উদার : হ'লই বা প্রপাগণ্ডা। লিখেছি কেমন বলো? দুর্দান্ত না?

অসিত (সবিস্ময়ে) : ও রে! সুতরাং এ উপরালার রচনা! তবে যে মহাপ্রভু বললেন এইমাত্র তাঁর শ্রীমুখে যে এ-মহাকাব্যের প্রণেতা যুগলের নাম মহীতোষ কালাচাঁদ এণ্ডকোং?

উদার : ঐ যাঃ, হা হা হা। মিথ্যে কথায় আমার হাত, থুড়ি কণ্ঠ, কবে যে ঐসিতি পরিণতি নেবে ভাই—

চঞ্চল (হাসি সামলে) : ছায়াকে আজ কেমন দেখলে দাদা ?

অসিত উত্তর দিতে গিয়ে চুপ ক'রে যায়।

উদার (উদ্বিগ্ন) : কী ? এতই সীরিয়াস ?

অসিত : আমি কি ডাক্তার যে রায় দেব ?

চঞ্চল : তা তুমি যখন এসে পড়েছ দাদা, ওকে সারিয়ে তুলবেই।

অসিত (মৃদুকণ্ঠে) : মানুষ সারাতে পারে না ভাই, হারাতেই জানে।

চঞ্চল : অমন কথা মুখে আনতে নেই। কাল ওদের ডাক্তার বাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল—তিনি তো ভরসাই দিলেন।

অসিত (অন্যমনস্ক) : ডাক্তার ?···ওরা তো দেবেই ভরসা···

উদার (উত্তেজিত) : কী যে সব অলুক্ষুণে কথা ! না না না। ওকে বাঁচাতেই হবে। এমনটি আর মিলবে না ভাই। তুমি যতই বলো না বাংলা গানের সূক্ষ্ম দিকটা এমন ক'রে ফোটাতে আর কেউ পারবে না।। সত্যি অসিত," বলে ও একটু দম নিয়ে "কী গানই যে গাইল সেদিন। বিশেষ সেই শেষের 'শ্রীচরণে নিবেদনে' কীর্তনটা। কী চমৎকার তুলেছে ও তান, আঁখর, ভাবের আবেগ—কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা বলি ?—বলব কি অসিত, চন্দ্রাবাইয়েরও চোখে জল। সত্যি জল—H_2... । H_2O

"হ্যাঁ তুমি লিখেছিলে সেকথা চিঠিতে। কিন্তু কীর্তনের বাংলা চন্দ্রা সমঝে নিল কী ক'রে ?"

"বাঃ ! এখানে বছর দশেক আগে এসেছিল জানো না ? ও না—তখন যে তুমি আশ্রমে ব'সে যোগ করছ জানবে কী ক'রে,

তখন ও ছিল কলকাতায় প্রায় দুবছর। গোরাচাঁদের কাছে শিখত বাংলা 'ড্রয়িংরুম সং'—হা হা হা।

"তার পর?"

"তারপর আর কী? তিতিবিরক্ত। শেখা বন্ধ করল। তবে ড্রয়িংরুম সং শিখতে গিয়ে বাংলাটা শেখা হ'ল এইটেই হ'ল ওর—অর্থাৎ—নাকের বদলে নরুণ লাভের সেই পৌরাণিক কাহিনী।"

অসিত: তবু—বাংলা শেখা এক আর বাংলা কীর্তনে চোখে জল আসা—

উদার (হেসে): অঘটন-ঘটন-পটীয়সীর মায়া রে ভাই মায়া—হা হা হা। (গম্ভীর হ'য়ে) সত্যি অসিত, সেদিন যেন কিসের একটা আবির্ভাব হ'য়েছিল। তোমার কাছেই শুনেছি গানে এই আবির্ভাবের কথা—যে-আবির্ভাব তাঁরা দেখতে পান যাঁদের সে-তৃতীয় নয়ন লাভ হয়েছে।

চঞ্চল: সত্যি অসিদা! সভার মধ্যে শুধু দুচারজোড়া সমজদার বঙ্গবীর ছাড়া সবাই কেমন যেন থ হ'য়ে গিয়েছিল। বিশেষ যখন ও শেষের দিকে ধরল:

সেই শিহরে ধায় সাগরে আমার হিয়ার নদী
সীমা তরি' অসীম বরি' হোক সে নিরবধি।

উদার: আহা—কী সে গান।—মনে পড়ে অসিত, অমর কবির সেই চরণ কয়টি

(উদ্দেশে প্রণাম ক'রেই আবৃত্তি):

মহাবিশ্বঃ অনুকম্পায় ক্ষুব্ধ হয় না যাহার প্রাণ,
গাইতে হয় না রুদ্ধ কণ্ঠ মিথ্যা তাহার গাওয়াই গান।
হোক না সুন্দর স্বরের ভঙ্গি, হোক না শুদ্ধ তাল ও লয় :
গানের সঙ্গে নাইক প্রাণ যার তাহার সেই গান গানই নয়।

সত্যি ভাই ভুলব না সেদিন ওর রুদ্ধ কণ্ঠ। না অসিত ওকে বাঁচিয়ে তুলতেই হবে। যেতে ওকে আমরা দেব না।

"যেতে নাহি দিব"...ভাবে অসিত...

চঞ্চল হঠাৎ বলল : "কিন্তু শোনো অসিদা—আমাদের ওখানে যাবার সময় হ'ল যে ভাই।"

অসিত : তোদের ওখানে? সে কি?

চঞ্চল (সাশ্চর্যে) : প্রীতি বলে নি?

অসিত : না তো!

চঞ্চল : তাহ'লে ভুলে গেছে। আমি ওকে হাইকোর্ট থেকে টেলিফোনে বলেছিলাম তোমাকে যেন বলে বিকেলে আমাদের ওখানে তুমি চা খাবে!

অসিত : হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছিল। চল্ একটু চা খাওয়া যাক। যা ক্ষিদে পেয়েছে!

উদার (লাফিয়ে উঠে) : ও হো হো। দেখ দেখি। সুভদ্র বাবু এত ক'রে ব'লে দিলেন—আমি ভুলেই ব'সে আছি। তোমার দুপুরের খাওয়া?

অসিত : স্রেফ্ মনে ছিল না।

উদার : অ্যাঁ! কিচ্ছু খাও নি? জল টল—

অসিত : কী যে সব পাগলামি—ওখানে কি ওদেরই মনে ছিল, না আমার—

চঞ্চল (ব্যস্ত হয়ে) : কী বলো অসিদা। ট্রেন থেকে নেমে কিচ্ছু মুখে দাও নি ?

অসিত (হেসে) : তোদের ওখানে দেব—চল্ না। চলো উদার।

উদার (দুঃখিত) : আমারি অন্যায়।

চঞ্চল (হেসে) : কিচ্ছু অন্যায় নয়। গৃহিণী গৃহমুচ্যতে বলে গেছেন আমাদের ত্রিকালদর্শী মুনিঋষিরা সেই কবে। তাই তো বলেছিলাম উদারদাকে যে তোমাকে এবারটি ছেড়ে দিতে।

উদার : বটে আর কি। তোমাদের ওখানে তো প্রতিবারই থাকে আমি নতুন বাড়ি ক'রে অবধি—

চঞ্চল : কিন্তু আমাদের বাড়ি থেকে ছায়াদের বাড়ি কাছে হ'ত—

উদার : ফু—শ। আমার দু দুখানা মোটর রয়েছে কী করতে শুনি ? ফোন করতে না করতে ওকে উড়িয়ে নিয়ে যাব আসব। না না চঞ্চল, খুনখারাপি হ'য়ে যাবে। এবার ওকে আমার ওখান থেকে কোথাও নিয়ে যেতে দেব না।

চঞ্চল : সুনন্দা বলেছিল—

উদার : বলুক। বরং এক কাজ করো। তুমি তাঁকে নিয়ে চ'লে এসো সোজা আমার ওখানে। যত ঘর চাও দেব।

চঞ্চল : পাগল কি আর গাছে ফলে ?

উদার : ফের অমর কবির কথা মনে প'ড়ে গেল। অসিত তাঁর সেই গানটা কবে শোনাবে ভাই ? (ব'লেই আবৃত্তি) :

পাগলকে যে পাগল ভাবে
এখন সে পাগল কি ঐ পাগল পাগল
একদিন সেটা বোঝা যাবে।
নয় কে পাগল ভুবন 'পরে ?
কেউ বা পাগল মানের তরে,
কেউ বা পাগল রূপের লাগি' কেউ বা পাগল ধনলাভে।

সত্যি চঞ্চল, কী গানই লিখে গেছেন (উদ্দেশে প্রণাম)

চঞ্চল : মানছি, কেবল গানে হয়ত পেট ভরে না—অন্তত ট্রেন থেকে নামার পরে।

উদার : ও হো। ঐ দেখ, ফের ভুলে গেছি। তবে অমর কবি ব'লে গেছেন এই যা ভরসা "ব্রাহ্মণের ধর্ম—ক্ষমা।" চলো অসিত। চঞ্চল বঞ্চুক। আমিও চলছি কিন্তু। সাবধান।

চঞ্চল (উদারের আবৃত্তি ভঙ্গিতে) :
হে উদার, কারে তুমি কী দেখাও ভয় ?
ও ভয়ে কম্পিত নয় নন্দার হৃদয়।

উদার (টপ্ ক'রে) : হে চঞ্চল, ছাড়ো গর্ব মানো পরাজয়
নহিলে নন্দার দেখো কী দশাটা হয়।

কিঙ্করসিং! মোটর। আভি? আরে আভি তো বটেই।
এখনসে হামেশাই মোটর আভি চাহিয়ে। বুঝা ?

* *　　　　　　* *
*　　　　　　*

উদারের ক্ষোভের একটু কারণ ছিল বৈ কি। কলকাতায় অসিত ইতিপূর্বে এসে চঞ্চলদের ওখানেই থেকেছে বেশির ভাগ। উদার ওকে বলেশ্বর থেকে লিখেছিল দু একবার সেখানে আসতে। অসিত কী ক'রে যায় ছায়াকে ছেড়ে? উদার এখানে ওখানে ছায়ার গান শুনে মুগ্ধ হ'ত—গ্রামোফোনে রেডিওতেও। কাজেই ও বেশি পীড়াপীড়ি করে নি অসিতকে এজন্যে। ওর মধ্যে ছিল একটা আশ্চর্য উদারতা। ও বুঝত অসিতের নিজের সৃষ্টির জন্যে ছায়া ওর কাছে অমূল্য। অসিতকে ভালোবেসেও তাই ও নিজের কাছে আনবার বা রাখবার জন্যে জোরজুলুম করে নি। ছায়াকেও ও ভালোবেসেছিল, যদিও তার মধ্যে কল্পনাই জুগিয়েছিল স্নেহের ইন্ধন। অসিতকে ভালোবেসেছিল খানিকটা দেখে শুনে। তার উপর অসিতও ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের মহাভক্ত, বাংলাগানের একজন স্রষ্টা—কাজেই অসিতের 'পরে ওর কৈশোরের প্রীতি ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছিল যৌবনে। সে-প্রীতি গাঢ়তর স্নেহে পরিণত হয় প্রৌঢ়ত্বের কোঠায়। গাঢ়তর মানেই শুদ্ধতর। সুতরাং অসিতের দরবারে ওর প্রত্যাশা ছিল না বেশি। কিন্তু তবু অসিতকে দেখতে, কাছে পেতে, ওর গান শুনতে, ওর হাসির সঙ্গে নিজের হাসির স্বর মেলাবার সাধ থেকে থেকে এত ফেঁপে উঠত যে ও ঝড়ের ম'ত এক এক বার গিয়ে অসিতকে জাপটে ধরত: "চলো—আমার কুটীরে চলো বন্ধু (গুন্ গুনিয়ে):

'শুনিব বিরহনীরব কণ্ঠে মিলনমুখরবাণী'—হা হা হা।

অসিত মুগ্ধ হ'ত ওর বলিষ্ঠ স্নেহে, উদার হাসিতে, গভীর শ্রদ্ধায়। কিন্তু তবু ওর থেকে থেকে মনে হ'ত উদার বুঝি সেই

প্রকৃতির মানুষ যাকে বলে a creature of impulses অর্থাৎ ঝোঁকেরা ঝাঁক বেঁধে নীড় খোঁজে যাদের মধ্যে কায়েমি হ'তে। ছায়ার সঙ্গে উদারের স্নেহসম্বন্ধ ধীরে ধীরে গ'ড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওর এ-ভুল ভাঙে। ও তখন দেখতে পায় উদার সত্যিই উদার—তাই ঝোঁকালো সুরে "চলো"বলে যে পরমুহূর্তেই ভুলে যেতে তা নয়। বলতে কি, অসিতই এবিষয়ে বেশি 'ভুলো' ছিল। ও-ই ভুলে যেত উদারকে—উদার ওকে ভুলত না। তবে একথা অসিত অনেকদিন টের পায় নি। মিলনের একটা সহজ ক্ষেত্র না পেলে দুচারটে আলগোছে কোলাকুলি হ'তে পারে কিন্তু গলাগলি হবার পথ আলাদা। এই জন্যেই উদার যখন ওর কাছে থেকে থেকে ধূমকেতুর মতন দেখা দিয়ে ফের ধূমকেতুর মতনই চিহ্নহীন কক্ষপথে অদৃশ্য হ'য়ে আবার বহুদিন পরে ওর দৃষ্টিপরিধির মধ্যে ব্যথিত হ'ত সেই একই আকস্মিক ছন্দে—তখন ও উদারকে যেন ছুঁয়ে পেত, কিন্তু ধরতে গেলেই দেখত—ফরসা। হয়ত সেই জন্যেই এমন অদৃষ্টপূর্ব স্বভাবের মানুষটির সঙ্গে সহজ-প্রীতির একটা স্থায়ী মহলে বসবাস করতে ইচ্ছা হ'ত। অথচ সময় কই? সুযোগ কোথায়? জীবনে চারিচক্ষের মিলন যে হ'য়েও হয় না—আনন্দের প্রস্তুতি সত্বেও যে যোগাযোগ মিলেও মেলে না একথা অসিত জানত। তাই ও একবার সম্প্রতি উদারকে লিখেছিল:

মিলন হবার হয় যদি ভাই—দেখা হবেই হবে:
সুজন যদি জোগায় সুযোগ—বাধা দাঁড়ায় কবে?

রাখি আশা—সময় হ'লে পাবো তোমায় কাছে,
শুধু কে ঐ বলে যেন—আড়াল আজো আছে।
এমন সুদিন আসবে তবু (দুঁহুরই মন জানে):
ঘুচবে মেঘের ঘোমটা যেদিন রবির বরদানে।

এবার যেন সেই সুযোগ এল: ঘনালো মিলন-লগ্ন। যদিও ব্যথার পরিবেশে: ছায়ার প্রাণসঙ্কটের ভূমিকায়। উদার রুখে উঠল: আর উদারতা নয়—চঞ্চলের চঞ্চলতাকে বলার সময় এসেছে—লিখেছিল ও একদিন চঞ্চলকে:

যাও যাও যাও উদারতা ঢের করেছি ওগো।
ঢের ভুগেছি ঐ রোগে ভাই, এবার তুমিই ভোগো।

*   *   *   *
*   *

চঞ্চলরা অসিতের জ্যেঠামহাশয়ের ছেলে। তিন ভাই। তিনজনেই ভালো চাকরি করে। বড়র নাম সরল। ছোটর নাম সবল। সরলের স্বভাবটি ছিল গঙ্গাজলের মতন। যেমন তার প্রবাহ তেমনি স্বাস্থ্যকর। কোথাওএতটুকু ভান ছিল না—না আবিলতা। সবই সুখ-স্বচ্ছ—গতিশীলতা আনে যে-স্বচ্ছতা। বাইরে বদান্য, অন্তরে স্নেহশীল, সব রকম সংস্কৃতির দিকেই স্বভাবের সহজ অনুরাগ। সরলের স্ত্রী ইন্দিরা যেমন সুন্দরী তেমনি রাশভারি। বাড়ি শুদ্ধ লোক ওর ভয়ে অস্থির। দাদা তো ভয়ে কাঁটা—বলত চঞ্চল হেসে। সরলও খুব উপভোগ করত এধরণের ঠাট্টা। বাড়ির কর্তা হয়েও ও নিজে ছিল এমন নিরভিমান।

অবিস্মরণে

ইন্দিরাকে কিন্তু ভালোও বাসত সবাই। ওর স্বভাবের মধ্যে দুটো ধারা বইতো পাশাপাশি: একটা ধর্মের একটা সামাজিকতার। কিন্তু সময়ে সময়ে ধর্মের আনন্দ যখন ওকে পেয়ে বসত তখন ও সমাজ থেকে একটু দূরে স'রে যেত। ধর্মে ও আলো পেয়েছিল মনেপ্রাণে—শুধু আচারের স্বস্তি নয়, উপলব্ধির প্রসাদ। এরই ফলে ওর চরিত্রে এসেছিল গাঢ়তা—আচরণে সহজ অমুখর নির্লিপ্তি। অসিতকে ও বরাবরই স্নেহ করত আন্তরিক, কিন্তু অসিত আশ্রমে যাওয়ার পরে সে-স্নেহে ভাঁটা পড়ত (যেমন পড়েছিল ওর অন্য আত্মীয়দের স্নেহ-প্রবাহে) যদি না ধর্মের আন্তর অনুভূতি-লোকে ইন্দিরা অসিতের সঙ্গে একটা অসাংসারিক মিলের ক্ষেত্র পেত।

চঞ্চলের স্ত্রী সুনন্দা বা নন্দা ছিল যাকে বলে 'লক্ষ্মী মেয়ে'। চঞ্চল ছিল স্বভাবে রসিক—ডাকসাইটে হাসিয়ে। রসিকতা ক'রে ওকে প্রায়ই ডাকত অলকনন্দা বলে। কারণ নন্দা খুব দ্রুত ঘুরত ফিরত। তন্বী স্বাস্থ্যবতী মেয়ে, অক্লান্তকর্মিনী, সবাইয়েরই প্রিয়। "মুখে রা-টি নেই অথচ কাজে যেন দশভুজা—হবে না?" বলত চঞ্চল অম্লানবদনেই—"তার উপর নবদ্বীপদুহিতা—"

"তার ওপর চঞ্চলবনিতা" জুড়ে দিত অসিত। ভাদ্রবৌ ব'লে ও নন্দাকে মনে করত না—নিজের বোনের মতনই ছিল এ তিন ভাইয়ের তিনটি বৌ। চঞ্চল নন্দাকে ঘোমটা ছাড়িয়েছিল বাসর ঘর থেকেই। অসিত এদের এখানে থেকে বিশেষ আরাম পেত। যেখানে মেয়েরা ঘোমটা টেনে ঘুর ঘুর ক'রে বেড়ায় সেখানে ও স্বস্তি পায়নি কোনোদিনই। বিশেষ ভালো লাগত ওর চঞ্চলকে—

ওর রসিকতার জন্যেও বটে। কিন্তু অনুরাগের এর চেয়ে বড় কারণও ছিল: চঞ্চল অসিতের শুধু ভাই নয় —গুরুভাই।

নন্দা প্রথম প্রথম ওর স্বামীর ঠাট্টা তামাসায় একটু লজ্জা পেত বৈ কি। কিন্তু হিন্দু ঘরের মেয়ে তো—বুঝে নিতে ওর দেরি হয় নি যে এ-পরিবারে চলবে না নবদ্বীপের হালচাল—বিশেষ 'দাদা'-র আবির্ভাব হ'লে। অসিতকে ও দাদা ডাকত। দাদা-র প্রতি ভক্তি ছিল ওর যেমন সহজ তেমনি অনাড়ম্বর। একবার দুমেলের আশ্রমে গিয়ে ও ছিল অসিতেরই কাছে মাস দুই ওর ছোট্ট মেয়ে নদীকে নিয়ে। কাজেই অসিত ওকে মাঝে মাঝে

'ও গুরু বোন্ ও গুরু বোন্
আমি তোমার নই কি আপন'

ব'লে ছড়া কেটে খুব আদর করত। এখানে সত্যিই ওর সবচেয়ে আনন্দে কাল কাটত। এদের সঙ্গে কেমন যেন মিশ খেয়ে গিয়েছিল।

সবলের বৌ সুনীতিই কেবল অসিতের কাছ থেকে একটু দূরে দূরে থাকত। ইচ্ছা ক'রেই যে থাকত তা নয়। তবে দু দুটি ছোট শিশু। তার উপর কলেজের পড়া। কাজেই ইচ্ছা সত্ত্বেও বেশি আসতে পারত না। তবে সময় পেলেই মাঝে মাঝে অসিতের কাছে এসে বসত। অসিতের মনে হ'ত হয়ত ও কিছু বলতে চায়। কিন্তু ফের ওর মনে গুন্‌গুনিয়ে উঠত উদারকে লেখা ছড়ার দুটি চরণ:

রাখি আশা—সময় হ'লে পাবো তোমায় কাছে
শুধু, কে ঐ বলে যেন : আড়াল আজো আছে।

এদের এখানে থাকতে অসিতের ভালো লাগত আরো এই জন্যে যে এখান থেকে ছায়াদের বাড়ি ছিল মিনিট খানেকের পথ —কয়েকটা বাড়ি পরেই। অবিশ্যি ছায়ার সাহচর্যেই অসিতের বেশির ভাগ সময় কাটত। কিন্তু সেজন্য three musketeers এর কেউই ওকে জখম করত না, না তিরস্কারে না অভিমানে। অন্য কেউ হ'লে হয়ত ওদের অভিমান হ'ত কিন্তু ওরা স্বচক্ষে দেখেছিল ছায়ার দরুণ অসিতের নামডাক বেড়ে উঠেছিল। তাই ওরা ছায়াকে আরো স্নেহ করতে পেরেছিল। অসিত ছিল ওদের খুব আদরের ভাই। কাজেই অসিতের আদরিণী ছায়াকে ওরাও সাদরেই বরণ ক'রে নিয়েছিল— যদিও ছায়াদের সঙ্গে ওদের ঘনিষ্ঠতা যাকে বলে তা হয় নি। দেবদার সঙ্গে হৃদ্যতা ছিল বটে কিন্তু ছায়া পারত না সবাইয়ের সঙ্গে মিশতে—এর উপায় কি? 'ছি ছি ছি—কুনো—কুনো কুনো—'বলত ওকে লীনা হাততালি দিয়ে। ছায়া হেসে দিত পাল্টা উত্তর : "আর তুই? বুনো—বুনো—বুনো।"

কিন্তু কুনো হ'লেও ছায়া ভালোবাসত চঞ্চলের মেয়ে নদীকে। চারবছর মাত্র বয়স। যেমন দেখতে সুশ্রী তেমনি স্নেহে ভরা হৃদয়টি—ঐটুকু হ'লে কি হয়? আর কী চমৎকার যে কথার বাঁধুনি। অসিত প্রায়ই শুয়ে ওকে বলত ধমকে : "ও কি? গলা জড়িয়ে ধরলি না?" নদী বেশ বিজ্ঞভাবেই বলত : "এইটুকুন হাতে আর

কত গলা জড়াব?" উদারের ওখান থেকে ছায়ার ওখানে এলে অসিত প্রায়ই চঞ্চলদের বাড়িতে একটিবার অন্তত ঢুঁ মেরে যেত। এই দুঃখের দিনে নদীর "এইটুকুন হাতের গলা-জড়ানো" মিষ্টি হাসি, কালো চোখের চাউনি আর শ্রান্তিহীন কথার কলগান ওর মনের অনেক দুঃখের পলিমাটিকেই নিয়ে যেত ভাসিয়ে। নদীকে ওর আরো ভালো লাগত এই জন্যে যে ও ছায়াদিকে সত্যি ভালোবেসেছিল। তবে যাকে বলে বাঁশি শুনে—চোখে দেখে নয়। কারণ বেশি তো সে দেখেনি ছায়ামাসিকে। আগে আগে কখনো কখনো দেখত ছায়াকে মোটরে পাশ দিয়ে যেতে। কিন্তু ছায়া শয্যা নেওয়ার পর ওকে দেখতে না পেয়ে মাঝে মাঝে বায়না ধরত: "ছায়ামাসিকে দেখতে যাব মা।" অমনি ইন্দিরা উঠত ধমকে: "না"। আর কথাটি নেই। বড় জ্যেঠিমা একবার 'না' বললে এ বাড়িতে তাকে 'হাঁ' করাতে পারে এমন বুকের পাটা কার? তাছাড়া অসিতও ওকে মানা করত। বলত: "ছায়ামাসির যে অসুখ মা।"

"তাতে কি? তুমি যাও না?"

"আমি যে মস্ত—তুমি যে এইটুকুন।"

ওর বড় বড় চোখদুটি মেলে ও বলত: "মস্তদের কি অসুখ কম করে মণি। তাহলে ছায়ামাসির বাবা ম'রে গেল কেন?"

নন্দা ওর মোজা বুনতে বুনতে ধমকে উঠত:

"থামবি তুই, মেয়ে। অত বকে না।"

নদী ওর মাকে গ্রাহ্যও করে না: "জ্যাঠামণি। ছায়ামাসির বাবা কেন মরবার সময় ভগবানকে ডাকল না? ডাকলেই তো বাঁচত।"

ভগবানে ভক্তি ওর কাছে এত সহজ। অসিত অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে। যদি ছায়ার থাকত এম্নি সহজ ভক্তি।

নন্দী যেন ওর মনের কথা টেনে বার করে: "জ্যাঠামণি ছায়ামাসিকে তুমি বল না কেন রোজ খু—ব ভগবানকে ডাকতে। তাহ'লে দেখতে ও সেরে যেত।"

নন্দা (মোজা বুনতে বুনতে): থাম্ থাম্ ফাজিল মেয়ে। ভগবানের তো উনি সবই জানেন কি না।

নন্দী (হাত মুখ নেড়ে): জানিনা বৈ কি। সেদিন আমার পেটব্যথা করছিল না? (শাসিয়ে): কী? করে নি?

নন্দা (অসিতের পানে চেয়ে): দেখছেন দাদা, কী রকম ধম্‌কাচেছ আমাকে?

অসিত (হসে): রত্নগর্ভার রত্নগর্ব বুঝি?

নন্দী ভদ্রতার কোড মানে না, অসিতের কাছে এসে তার চিবুক ধ'রে মুখ ফিরিয়ে বলে: "আঃ বলো না জ্যাঠামণি! মা আমার কথা শোনে না।

নন্দা (কৃত্রিম কোপে): শুনি না? নেমকহারাম মেয়ে কোথাকার। দিনরাত তোমার ছাড়া আর কারুর কথা শুনতে পাই?

নন্দী: ঈ—শ্! বাবার কথা?

নন্দা সলজ্জ হাসে। কারণ যদিও অসিতকে ও দাদাই মনে করে—ভাশুর একবারও মনে হয় না—তবু মেয়ে কখন যে দুমদাম ক'রে কী ব'লে বসে কার সাম্নে—করুণ নেত্রে তাকায় স্বামীর পানে।

চঞ্চল (নদীকে) : ফাজলামির আর জায়গা পাওনি, না ?

নদী : ঈশ্! সারারাত মাকে কী হুকুম করো তুমি বলো তো ?

চঞ্চল (অসিতকে) : দেখছ দাদা, কী বলছে আমাকে মেয়ে —তোমার আস্কারা পেয়ে ?—যে-আমি চিরটাকা—ল কিনা মেয়েদের হুকুমবরদার—

অসিত : নন্দরাণী ! ছি ! কাল থেকে ওর পাতের ভাজা মাছটি উল্টে দিও। বেচারি !

নদী (সোৎসাহে) : শুধু মাছ কি জ্যাঠামণি ! মা কাল বাবার দুধের বাটি পর্যন্ত দিয়েছিল উল্টে।

নন্দা (রেগে): তুই থাম্‌বি ?

নদী : কিছু বো—লতেই পারলাম না, তা থামব।

চঞ্চল (একগাল হেসে) : দাদা, কোত্থেকে এ মেয়ে কথা শিখল বলো তো—আমি-হেন মুখচোরা বাপের মেয়ে হ'য়ে ? (নন্দাকে) কি গো এখানে আমাকে ভুল বোঝাওনি ত ? দেখো।

নন্দা (রাগত) : কী যে বলো—ঠাট্টার যেন একটা মাথামুণ্ডু নেই (উঠে যায় আর কি)

অসিত (ওকে কাছে টেনে সাদরে) : আহা বোসো নন্দরাণী, বোসো ঠাট্টায় রাগ করতে আছে ?

নন্দা (সাভিমানে) : তা—এধরণের ঠাট্টা আমার একটুও ভালো লাগে না

অসিত (গম্ভীর ভাবে) : কী সর্বনাশ। তুমি যে ব্রাহ্মগার্লস্ স্কুলে পড়েছিলে তা তো এতদিন বলো নি একবারও।

নন্দা (বুঝতে না পেরে) : সে কি দাদা ?

চঞ্চল : দাদা, কার সঙ্গে কথা কইছ ? গাল টিপলে যার এখনো দুধ বেরোয়—

অসিত : তাই বুঝি সকালবেলা গালদুটি এত সাদা দেখি নন্দরাণী ?

চঞ্চল (হো হো ক'রে হেসে): দাদা পায়ের ধুলো দাও

উদার (হঠাৎ প্রবেশ—কয়েক মিনিট দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল নাটকীয় ভঙ্গিতে প্রবেশ করবে ব'লে—ঢুকেই আবৃত্তিভঙ্গিতে)

দাও বন্ধু, দাও নন্দা দেবীকে তোমার
চরণের ধূলা এবে—গাল শুভ্র যার
সাধুপদরজে তার চির-অধিকার
এ হেন বিভূতি পাশে পাউডার কী ছার!

নন্দাকে এবার ধ'রে রাখা গেল না—লজ্জায় আরক্ত মুখে পালিয়ে গেল।

ওদের হাসি থামতে না থামতে নদী বলল : "কিন্তু আমার কথাটা বলাই হ'ল না।"

চঞ্চল : ওর নাম হওয়া উচিত ছিল ভবী—ও ভোলে না।

উদার : না না তুমি বলো। আর কেউ না শোনে আমি শুনব

নদী (ঢোঁক গিলে) : হঁ্যা, বলছিলাম কি, সেদিন—একদিন—করেছিল আমার পেটব্যথা। সে কী ব্যথা যে! খুব ব্যথা—না বাবা ? আচ্ছা। তারপ—র(ফের ঢোঁক গিলে)হোল কি, সামনে (গুরুদেবের ছবির দিকে দেখিয়ে) ঐ ছবির সামনে গড় হ'য়ে বললাম : ঠাকুর! সারিয়ে দাও। অমনি—জানো জ্যাঠামণি ? ব্যথা নেই!

অসিত (চমকে): সে কি রে?

নদী সগৌরবে); একেবারে নেই—সত্যি বলছি। অ্যাঁ বাবা? আছে?

চঞ্চল: কথাটা সত্যি।

উদার: ওষুধ টষুধ—

চঞ্চল: না ওষুধ টষুধ ও খায় না বড় একটা। তাছাড়া এরকম ভাবে ছবির সামনে গড় করে ওর তিন চার বার ব্যথা সেরে গেছে, তাই ব্যথা হ'লেই ও সব আগে ছুটে যায় ছবির কাছে।

শুনতে শুনতে অসিত অন্যমনস্ক হয় ফের। উদার চঞ্চলকে কী বলছে কানে আসে না। মনে প'ড়ে যায় গুরুদেবের কথা। সরল বিশ্বাসের সহযোগ পেলে অনেক শক্ত রোগই যে সারানো যায় এ শুধু যে ও তাঁর শ্রীমুখে শুনেছে তাই নয়—স্বচক্ষে দেখেছে। ওর মনে পড়ে বম্বেতে ওর এক গুজরাতি বন্ধুর কথা। তার মৃগীরোগ ছিল জন্মাবধি। গুরুদেবের এক জন্মোৎসবে সে আসে। গুরুদেবের পায়ে মাথা রেখে সে অনেকক্ষণ প্রার্থনা করে রোগমুক্তির। তারপর থেকে তার আর একটিবারও মূর্ছা হয় নি। ভাবতে ভাবতে মন ওর বিষাদে ছেয়ে যায়। আহা ছায়ার যদি থাকত এই ধরণের দৃঢ় বিশ্বাস।

নদী (পিছন থেকে ওর গলা জড়িয়ে ধ'রে): কী ভাবছ জ্যাঠামণি,

উদার: তুমিই বলো না শুনি।

নদী: আমি জানি। বলব?

অসিত (হেসে): ঈ—শ্।

নদী (রুখে উঠে) : ঈ-শ্ বৈ কি। তুমি ভাবছিলে—যার জন্যে কলকাতা এলে সে যদি গুরুদেবকে নদীর মতন ডাকতে পারত!

অসিত চমকে ওঠে। উদারের সঙ্গে ওর দৃষ্টিবিনিময় হয়।

চঞ্চল : কে ও? "কেও? সুনীল? কী ব্যাপার?

সুনীল (অসিতকে প্রণাম ক'রে) : "ডাকছে—গান শুনতে চায়।"

* * * *

* *

সুনীল ছেলেটি অসিতের দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি। ছায়াকে যখন ও প্রথম গান শেখানো সুরু করে তখন সুনীল অসিতের সঙ্গে ছায়াদের ওখানে রোজই আসত। ওর শরীর ছিল অত্যন্ত অপল্কা—কাজেই চাকরি বা পড়াশুনো কিছুই ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কমনীয় ছেলেটি। বয়স উনিশ কুড়ি। ছায়ার কাছে দুদিনেই সে হ'য়ে উঠল অপরিহার্য। ছায়ার গান শেখানো, এখানে ওখানে যাওয়া আসা, ওস্তাদি গানের আসরে সঙ্গ দেওয়া, নানা রাগরাগিণীর খবর দেওয়া, এসবেই ছিল ও অগ্রণী। সুরের কান ছিল ওর খুবই পাকা। তাই ছায়া ওকে খাতির করত। ভালো গানের ঢঙও সুনীল চিনত। পড়াশুনো বা কাজকর্ম না থাকায় ও গান বাজনার চর্চায়ই সময় কাটাত। কলকাতার সব ওস্তাদের হালচালই ছিল ওর নখদর্পণে। তাই ছায়ার কাছে ও ছিল একজন ওস্তাদি সাংবাদিকও বটে। কিন্তু ওদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সম্বন্ধ ছিল

অনাবিল বন্ধুত্বের। সবাই জানত সুনীল ছায়ার শুধু গানের নয় সবকিছুরই পরম ভক্ত। ছায়া ওর ভক্তিতে মুগ্ধ হ'য়েই ওকে প্রতিদানে দিয়েছিল ওর সরল স্নিগ্ধ কৃতজ্ঞ স্নেহ। প্রায় কোনো লোককেই ও ফর্মাস করতে পারত না। কিন্তু সুনীলকে এটা চাই ওটা চাই বলতে ছায়ার বাধত না। কারণ ও জানত ওর কোনো কাজে আসতে পারলে সুনীল নিজেকে ধন্য জ্ঞান করবে—নৈলেই পাবে দুঃখ। ছায়ার অসুখের সময় সুনীল শুধু রাতে শুতে বাড়ি ফিরত—সারাদিনই উদ্বিগ্নমুখে থাকত হরিশমুখার্জির রোডে—কখন ছায়ার কী দরকার হয়—কে জানে? এইভাবে ওর সদা-সজাগ সেবার জোরে সুনীল ছায়াদের পরিবারেই একজন হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। অসিতকে চঞ্চলদের বা চক্রধরদের বাড়ি থেকে ডেকে আনা ছিল ওর একটি নিত্যকর্ম বললেই হয়।

আর অসিতের নিত্যকর্ম ছিল সুনীল ডাকলেই যাওয়া: চক্রধরদের ওখান থেকে—সকালবেলা, কিম্বা চঞ্চলদের ওখান থেকে—বিকেলবেলা: লোকজন ওর সঙ্গে দেখা করতে এলে আসত এই দুটি বাড়িতেই। কারণ ছায়াদের ওখানে এসময়ে সাক্ষাৎ-প্রার্থীদের আসা না ছিল সম্ভব, না বাঞ্ছনীয়। তাই অসিত ভেবেচিন্তে ঠিক করেছিল যে নিতান্ত নাছোড়বন্দদের সঙ্গে এই দুটি বাড়িতেই দেখা করবে সকালে একঘন্টা বিকেলে একঘন্টা। ব্যস্। ও সবাইকেই ব'লে দিয়েছিল—যে ও কাউকেই এ যাত্রা বেশি সময় দিতে পারবে না—কেন না এবার ও এসেছে শুধু ছায়ারই জন্যে। তাছাড়া হাসি-গল্পালাপে ওর মন বসত না বেশিক্ষণ।

অবিস্মরণে

স্বভাবের সহজ উচ্ছলতার জন্যে ও দুঃখেও হাসতে পারত বটে কিন্তু এবার ও লক্ষ্য করেছিল নিজের মধ্যে অনেক পরিবর্তন। উদারও বলত ওকে একথা। সে-পরিবর্তনের ফল ফলেছিল নানা ভাবে। একটা জিনিস সবারই চোখে পড়েছিল: যে, বেশিক্ষণ বাজে গল্পগুজব ও শুনতে পারত না। হয় উঠে যেত—নাহয় অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ত। অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে ও সচরাচর করত কৃষ্ণ-মন্ত্র জপ কিম্বা গুরুদেবের ধ্যান। আর যখন উঠে যেত তখন তো কথাই নেই। তখন ও ছায়ার জন্যে প্রার্থনা করতে বসত: হয় চক্রধরদের ওখানে সেই বিগ্রহের সাম্নে—নাহয় নিজের শয়নকক্ষে গুরুদেবের ছবির কাছে।

* * * * * *

ছায়া সময়ে সময়ে চাইত ওর সঙ্গে একলা কথা কইতে। প্রতিমা ও প্রীতি দুজনেই সেটা বুঝত। সে সময়ে ওরা থাকত পাশের ঘরে।

এই সময়েই ছায়া সব চেয়ে অবাক করেছিল অসিতকে। মনে পড়ত প্রতিমার কথা কেবলই: এ দুবছরে সত্যিই ওর দশবছর বয়স বেড়ে গেছে। এখন ওর সঙ্গে শুধু যে জীবন নিয়ে একটু গভীর আলোচনা করা সম্ভব তাই নয় ওর অনেক মতের সঙ্গে অসিতের মতেরো হ'ত মিল। যেমন যখন ও বলত: "মানুষকে খুব বেশি বিশ্বাস করতে নেই—বিশেষ ক'রে তাদের যাদের মুখ বেশি মিষ্টি।"

কিম্বা—

"স্নেহ করব সেটা মুখের কথায় প্রকাশ করতে হবে তবে মানুষ বুঝবে অসিদা? এমন মানুষকে না-ই বোঝালাম।"

কিম্বা—

"বাঁচার চেয়ে মরাটা যে খারাপ এটা ধ'রে নিই কেন অসিদা? কেন বলি বাঁচতে চাওয়াটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ? আমার তো মনে হয় বেশি অসুস্থ সে-ই যে এই তুচ্ছ আয়ুটা একটু বাড়াবার জন্যে আকুলি বিকুলি করে। ঐ গানটা গাও না অসিদা, কী যে ভালো লাগে আমার—ঐ একই ঠাঁই চলেছি ভাই।

অসিত গাইত অমর কবির গান:

একই ঠাঁই চলেছি ভাই ভিন্নপথে যদি।
জীবন—জলবিম্ব সম, মরণ—হ্রদ-হৃদি।
দুঃখ মিছে কান্না মিছে
দুদিন আগে দুদিন পিছে
একই সেই সাগরে গিয়ে মিশিবে সব নদী।

"কী সুন্দর!"

"কী বললি?"

"না। গাও—" ব'লে নিজেই ধরে খুব আস্তে গুন্ গুন্ ক'রে নৈলে পাছে প্রীতি ও প্রতিমা ছুটে এসে মানা করে):

একই সেই নিরাশা আছে ঘেরিয়া চারিধারে
জ্বলিছে দীপ, নিভিছে দীপ সেই অন্ধকারে।

অসীম ঘন নীরবতায়
উঠিয়া গীত থামিয়া যায়…
বিশ্ব জুড়ি' একই খেলা চলেছে নিরবধি।

গাইতে গাইতে ওর চোখে জল ভ'রে আসে। অসিত মুছিয়ে দিত আদর ক'রে। ও বলত: "সত্যি অসিদা, সবই জানি দুদিন আগে দুদিন পিছে—তবু কেন যে এই ঘন্টা-পড়ার আগুপিছুতেই এত ব্যথা—" ও পাশ ফিরে চুপটি ক'রে শোয়। অসিত ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। ভাবে ছোট্ট মানুষটি কত বড় হ'য়ে গেছে সত্যি—এ দুবছরে।

* * * *
* *

বড় হয়েছে বৈ কি। গতবার যখন অসিত কলকাতায় এসেছিল সুনীল ওর সঙ্গে আসত প্রায়ই ছায়ার গান শুনতে কিন্তু মাঝে মাঝে। সে তখন বেশি গান বুঝত না তবে খুব ভালো কান তো—রাগ রাগিণী চিনে নিতে দেরি হবে কেন? স্বভাবে স্বল্পবাক্, দেহে দুর্বল, আকৃতিতে সুদর্শন ও প্রকৃতিতে শান্ত ছেলেটির উচ্ছ্বাস ছিল আশ্চর্য কম কিন্তু তাই ব'লে আবেগ ছিল না অগভীর: ছায়ার গান শুনতে শুনতে সে গভীর ভাবে বিচলিত হ'ত। অসিত তাকে আগে তেমন লক্ষ্য করে নি। এবার করল। ছায়ারই বয়সী। কিন্তু সেও যেন অনেকটা বড় হয়েছে। ছায়ার দুঃখে আরো। কারণ ছায়ার জীবনের শোক ও দুর্দৈবের সময়ে সে প্রায় সর্বদাই তার আনাচে কানাচে ঘুরত। একে ছায়ার কণ্ঠ ও হৃদয়

তার উপরে ওর নিঃসহায় চাপা বেদনা—সুনীল কী করবে ভেবে অস্থির। কিন্তু মুখে কিছু বলত না—ছায়ার কাজে আসতে পারলেই হ'ল। এইভাবেই সুনীলের সঙ্গে ছায়ার একটা অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ অত্যন্ত সহজেই গ'ড়ে উঠেছিল। সুনীলকে খুব কম লোকেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনত। কিন্তু ছায়া ওকে সহজেই বন্ধু ব'লে বরণ ক'রে নিয়েছিল। দরদী বন্ধু আজ সেবক বন্ধু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ছায়ার জীবনের পরিধির মধ্যেই এখন ওর চলাফেরা। এ এক নতুন ধরণের রোমান্স। অসিত মাঝে মাঝে ভাবত উপন্যাসে লিখলে লোকে হয়ত বড় জোর একটা কৃপার হাসি হাসবে। কিন্তু অসিত সুনীলের এই অনাড়ম্বর স্নেহকে শ্রদ্ধা না ক'রে পারে নি। বিশেষ ক'রে সুনীলের সংযম। আজকাল ছেলেদের মধ্যে এ ধরণের সংযম দুর্লভ ব'লেও আরো ছায়ার সঙ্গে সুনীলের এই অভাবনীয় রোমান্টিক সম্বন্ধ মন টানত ওর। আনন্দর একটা কথা ওর মনে পড়ত প্রায়ই: "অসিত, নরনারীর স্নেহ সম্বন্ধ বড় বিচিত্র। যদি ঠিক পথে চলে তবে এ ওর ভালো দিকটাই উস্কে দেয় কিন্তু ছন্দপতন হ'তে না হ'তে ঘটে ঠিক উল্টো একজন আর একজনের চলার পথে শুধু বাধা নয় কাঁটাবনের মতন হ'য়ে ওঠে। পরমহংসদেবের সেই ঢোঁড়া সাপের ব্যাং গেলার উপমা মনে পড়ে—যে গিলেও না পারে উদরস্থ করতে, না উগ্‌লে ফেলতে।" একথা অবশ্য ও বলেছিল দাম্পত্য সম্বন্ধের সম্বন্ধে কিন্তু নরনারীর নানা সৌহার্দ্যের মধ্যেই এসম্বন্ধের মাধুর্যের কিছু না কিছু ছিটেফোঁটা এসে পড়েই—কে না জানে? না-ছোঁওয়া

ফুলের মতন স্বভাব যার সে যেখানেই এ-সম্বন্ধ স্থাপন করুক না কেন সেখানেই অন্যপক্ষকেও শুদ্ধিদান করে একথা অসিতের চেয়ে বেশি কে জানে? কেউ কেউ ওকে বলেছিল সুনীলের সঙ্গে ছায়ার এতটা মাখামাখি যাতে না হয় সে দিকে ওর দৃষ্টি রাখা উচিত। অসিত বলত হেসে: "ছায়াকে যদি চিনতে ভাই।"

এবার এসে দেখল ও সুনীলের ম্লান মুখ। দেখে মুগ্ধ হ'ল। ছায়াদের দুঃখে দুর্দিনে অজয় আর সুনীল ছিল ওদের নিত্যসাথী।

কিন্তু দুটো নতুন জিনিস ওর চোখে পড়ল। এক: ছায়ার প্রতি সুনীলের যে প্রীতি আগে শ্রদ্ধার ছন্দেই প্রকাশ পেত এবার সে অনেকটা খোলাখুলি সমবেদনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ্য ভালোবাসার ছন্দেই দিত নিজেকে জানান। দুই: ছায়া সুনীলের এ-সমবেদনাকে অঙ্গীকার ক'রে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর ভালোবাসাকেও স্বতঃসিদ্ধের মতন ধ'রে নেয়নি—কৃতজ্ঞ হয়েই গ্রহণ করতে শিখেছিল। কৃতজ্ঞতার গভীর বিকাশ মনের ক্রমোন্মেষের একটা প্রধান নিদর্শন যার মূলে থাকে চেতনার সাবালিকা হওয়া—যখন সে বোঝে সংসারে সব চেয়ে খাঁটি যে-সব জিনিস তাদের ভাষাই সব চেয়ে বেশি লাজুক—তাই তারা স্বীকারের অপেক্ষা রাখে। ছায়া বড় হয়েছে বৈ কি।

* * * *
* *

অথচ তবু ছায়া বড় হয়েছে এবং—বাঁচলে—ক্রমশ আরো বড় হবেই হবে ভাবতে একটা ব্যথা মতন বাজে কেন? ছোটর মধ্যে

কী একটা মহিমা আছে যা চিরন্তন। মনে পড়ে ওর যোগী কবির একটি চতুষ্পদী :

No sign is made while empires pass :
The flowers and stars are still His care :
The constellations hid in grass,
The golden miracles in air .

রাজ্য হয় কাললীন, রাজরাজ দেখেও না চেয়ে :
ফুল কি নক্ষত্র আজো সে তেমনি স্নেহে রাখে ঢেকে :
তৃণে হাসে আলো-শিশু : আকাশে বাতাসে রয় ছেয়ে
তেমনি সোনার বর্ণ-ইন্দ্রজাল অরুণ-আবেগে।

ছোটর মধ্যে কি একটা আছে যা বড় পেলব, মোহন, লাজুক। নয় কি? নদীর কথা মনে পড়ে। সুন্দর না? অথচ যখন ও বড় হবে তখন? বাজবে কি অসিতের? কে জানে?

"তৃণে হাসে আলো-শিশু"—জপ করে ও। ছায়ার মধ্যে সেই শিশুভাব নেই আর। থাকতে পারে না—ও জানে। চলা মানেই তো কাছের জিনিষ দূরে ঠেলা—নৈলে স্থাবরতাই হ'ত মন্ত্রসিদ্ধি—বটেই তো, অথচ তবু বাজে কেন? কী? শিশুর সরলতা সুন্দর বৈ কি। কিন্তু তবু…"বিকাশও কি কম সুন্দর?"—জপ করে ও সান্ত্বনা পেতে। ধরো ছায়ার সঙ্গে কথা ক'য়ে যে গভীর তৃপ্তি ও আজ পায় সে তৃপ্তি কি পেত আগে? তবু বাজে কেন? দুঃখ আসে কোন্‌পথ বেয়ে?—ঠিক দুঃখও নয়—কী নাম দেবে একে? আশাভঙ্গ জাতীয় কিছু কি? কিন্তু কিসের

আশা ? ধরতে পারে না। গভীরে যা উঁকি দেয় তার কতটুকুই বা ধরা ছোঁওয়া যায় ?

মনে পড়ে নানার কথা। কী অপূর্বই ছিল সে আটবছরে। আর আজ ? এখন তো তার ভরা যৌবন। কোথায় সে ? বড় হ'য়ে কেমনটি হয়েছে ? যেমনই হোক তেমনটি আর নেই কখনোই —থাকবে কেমন ক'রে ? সব বুঝেও তবু কোথায় খচ্ খচ্ ক'রে ওঠে নড়তে চড়তে— সনাক্ত-না-করা পায়ে-বেঁধা কাঁটার মত।

* * * *

* *

ঠিক্ এম্‌নি সময়ে হঠাৎ ওর হাতে এক চিঠি!—আশ্রম ঘুরে কলকাতায় এসেছে। আশ্চর্য! ঠিক যখন ও নানার কথাই ভাবছিল!

উদারের সঙ্গে সেদিন সবে ফিরেছে ছায়ার ওখান থেকে। ছায়াকে কী একটা নতুন ইঞ্জেকশন দিতে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। উদারকে ও ফোন করতেই ও গিয়ে নিয়ে আসে। সন্ধ্যা তখন আটটা।

ফিরতেই সুভদ্রবাবু ওর হাতে দিলেন চিঠিটি। সেই পরিচিত নীল খাম। নানার মায়ের হস্তাক্ষর। কী ব্যাপার ?

মনটা ছিল ওর আজ ব্যথায় ভারি। হঠাৎ উদারকে পাশে পেয়ে সাধ জাগল হালকা হ'তে। ওর স্নেহের জন্যে কৃতজ্ঞতার দরুণও হয়ত। এর আগে নানার কথা ও উদারকে বলে নি কোন দিনও। আজ বলল। স—ব। শেষে বলল: "নানার মার চিঠি। ভিতরে কী আছে কে জানে ?"

উদার হাতির দাঁতের ছুরি দিল এগিয়ে। অসিত খামটা খুলতে খুলতে বলল: "শুনতে রাজি?"

উদার সাগ্রহে বলল: "তার চেয়ে নিরন্নকে শুধাও: ভাত খাবি?"

* * * *

* *

অসিত চিঠির পাট খুলে পড়তে যাবে এমন সময়ে উদার বলল: "যদি রাগ না কর তো একটা কথা বলি—নানার সম্বন্ধে?"

"অত ঠাটের বাহার কেন?"

"পাছে তুমি কিছু মনে করো।"

"করব না হে—অত ভয় কিসের!"

"আমার মনে হচ্ছিল নানার মনে তুমি খুব একটা—কী বলব—গভীর ছাপ ফেলে এসেছ।"

"এই কথা বলতে এত পাঁয়তাড়া?"

"না। যা তুমি ঠাউরেছ সে ধরণের কবিত্বময় ছাপ নয়। তাহ'লে এত পাঁয়তাড়া করতাম না।"

"তবে কী ধরণের ছাপ শুনি?"

"যে ধরণের ছাপ পড়লে একটা মেয়ের জীবন বদ্‌লে যায়।"

"কেমন ক'রে জানলে?"

"আমি জানি।—এখন আর বলব না হয়ত একদিন বুঝবে। এখন পড়ো।"

* * * *

* *

অসিত পড়ল :

"তোমাকে কতদিন যে লিখি নি। ব্যবধান সব দিক দিয়েই ব্যবধান অসিত। তাছাড়া তোমাকে লিখব কোন্ সূত্রে। মানুষ কত কি করতে চায় কেবল খেই পায় না বলেই না সাধ মেটাতে পারে না।

"কিন্তু বিশেষ দরকারে প'ড়ে তোমাকে লিখছি। কারণ না লিখলেই নয়। অনেক খোঁজ করে তোমাদের আশ্রমের ঠিকানা জোগাড় ক'রে লিখছি। যে আমাকে দিল এ ঠিকানা সে ভরসা দিয়েছে তুমি পাবেই পাবে--কারণ আশ্রম থেকে তুমি না কি কোথাও নড়ো না।

"এমন বনবাসে কেন গেলে অসিত? বছর কয়েক আগে যখন শুনি এখবর—বিশ্বাস করতে পারিনি। তোমার মতন অমন খোলাপ্রাণ সদাহাসি মানুষ যৌবনে মঠবাসী বা বনচারী হবে এ যে ভাবাই যায় না। কিন্তু যাক্ এ নিয়ে আক্ষেপে এখন আর ফল কী বলো? যেকথা অবতারণার জন্যে এ-চিঠি, বলি সেই কথাই।

"ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরেছ হয়ত। নানার জন্যেই এ চিঠি।

"তুমি যখন দ্বিতীয়বার বিলেতে এসে ছিলে আমাদের কাছে লণ্ডনে তখন নানার বয়স পনের ষোল তোমার মনে আছে হয়ত? তবে ও তোমাকে দেখে কীরকম উজিয়ে উঠেছিল সেটা হয়ত তোমার চোখ এড়িয়ে গিয়ে থাকতে পারে কিন্তু মার চোখ এড়ানো

শক্ত। তবু আমি আমার চোখের এজাহারকেও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি নি: এ কি সম্ভব? কারণ নানা আমাকে বরাবরই ব'লে এসেছে শিল্পীদের বিয়ে করতে যাওয়াটাই ভুল—ও কখনই এ-ভুল করবে না। ও হবে 'প্রাইমা দন্না'—ফ্রান্সের একজন সেরা গায়িকা।

"গানে উন্নতি করেছিল ও যথেষ্ট। তোমাকে সে-খবর হয়ত দিয়ে থাকবে। আমি জিজ্ঞাসা করি নি। কারণ আমি মনে করি—মা-র পক্ষে মেয়ের সম্বন্ধে বেশি কৌতূহলী হওয়া ভালো নয়: দুঃখ পেতে হয়। দুঃখে রুচি কারই বা? তাই নানাকে পালন করার জন্যে যেটুক যত্ন তার বেশি আমি করতাম না।

"ফলে আমাদের মধ্যে একটু দূরত্ব এসে গিয়ে থাকবে। তাছাড়া আমাকে থাকতে হ'তও তো হাজারো কাজে—টাকা রোজগার করার ভারও নিতে হয়েছিল খানিকটা—কারণ—কিন্তু মরুক গে। সংক্ষেপে জেনে রাখো সংসারে আমাদের অর্থের অনটন হয়েছিল এই সময়ে।

"কাজেই গানে উন্নতি করায় সঙ্গে সঙ্গে যখন নানার একাধিক পাণিপ্রার্থী এসে হাজিরি দিল তখন আমি খুসি হয়েছিলাম বৈ কি। কিন্তু নানার এক কথা: বিয়ে আবার কি? ও হবে গায়িকা।

"এদের মধ্যে একজন ছিল আমেরিকার এক মস্ত ব্যাঙ্কারের ছেলে। কোটিপতির একমাত্র পুত্র। সুদর্শন। নাম লয়েড।

"আমি নানাকে কখনো বলিনি বিয়ে করতে। কিন্তু লয়েড এসে আমার কাছেই দিলে ধর্না। বললে: নানা ওকে বিয়ে করলে আমাদের দুঃখ থাকবে না। কিন্তু সেজন্যে ওকে বিয়ে করতে বলি কী ক'রে বলো?

"লয়েডের সঙ্গে যখন ওর প্রথম আলাপ হয় তখন নানার বয়স আঠার বছর। তুমি দ্বিতীয়বার বিলেতে এসেছিলে ওর ষোল বছর বয়সে।

"কিন্তু তোমার ফিরে যাওয়ার বছর তিনের মধ্যেই একটি বাঙালি ছেলে এসে ছিল আমাদের কাছে মাস দুই। সে তোমাকে জানে। তার কাছেই শুনলাম তুমি মঠবাসী হয়েছ।

"শুনে মেয়ের যা কান্না!—তখন আর চাপা রইল না ও কেন বিবাহ করতে নারাজ। ও বলল স্পষ্টই ও গান শিখছিল ভারতবর্ষে যাবার জন্যে--তুমি গানে নাম করেছ শুনেই। আর খুলে বলার আশা করি দরকার নেই?

"ঠিক এই সময়েই ওঁর মাথায় রক্ত উঠে একটা রক্তকোষ গেল ছিঁড়ে। সেই থেকে উনি পঙ্গু। লয়েড ফের এসে নানার দ্বারস্থ হয়েছে।

"কিন্তু—খুব সংক্ষেপেই বলতে হচ্ছে, বুঝে নিও—ওর সেই এক কথা: বিবাহ ও করবে না—কোনোদিনো না।

"ওকে তুমি মনে করতে ছোট্ট মেয়ে। আমাদের দেশে পনের ষোল বছরে মেয়েরা শিশু ব'লেই গণ্য। কিন্তু—বলল ও—তোমার গান শুনে প্রথম—আট নয় বছরেই—ওর কি যে

হয়েছিল সে ও নিজেই ঠাহর পায়নি অনেকদিন পর্যন্ত। আমিও দেখিনি এমন ঘটনা—যদিও বিচিত্র অনেক কিছুরই জলঝড় ব'য়ে গেছে আমার ক্ষুদ্র জীবনের উপর দিয়ে।

"রাগ কোরো না তুমি। শুনি তোমরা এসব অন্যায় মনে করো। তার উপরে তুমি আজকে যে পথ নিয়েছ সে পথের ভগবানের নাকি এমন শুচিবাই যে শুনি অহিন্দুদের সঙ্গে ছোঁওয়াছুঁয়ি হ'লেও তিনি মুখ ফেরান। তাছাড়া এক্ষেত্রে নানার কোনো আশাই তো নেই। (সেই ছেলেটি আরো বলল যে হিন্দু সন্ন্যাসীরা না কি মেয়েদের ছবি পর্যন্ত দেখে না) তাই বলতে ভয় হ'লেও তোমাকে বলছি—তুমি ওকে বিবাহ করতে বলো। বুঝিয়ে লেখো যে তুমি ওকে সে-চোখে দেখনা—দেখতে পারনা—যে-চোখে ও দেখে তোমাকে।

"আর একটা কথা বলি তোমাকে। তোমার মধ্যে এমন কিছু একটা আছে যাতে এমনটা সম্ভব হ'তে পারল। তবু আশা করি তুমিও বুঝবে যে মেয়ে আমার ফেলনা নয়। ওকে এখন দেখলে তুমি চোখ ফেরাতে পারতেনা অসিত এ আমি বড় গলা ক'রেই বলতে পারি। আর শুধু রূপই তো নয়। বুঝে দেখ পূর্ণযৌবনে যে সুন্দরী গায়িকা মেয়ে ছয় মাস অন্তর একটি ক'রে পাণিপ্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করে আর তা এমন কোন আশায় যাকে দুরাশা বলাই ভালো—যে-মেয়ে বিলাসে মানুষ হ'য়েও রোজগার ক'রে সংসার চালাবে তবু চাইবে না কাজ-চালানো ধনী স্বামী—সব চেয়ে বড় কথা, যে-মেয়ে অধ্রুবের জন্য ধ্রুবকে বিদায় দেবার পণ

নিতে পারে এক অসম্ভব স্বপ্নের তাগিদে—এমন কি তার মাকে পর্যন্ত বলে না—সে-মেয়ে তোমার অযোগ্য হ'ত না। কিন্তু তুমি যখন সন্ন্যাসী থাক্ হাহুতাশের পালা। শোনো: আজকাল দিনের পর দিন ও ম্লানমুখে একলা কাটায়। গান শেখারও আর তেমন চাড় নেই—যদিও ইতিমধ্যে একাধিক অপেরার ম্যানেজার ওকে চেয়েছে। মাঝে মাঝে গিয়ে ব'সে থাকে কোথায় যে কেউ জানে না। আমি বেশি বললে বলে অমন করলে ও কনভেন্টে চ'লে যাবে। তাহ'লে আমি আত্মহত্যা করব অসিত। তাই তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি ওকে বোঝাও। ও সেদিন সাফ জবাব দিয়ে দিয়েছে এক তোমার ছাড়া আর কারুর কথায়ই ও কান দেবে না।

ইতি।"

* * * *

* *

উদার প্রথম কথা কইল: "বলিনি?"

"হুঁ"। অসিতের মন ভূভারতে নেই।

"কী ভাবছ?"

অসিত তাকায় ওর দিকে: "তুমি?"

"যদি বলি মহাভারতের কোনো এক রোমান্টিক্ মহিলার কথা?"

"কে?" অসিত হাসে।

"মনে পড়ে সেই ছবিটি?" বলে উদার, চোখে ওর কৌতুকের ঝিকিমিকি। "সেই যখন দেবতারা এলেন রাজপুত্রীর করপ্রার্থী হ'য়ে কী বলেছিল সে?"

"মনে পড়ছে। বলেছিল: ওগো দেবতারা। তোমাদের ক্ষুরে দণ্ডবৎ, আমি বরণ করব শুধ নলকেই।"

"স্মরণশক্তি তোমার খুবই ভালো অসিত। কিন্তু স্বয়ং ছায়াদেবীর সার্টিফিকেট তো—আমারো স্মৃতিশক্তি দুরন্ত। তাই তোমাকে বলতে হচ্ছে যে দময়ন্তীর কথাটা আরো একটু জোরালো শুনিয়েছিল সংস্কৃতে, তাছাড়া কথাটা সে বলেছিল দেবতাদের নয়—তার বল্লভ নলকেই:

দেবেভ্যোহং নমস্কৃত্য সর্বেভ্যঃ পৃথিবীপতে
বৃণে ত্বামেব ভর্তারং সত্যমেব ব্রবীমিতে।

জোর আছে এহেন রোমান্সের—মানতেই হবে। কিন্তু, রাগ কোরো না ভাই, কেন জানিনা, আমার একটু হাসিই পায় ভাবতে যে কলিযুগের দময়ন্তী আরো রোমান্টিকা হবার শক্তি ধরে"।

"মানে?"

"ভেবে দেখ। দ্বাপরের দময়ন্তী দেবতাদের ক্ষুরে দণ্ডবৎ করেছিল নলকে হাতের পাচ পেয়ে তবে। কিন্তু কলির দময়ন্তী ছাড়ছেন কোটিপতি নরদেবদের এমন একজনের জন্যে যাঁর কণ্ঠে তার বরণমালা দোদুল্যমান হবার আশা দুরাশার চেয়েও খারাপ। নয় কি?"

অসিত অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে শুনতে শুনতে।

হঠাৎ টেলিফোন বেজে ওঠে উদারের হাতের কাছেই...

উদার ধরে: "কে?—হ্যাঁ, আছেন।" ব'লেই অসিতকে দেয় টেলিফোনটা।

"কে?"

"আমি—প্রীতি। অসিদা?"

"হ্যাঁ। কী ব্যাপার?"

"ছায়ার এইমাত্র ঘুম ভেঙেছে। ও বলছে এক্ষুনি তোমায় টেলিফোন করতে—কাল একটু ভোরের দিকে যদি আসতে পারবে কি ভাই?"

"পারব। কিন্তু কেন?"

"তোমার মুখে ও দু একটা ভোরাই রাগের গান শুনতে চায় 'বড্ড ইচ্ছে করছে মাসিমা লক্ষ্মীটি, বলো অসিদাকে এক্ষুনি। ঘুম ভেঙেই যেন কাল ভোরে তার গান শুনি।'

অসিত হাসে: "তাকে বোলো—অসুখেও তার রোমান্সের সাধ যায়নি দেখে অসিদা প্রসন্ন হয়েছে।"

"আসবে তো?"

"বাঃ।"

উদার হেসে বলে: "রোমান্স, ফের? কী ব্যাপার?"

অসিত বলে।

উদারের মুখের হাসি নিভে যায়, বলে: "আহা! বেচারি। —সুভদ্র বাবু!—এই যে শুনুন, কাল ভোরবেলা (অসিতকে) কটায়?"

অসিত: সাড়ে পাঁচটায়।

সুভদ্র: মোটর তো?

উদার (হেসে): আপনি যার নেই তার কে আছে সুভদ্রবাবু? কে? অসিত? ক্ষেপেছেন? ও। ভুল সুভদ্রবাবু ভুল। ও কারুর

নয় সুভদ্রবাবু। ওকে দেখলে আমার অমর কবির কোন্ গানটা মনে পড়ে জানেন? (গুন্ গুন্ ক'রে)

নিরবধি কাল হয়ত কখনো ভুলিব সে ভালবাসা

বিপুলজগৎ, হয়ত কোথাও মিটিবে আমার আশা।

হা হা হা—আচ্ছা যান। কিন্তু মোটরটা—বুঝলেন? ঠিক সাড়ে পাঁচটায়। (অসিতকে) কিছু মনে কোরো না ভাই। এর নাম হ'ল laughter veiled in tears"

* * * *

* *

সেদিন রাতে শুয়ে অসিতের ঘুম আসতেই চায় না। কত কথাই যে মনে হয়!

নানার কথা ও বলেনি কখনো ছায়াকে। হয়ত বলবেও না কোনোদিন। অথচ বলতে ইচ্ছা হয়। কেন হয়? ছায়া কি বুঝবে? বড় হয়েছে বটে অনেকখানি। তবু···সঙ্কোচ আসে কেন? নানার সঙ্গে কি ওর মিল আছে কোথাও?

না তো।—না না না, বলে ও রুখে উঠে। কোথায় মিল? সে সুন্দরী ও সুগায়িকা দুইই বটে কিন্তু এসবের সাদৃশ্য কি সত্যিকার মিল? না—বলে ও ফের জোর দিয়ে। সত্যিকার মিল হ'ল স্বভাবের মিল। স্বভাবে ওরা যে একেবারে আলাদা। দুজনেই চাপা মেয়ে—বটে, কিন্তু সরলা বলতে যা বোঝায় নানা তো তা ছিল না—কোনোদিনই না। 'প্রিকোশাস্' যাকে বলে। ছায়ার পায়ের নখ থেকে মাথার খোপা পর্যন্ত সবই ছিল সরলতার সুরে

বাঁধা। মনে পড়ে দেবদা কত সময়েই বলত সংক্ষিপ্ত আদরের সুরে: ও বড় হবে না—কোনোদিনও না। প্রীতিকে কত সময়েই বলত: "না সোনা! তোমাদের কাছে মিনতি রইল কিলিয়ে কাঁঠাল পাকিও না—মিশতে দিওনা ওকে যত সব হালফ্যাসানের এঁচড়ে-পাকা মেয়েদের সঙ্গে।"

প্রতিমা রাগ করত: "না। ওকে কুলুঙ্গিতে ভ'রে রাখো গে সাজিয়ে পটের বিবিটি ক'রে।"

নানার স্মৃতি আবছা হ'য়ে আসে। মনে পড়ে ছায়াদেরই কথা। কী আনন্দই ছিল ওদের। অথচ কী বদ্‌লেই না গেছে ওরা—সবাই। প্রতিমাকে তো চেনাই যায় না আর। কোথায় আজ সে হাস্যোজ্বলা গৃহকুশলা পতিব্রতার কর্মরতা মূর্তি? ও রোজ ভোরে যখন যেত ছায়ার ঘরে—ওর বিছানার পাশে একটা মস্তখাটে ব'সে চুপ ক'রে প্রাথনা করতে—তখন প্রায়ই দেখত প্রতিমা ঘুমিয়ে। ঠিক শিশুর মত। হঠাৎ চোখে পড়ত একটা সাদৃশ্য। আগে আগে কখনো কখনো ছায়া ঠিক এই ভাবেই ঘুমত—কাশ্মীরে, শিলঙে, লাহোরে—ঠিক এইভাবেই উপুড় হ'য়ে একটি হাত বালিশকে আঁকড়ে আর একটি হাত খাট থেকে ঝুলে। ও সন্তপণে বসত পাশে। প্রতিমার ঘুম ভাঙার সংকেত পেলে তবে রাখত ওর পিঠে হাত। কিম্বা মাথায় হাত বুলোত। গভীর স্নেহে মনটা উঠত ভ'রে। প্রতিমার প্রতি এমন টান কখনও বোধ করে নি তো এর আগে! প্রতিমা একটু চুপ ক'রে থেকে উঠে বসত, বসেই ফিশ ফিশ ক'রে: "কতক্ষণ?"

"এই খানিকক্ষণ।"

"বোসো ভাই। আজ চ'লে যেও না কিন্তু চা না খেয়ে।"

একটু বাদে চা। সঙ্গে সন্দেশ। এত দুঃখেও প্রতিমা ভোলে নি অসিত সন্দেশ ভালোবাসে যেটা আশ্রমে মেলে না।

"না না। হাতটা ধুয়ে খাও। কী যে করো?"

"চুপ্। ছায়ার ঘুম ভেঙ্গে যাবে।"

* * * *
* *

হঠাৎ শির্ শির্ ক'রে ওঠে। অসিত যেন চম্‌কে ওঠে। কোথায় ও? তানমার্গ! আশ্চর্য জ্বরের জন্যেই কি এমন মনে হয়? নিজের কপালে হাত দেয় গলার তলায়। না, জ্বর তো নেই। তবে? ওকে পেয়ে বসে কেন এই সব স্মৃতি! একটা ঘোর মতন যেন!

"কে?"

কই, কেউ নাতো!...অসিত চোখ কচ্‌লিয়ে তাকায়...একি জ্বরহীন বিকার না কি? স্পষ্ট যে দেখল...ফের গায়ের মধ্যে ওর শির্ শির্ ক'রে ওঠে।...বিকার কেমন ক'রে হবে? স্পষ্ট যে শুনছে তার কণ্ঠ! ...অতি মৃদুল...কিন্তু এত স্পষ্ট গাইছে অসিতেরই শেখানো একটি গান—ছায়ার অতি প্রিয় গান—অমর কবির বিখ্যাত—"তোমারেই ভালোবেসেছি আমি তোমারেই ভালোবাসিব!"আহা কী অপরূপই গাইত ছায়া এগানটি বাগেশ্রী কানাড়ার উদাত্ত মিড় দিয়ে! সে মিড় আর শুনবে না কখনো? না...ঐ তো ছায়া গাইছে :—আভোগ...

অবিস্মরণে

"মেলেছি নয়ন তব জ্যোৎস্নার জাগরণে,
মুদিব নয়ন—তব স্বপ্ননয়ন সনে,
জীবনে মরণে আমি তোমারি তোমারি কাছে
জনমে জনমে ফিরে আসিব।"

সেই অপরূপ কণ্ঠই তো! সেই অতুলনীয় মিড়···সুরের সূক্ষ্ম দোলন···কম্পন···গমক···ও চোখ বুঁজে শোনে আর অবিশ্বাস না ক'রে। নিজেকে ছেড়ে দেয়। ঐ তো···সুর যেন আরো স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে অন্তরায় ফিরে এসেছে ও:

"তব হাস্যোজ্জ্বল-বিকশিত শতদল,
বিতরিব তোমারি গৌরব পরিমল,
সজল-জলদ-জাল-ম্লান গগনতলে তোমারি নয়ন-জলে ভাসিব।

শুনতে শুনতে আবেশে অঙ্গ ওর শ্লথ হ'য়ে আসে······ অবিশ্বাস যায় লুপ্ত হ'য়ে, মুদিত চক্ষে দেখে সাম্‌নেই সেই শ্যামলীকে স্পষ্ট···সেই শ্রীলা তনুলতা অথচ···মাংস দিয়ে গড়া নয় তো, আভা দিয়ে গড়া! ও চোখ চায়···

দেখে সেই একই মূর্তি! এত বাস্তব আর এত কাছে··· ও হাত বাড়ায়: "ছায়া"!···

মূর্তি মিলিয়ে যায়···

অসিতের ঘোরও সঙ্গে সঙ্গে কেটে যায়।···সামনে কৃষ্ণচূড়া গাছটা তেম্‌নি দুলছে। ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করে না। আরো একটু দূর এগিয়ে চলে। ওরা ভাবে, ভাবুক। ওর মন এখন মানা মানে না। কিসের সাবধান! না, বাইরেই থাকবে।—

রিট্রাটে গেলেই ফের সেই স্নেহের তাড়না সুরু হবে। না, আজ এমন কোনো জায়গায় আশ্রয় নিতে হবে যেখানে কেউ পাবে না ওর দেখা। নিঃসঙ্গতার রসে ওর সমস্ত সত্তা গেছে ছেয়ে। এ কী দেখল ও?...এধরণের দর্শন ওর ক্বচিৎ হয়। কিন্তু আজ ওর শুধু দর্শন নয়...শ্রবণ!...না, এই ভাবের মধ্যেই ও আজ ডুবে থাকবে ... এখন ও কারুর নয়। আরো এগিয়ে— দেখে একটা গুহা। বেশ হয়েছে। নির্ভয়ে ও ঢোকে। গুঁড়ি মেরে খানিকদূর চ'লেই দেখে 'চিচিং ফাঁক'। লাফিয়ে পড়তেই সে কী অপরূপ দৃশ্য! সামনেই খট্টা...ডান দিকে একটি ছোট ঝোপ! চমৎকার! কেউ ওকে খুঁজে পাবে না এখানে। আনন্দে ওর মন ভ'রে ওঠে। কম্বল বিছিয়ে বসে একটা পাথরে ঠেশ দিয়ে শরীর দুর্বল, কিন্তু গ্লানিহীন।

ব'সে ব'সে ভাবে...ভাবে...গাথে স্মৃতির মালা...ফুটে ওঠে ছবির পর ছবি ওর মানস নেত্রে...

চিরচরণে

Thomas Moore

And the heart that is soonest awake to the flowers
Is always the first to be touched by the thorns.

কুসুম কারে বলে জেনেছে ধরাতলে
সবার আগে জাগি' যে-হিয়া প্রাতে,
কাঁটারো সাথে হয় প্রথম পরিচয়
তাহারি—জীবনের পথচলাতে।

প্রীতি পাশের ঘরে বড় খাটে শুয়ে ঘুমোয় অকাতরে। কাল সারারাত জেগেছে—সকালেও ডাক্তার নার্স আরও কত কী হাঙ্গাম ছিল। বেলা দশটা হবে।

অসিত বড় ঘরে ব'সে গল্প করছে অজয়ের সঙ্গে, পাশে সুনীল।

"ওর সঙ্গে তবলা ধরতে আজকাল তো তুমিই?"

অজয় সলজ্জ হেসে বলে: "হ্যাঁ, সম্প্রতি হোসেন আসত না ···তাছাড়া ছায়া আমার সঙ্গতই পছন্দ করত···আমি জানতাম কিনা সুরেশ্বর বাবুর ঘরানা খেয়ালের ঢঙ···"

"লয়ে না কি ও আরো চমৎকার হয়েছিল--সুনীল বলছিল?"

অজয় সহজে উচ্ছ্বসিত হবার পাত্র নয়, বলে: "আজকাল আধমাত্রারও ভুল হ'ত না কোথাও।"

অসিত হেসে বলে: "অথচ একসময়ে ও তোমাকে কী রকম ভয় করত মনে পড়ে? তা হবে না? তুমি হ'লে স্বয়ং জাঁহাবাজ খাঁর প্র-প্র-দৌহিত্রের প্র-প্র-প্র-পৌত্রের ডিরেক্ট ডিসাইপ্‌ল্‌। সত্যি, কী বাজনাই বাজাও হে আজকাল!···জানো, শৈলেশ্বর তো বলে তুমি যখন তবলায় লহরা ছোটাও মনে হয় যেন সাক্ষাৎ জাঁহাবাজ খাঁ—একেবারে সশরীরে।"

অজয়: ছায়া বলে ঠিকই:—আপনি আশ্রমে নিশ্চয় ক্ষ্যাপানো মন্ত্রের জপ করেন—বাইরে এসেই ধরেন হরিনাম।

অসিত (হেসে) : আর তুমি জাঁহাবাজ খাঁর জাজিমে 'সাবধান ক্রান্ ক্রান্ থাপ্পড় সাম্‌লান্' বোল তুলে বাইরে এসে 'সব হম্ জান্‌তা কুছ্ নেই মান্‌তা' বোল সাধো—এই তো তোমার আমার মধ্যে তফাৎ ?

সুনীল (খুব হেসে) : বেশ বলেছেন। অজয়ের সিকি বোলও যদি আমি হাতে তুলতে পারতাম অসিদা—দেখতেন আপনার সঙ্গে কী সঙ্গতটা করতাম। আপনার গান কি আর কেউ শুনতে পেত ভেবেছেন। তবলচির বাজনার সঙ্গতে আপনার নিজের 'পরেই মায়া হ'ত—বলতেন না সুরেশ্বর বাবু ?

অজয় (সখেদে) : কলকাতা কানা ক'রে গেছে ও—কী বলো সুনীল ?

সুনীল (হেসে) : আমার তো সুরেশ্বর বাবুর গান হাম্‌বড়া খাঁর চেয়েও ভালো লাগে।

অজয় (চিন্তিত) : অতটা বলা যায় না—হানবড়া খাঁ একজন মস্ত ওস্তাদ—কোতোয়াল খাঁর ভায়রাভাই—একথা ভুললে চলবে না।

সুনীল (ব্যঙ্গ হেসে) : আরে রাখো হে রাখো। হানবড়া খাঁ আগে ছানাবড়া খাঁর সঙ্গেই পাল্লা দিক্ তার পর সুরেশ্বর বাবুর সঙ্গে ওর তুলনা হবে। সত্যি না অসিদা ? আমি তো সুরেশ্বর বাবুকে প্রায়ই বলি—এবার গান শেখা ছেড়ে শেখাতে আর সৃষ্টি করতে সুরু করুন।

অজয় (গম্ভীর) : না, শেখাও ভালো বৈ কি।

সুনীল : আরো ভালো এই সব মামুলি বুলিকে দুত্তোর বলা (রুখে উঠে) তুমি তো ওস্তাদদের ঘরানী হাঁড়ির খবর রাখো, বলো তো কলকাতায় এমন কোন্ ওস্তাদ আছে যে সুরেশ্বর বাবুকে শেখাতে পারে ?

কমলা সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে অসিতের দিকে তাকায়।

অসিত: ছায়া ডাকছে ?

কমলা ঘাড় নাড়ে। ওরা সবাই উঠে যায়।

* * * *

* *

ছায়া (রাগ ক'রে) : আমার কাছে একটু বসলে কি তোমাদের জাত যায় অসিদা—না আমার কাছে এসে হাসতে গেলে চোয়ালে খিল ধরে ?

অসিত (ওর খাটে ব'সে) : তোর কথাই তো হচ্ছিল রে। আর স্বরেশ্বরের।

ছায়া : তিনি আর আসবেন না অসিদা। আমি সারলে—অন্তত একটিবার ?

অসিত (ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে) : আসবে না কেন ? নিশ্চয়ই আসবে।

ছায়া : তোমার গুরুদেব দেবেন আসতে ?

কমলা : তুমিই তো সেদিন বলছিলে ছায়া যে গুরুদেব যখন তোমাকে সত্যি স্নেহ করেন—তখন তুমি সারলে স্বরেশ্বর বাবুকেও দেবেন পাঠিয়ে।

ছায়া (দীর্ঘনিশ্বাস) : মানুষ কল্পনা না ক'রে কি বাঁচতে পারে কমলাদি ?

সুনীল : না না আসবেন বৈ কি। তাঁর সব চেয়ে প্রিয় ছাত্রী কী রকম গাইছে পেল্লায় তালে কেল্লা-ফতে লয়ে শুনবেন না তিনি ? এইমাত্র বলছিলাম সেই কথাই অসিদাকে।

ছায়া (গাঢ় কণ্ঠে): আর কবে শুনবেন ? (বালিশে মুখ লুকোয়)

কমলা : ও কি ছায়া ?

ছায়া (সামলে) : অসুখ হ'য়ে কেমন যেন হ'য়ে পড়েছি। পোড়া চোখ দুটো কিছুতে মানা মানে না আজকাল—

অসিত মুছিয়ে দেয় ওর চোখ···চোখের জলে হাসির আভা ফুটে ওঠে। ম্লান··· অথচ কী সুন্দর!···

* * * *

* *

বেলা দুপুর বাজে।

ছায়া : মাথাটা আজ ধোয়ানোই হ'ল না।

প্রতিমা : হঁ্যা হঁ্যা। বুথটা একটু দেরি আছে—তাই। এবার দিই ধুয়ে।

কমলা তাড়াতাড়ি ওর মাথার নিচে একটা রবারের তোয়ালে ধরে চক্ষের পলকে।

ছায়া (হেসে) : কমলাদিকে কোনো কাজটি কি কারুর বলতে হ'ল কোনোদিন ?

অসিত ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে উঠে পড়ন্ত জল গুলো হাত দিয়ে ফেলতে যায় তলার বালতিতে—কিন্তু জল বালতিতে না প'ড়ে সমস্ত ঘরে ছড় ছড় ক'রে পড়ে ছড়িয়ে।

ছায়া (খিল্ খিল্ ক'রে হেসে) : ঐ দেখ কমলাদি, অসিদার সেবা আর তোমার সেবা। আচ্ছা অসিদা—বো—লি না তোমাকে মা—নায় না এসব ? বাপীও বলত মনে নেই—তুমি গা—ন গাও —যা পারো।

অসিত (অপ্রতিভ) : বেশি পড়ে নি।

কমলা : এক্ষুনি মুছে নিচ্ছি। তুমি বোসো না ভাই ঠাণ্ডা হ'য়ে—একটু জল পড়েছে তাতে আর হয়েছে কি?

ছায়া : অসিদা ভাই, আজ সেইটে শুন্‌ব তোমার সেই নতুন দেওয়া সুর

'এবার আমি চলব না গো
তুমি আমার সঙ্গে থাকো।'

প্রতিমা : এখন যে বেলা দুপুর রে! ও খাবে দাবে না?

ছায়া : এখানেই খাক না আজ—না না ভুলে গিয়েছিলাম—রুগির বাড়িতে খাওয়া—আচ্ছা তুমি যাও—খেয়েই কিন্তু—না—(হেসে) খাওয়ার পর তোমার যে আবার একটু খাটে-পিঠে না হ'লেই নয়—আচ্ছা, তবে বিকেল বেলা—কিন্তু তখন তো অজয় বাবু থাকবেন না, সঙ্গত করবে কে?

কমলা : থাকুন না অজয়বাবু—এইখানেই খান টেলিফোন ক'রে দিই?

অজয় : তাই তো! আজকে যে—

সুনীল : সেই 'হুল্লোড়' প্রহসনের কন্সার্টে ক্যানেস্তারা রিহার্সাল বুঝি?

ছায়া (হেসে) : যা বলেছেন সুনীলবাবু। অজয়বাবুর ধারণা ওঁর ঝাঁহাবাজি বোল পড়ন ক্যানেস্তারা অর্কেস্ট্রাতেই খোলে ভালো

প্রতিমা : কী অজয়বাবু? থাকবেন এখন?—আমি বলি কি—(ছায়ার দিকে চেয়ে)—এখন থাক্। বরং সন্ধ্যাবেলা আসবেন উনি। কেমন অজয়বাবু?

অজয়: সেই ভালো। গানবাজনা সন্ধ্যাবেলায়ই ভালো জমে। তাছাড়া তোমারও তো খাওয়ার সময় হ'ল।

কমলা অলক্ষিতে কখন বেরিয়ে গিয়েছিল—ইতিমধ্যে ট্রে-তে সাজিয়ে এনেছে ছায়ার খাবার: সূপ, মাছের ঝোল, একটু চাটনি, ইকমিকের ভাত শেষে একটু ঘোল।

প্রতিমা: ওমা! এর মধ্যে কখন এসব সাজিয়ে আনলে ভাই?

কমলা: নিচে যেতেই দেখলাম সব তৈরি। দেরি হচ্ছিল সামান্য দু'চারটে নিমকির জন্যে। সেসব রেখে এগুলোই আগে নিয়ে এলাম—ও বলছিল কি না ওর ক্ষিদে পেয়েছে।

অজয়ের যাওয়া হ'ল না—সুনীল প্র্যাক্‌টিকাল জোক করেছে: কখন ফোন ক'রে দিয়েছে অজয়ের ওখানে। ছায়া খুব খুসি। সুনীল এই ভাবে ছায়ার মনের ইচ্ছা কল্পনা ক'রে যথেচ্ছাচার করত—শুধু ওর একটুখানি প্রসন্ন হাসি পেতে। আজ আরো উপরি লাভ হ'ল, ছায়া বলল হেসে: "যার সুনীল বাবু নেই তার কে আছে? না অসিদা?" অসিত হেসে সায় দেয়—এ-কথাটা অসিতের কাছ থেকেই ছায়ার শেখা।

ছায়া: তুমি সুর ধরো। আপনি একটু ঠেকাটা দিন না অজয়বাবু, না হয় শুধু বাঁয়াটাই—

অজয় (ব্যস্ত): না না, শুধু বাঁয়াটা কেন, তব্‌লাটাও ধরছি—একটু সুরে কম বলছে তা হোক গে—

প্রীতি: সেটি হচ্ছে না—ছায়া আমাদের এখন ওস্তাদ—শুধু বুল্‌বুল্ নেই আর। শৈলেশ্বর বাবুকেও ও হারায় ঠকাশ ঠকাশ ক'রে তবলা বেঁধে।

ওরা হাসে···অসিত ধরে গান, অজয় সঙ্গত করে:

এবার আমি চলব না গো!
জানি যে মোর চলার সাথে
দিনে রাতে
তুমি আমার সঙ্গে থাকো
আমার চলায় জাগো···

(গানের মধ্যে কান্তির প্রবেশ)

ছায়া খেতে খেতে মুখ তুলে শোনে।···

"ও কী খাওয়া বল্ দেখি? সবই যে প'ড়ে রইল!" বলে কান্তি গান থামলে।

অসিত: তাই তো গাইতে চাইছিলাম না—

ছায়া (অনুতপ্ত): না না খাচ্ছি ফের মন দিয়ে। তুমি গাও না ভাই সেই গানটা—হরি হে তোমার বাঁশের বাঁশি—

প্রীতি: মেয়ে আমাদের রাণী কি না দিদি—তাই কন্সার্ট না হ'লে খাওয়াই হয় না।

কান্তি: কেবল এরকম অর্কেস্ট্রা রাণীরাও পায় না—কী বলো কমলাদি?

কমলা: তা—একশোবার—অসিতের গান তার ওপর অজয় বাবুর দুর্লভ সঙ্গত—

অজয়: বেচারি সুলভ বাবুকে নিয়ে কেন আর দুর্লভের মানপত্র দেওয়া কমলাদি? ধরুন অসিদা।

ছায়ার আলো

অসিত গায় :

কী গুণ বলো কী গুণ জানে, হরি হে তোমার বাঁশের বাঁশি।
(এ কি) সাধনা তার, কি মহিমা তোমার?
কেমনে ঢালে সে অমিয়রাশি।
পশিলে শ্রবণে সে-স্বরলহরী
(বলো) কেন বা ওঠে গো পরাণ শিহরি'
জানি না কেন যে আপনা পাসরি—কে যেন মরমে পরায় ফাঁসি।
প্রাণনাথ, তব অধর পরশে
(বাঁশি) গরবে বাজে গো মনের হরষে
সে-অনলসুরে নিঝরে অমিয়—শুনিয়া সকলে কহে উছাসী।
হাসি বাঁশি নাথ তব সহচর
(কেবল) হরিতে সরলা বালা-অন্তর,
অবোধ পরাণ বোঝে না যে, তাই সকলি ত্যজিয়া ছুটিয়া আসি।

প্রীতি সন্তর্পণে একবিন্দু চোখের জল মুছে নেয়। প্রতিমা নিঃশব্দে ছায়ার বাটিগুলো দেয় এগিয়ে। ছায়া উৎকর্ণ হ'য়ে শুনতে শুনতে খায়। কমলা শূন্য পাত্রগুলো ধীরে ধীরে সরিয়ে নেয়। অসিত আঁখরের পর আঁখর দিয়ে চলে···কারণ ছায়া বড় ভালোবাসে এই সব মুখে মুখে রচা আঁখর।···

* *   * *
*   *

কমলার এক দেওর আদিত্য তার স্ত্রী শিখা ও সাতবছরের মেয়ে বালাকে নিয়ে থাকে শ্রীরামপুরে। বালা যে কী সুন্দর গায় ছায়ার গান—গ্রামোফোন-থেকে-তোলা!

অসিতও তাকে শিখিয়েছিল দুএকটা গান। ছায়াদি বলতে বালা অজ্ঞান। বালার প্রতিভা সত্যিই বিস্ময়কর! অসিত তাকে বলত ছায়ার **understudy**: কমলা একটু লজ্জা পেত। বালা কিনা ওর আদরের জিনিস:

"কী যে বলো অসিত, কোথায় ছায়া কোথায় ও।"

প্রীতি: তা ছায়া যখন গান শেখা সুরু করে কে ভেবেছিল ভাই? অসিদা ওকে আবিষ্কার না করলে কে-ই বা টের পেত ওর অদ্ভুত প্রতিভা?

সুনীল: কেন?—মাসিমা!

প্রীতি (খুসি): ঢ—ঙ। মাসিমা কী বোঝে গানের শুনি?

অজয়: কী যে বলেন প্রীতিদি, আপনি একটা সোজা লোক না কি?

অসিত: কথায় বলে—বাঘিনীর মাসি দেখে ভয় বাসি।

প্রীতি: আচ্ছা অসিদা—ঠাট্টাটা কি ঘুরে ফিরে কেবল এই বেচারি মাসির ঘাড়েই ভর ক'রবে?—কমলাদিও তো রয়েছে। ওর প্রতি একবার নেকনজর হানলে কী হয়?

অসিত: জানো তো কমলা
নহেন অবলা!

ছায়া (হেসে): কী সুন্দর! আচ্ছা অসিদা, মনে পড়ে সেই কাশ্মীরের পথে—মুখে মুখে তুমি ছড়া কাটছিলে দু একটা আমি

টুকে রেখেছিলাম—হারিয়ে ফেলেছি। কী ক'রে পারো ভাই?

অসিতের মন ভ'রে যায়···সেই পরিচিত উল্লসিত বিস্ময়ের সুর—আগেকার ছায়ার। বলে ওর চিবুক ধ'রে: "তুমিও পারবে ভাই, বড় হ'লে। এখনি যে ডাকসাহিটে ওস্তাদ নাম রটেছে! তোমার বয়সে আমরা কেউ কি পারতাম এরকম গাইতে?

অজয়: এর ভাষ্য কি এই যে এখন পারেন?

ছায়া: দেখুন অজয়বাবু, এসব আমার ঠাট্টায়ও ভালো লাগে না। না না না—কোনো অজুহাতেই না—

প্রীতি: তা বললেই বা—ঠাট্টা তো ঠাট্টা—

প্রতিমা: না—এখানে আমি ছায়ার সঙ্গে একমত। এধরণের ঠাট্টাও ভালো না। ছায়া গানের কী জানে বলুন তো যে—

কমলা: আহা কী যে তর্কাতর্কি সব! তার চেয়ে একটা গান হোক।

অজয়: সেই ভালো নৈলে শ্রীমতী রাগিণীর মেজাজ আর হাসিনী হবে না।

অসিত ফের গান ধরে, অজয়—তঁবলা। ছায়ার মুখে মেঘ কেটে যায় মুহূর্তে, বলে "আজ ঐ গানটা ভাই—'দিও দিও ঠাঁই শীতল চরণে দিন মোর যবে ফুরাবে'।"

অসিত: ওটা না।

ছায়া (অনুযোগের সুরে): কে—ন?

প্রীতি (প্রসঙ্গান্তর আনতে): অসিদার নতুন একটা গান শুনিস নিতো—যেটা বালা শিখেছে কী যে চমৎকার—"দুঃখ আমায় চাইলে দিতে পাবো না আর দুঃখ আমি—"

ছায়া (সকৌতূহলে) : কই এগানটা তো শুনি নি—গাও না ভাই—প্রথম লাইনটা শুনেই ভালো লাগছে—

অসিত গায় অজয় সঙ্গত ধরে ধামার তাল :

দুঃখ আমায় চাইলে দিতে পাবো না আর দুঃখ আমি।
তোমার তরে দুঃখ শ্যামল, সুখ হবে যে দিবসযামী।
আশা-রঙিন সুখের তরে
মন যার আজো কেমন করে,
তোমার পরশ ছাড়াও আরো নানা হরষ চায় যে স্বামী,
তাকে পারো দুঃখ দিতে—চায় যে মায়া-যশ-প্রণামী।

ছায়া কমলাকে ইঙ্গিত করে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিতে।

কমলা আলো নিভিয়ে দিতেই ঘরের মধ্যে চাঁদের আলোর বন্যা ব'য়ে যায়। একফালি পড়ে ছায়ার শান্ত উদাস মুখে। মনে হয় না সে-মুখে পার্থিবতার কোনো আমেজও আছে।

অসিত আরো উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গেয়ে চলে :

যে চায় তোমায় আশৈশবই—থাকুক না তার হাজার ত্রুটি,
ত্রুটি নিয়ে পড়ে শ্যামল, তোমারি তো পায়ে লুটি'।
তাকে তুমি নেবে না কি?
সুখ দিয়ে হায় দেবে ফাঁকি—
সুখেও যার মন ভরে না—হোক না সে-সুখ হাজার দামী?
দুঃখ দেবে তায় কেমনে দুঃখে যে পায় সুখ অনামী?

খানিক পরে ছায়া বলল: "এ-গানটা কিন্তু শক্ত অসিদা। বালা কি এটা সত্যি গলায় তুলতে পেরেছে?

অসিত: সুর ও তালের ঢংটা তুলেছে সত্যিই সুন্দর। অবিশ্যি তাই ব'লে কি আর প্রাণসঞ্চার করতে পারে তোর ম'ত?

ছায়া: থাক্ থাক্। না কথা কোয়ো না—শেষ চরণটি আমার কানে বাজতে দাও···

প্রীতি: কোন্?

ছায়া: দুঃখ দেবে তায় কেমনে দুঃখে যে পায় সুখ অনামী। (একটু পরে) আচ্ছা অসিদা, দুঃখকে সুখ ভাবা, একি সত্যি পারা যায়?—না ভাই, অন্যায় হয়েছে। না পারা গেলে তুমি লিখবে কেন?

অসিত: অন্যায় একটুও হয় নি রে। কারণ কবিরা যা গানে লেখে সবই যে জীবনে পারে তা তো নয়—

ছায়া: বিনয় থাক্ অসিদা, তুমি কি পারো না পারো সে-সম্বন্ধে তোমার সব কথা আমরা নিতে নারাজ। কিন্তু সেকথা যাক্—আমার বড় ইচ্ছে করছে শুনতে বালা এ-গানটি কেমন তুলেছে, তার গান শোনা যায় না অসিদা?

অসিত বিপন্ন বোধ করে। আদিত্য কি একমাত্র মেয়েকে এখন আসতে দেবে ছায়ার কাছে?

এ ধরণের অসুখের এ একটা বড় দুঃখের দিক। অসিত নদীকে আনতে পারত না। আরো কয়েকজনকে ডাকতে পারত না—কারণ তারা যদি বা ওর অনুরোধে আসত তাহ'লেও আসত

ভয়ে ভয়ে। তাই উত্তর দিতে গিয়েই ও থেমে গেল। আদিত্যের কাছে কী ক'রে করবে এ-প্রস্তাব?

কমলা অসিতের দিকে চকিতে একবার চেয়েই ছায়াকে বলল: "বালার গান তুমি শুনবে এতে আর কথা কী ছায়ারাণী? সে ভার আমার।"

ঠিক হ'ল পরদিনই কমলা যাবে শ্রীরামপুরে ছায়ার মোটরে। ছায়া বলল অসিতকেও যেতে: "ঘুরে এসো ভাই একটু, লক্ষ্মীটি! রাতদিন কত আর মিথ্যে মিথ্যে ব'সে থাকবে আমার শিয়রে? তাছাড়া (হেসে) ধরতে গেলে এ তো আমারি জন্যে যাওয়া।

* * * *

* *

অসিত গেল পরদিন কমলার সঙ্গে শ্রীরামপুর।

আদিত্য নামে প্রচণ্ড হ'লেও ব্যবহারে অতি নরম। শিখাও ডিটো, মানে রূপের শিখা তার তীব্র নয়—স্নিগ্ধ। এই স্নিগ্ধতার জন্যেই অসিতের এত ভালো লাগত এ-দম্পতীকে।

কমলাই কথাটা পাড়ল। শিখার প্রথমটায় একটু ভয় হ'য়ে থাকবে, কিন্তু আদিত্য স্ত্রীর অনুক্ত ভয়কে আমলই দিল না, শিখা সপ্রশ্ননেত্রে ওর দিকে তাকাতেই বলল: "সে কী কথা? ছায়া বালার গান শুনতে চেয়েছে ও যাবে না এ কখনও হ'তে পারে? এ তো ওর ভাগ্য।"

বালা এ বিষয়ে বাবার সঙ্গে একমত। "ছায়াদি" বলতে সে অজ্ঞান। হিরোইনের সম্বন্ধে বালার নানা বিজ্ঞ মতামত অসিত

শিখার মুখে শুনতে ভারি কৌতুক বোধ করত:

"মা, ছায়াদির রেকর্ডগুলি একটি আলাদা বাক্সে রাখবে, বুঝলে? আর কারুর রেকর্ডের সঙ্গে যেন ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়।...

"মা ছায়াদির কেন অসুখ করল—বলো না? এত লোক আছে তো সংসারে ভুগলেই পারে—ছায়াদির ভোগার কী দরকার শুনি?

"ছায়াদি যখন তানপুরো নিয়ে গাইতে বসে কী সুন্দর দেখায় —না বাবা? কালো মেয়েকে মনে হয় যেন ফর্সা ধব্ ধব্ করছে।"

অদ্ভুত কম্‌প্লিমেণ্ট নয়?

যাহোক শিখা সাবধান ক'রে দেয় মেয়েকে মোটরে তুলে দেবার সময়ে: "দেখিস ছায়াদির কাছে গিয়ে যেন ভুলেও ফাজলামি করিস নে—মুখে চাবি দিয়ে রাখবি—বুঝলি?"

মোটরে কমলা ও অসিতের মাঝে ব'সে বালা বলে হেঁকে: "সুরেলার কাছে কি কেউ কথা কয় মা?"

* * * *

* *

বালার কথা মনে ক'রে সুদূর তানমার্গেও অসিতের হাসি পায়। শিশুরা কোত্থেকে কী যে শোনে? মনে পড়ে একবার নদী বলেছিল ওর মাকে:

"মামণি, আজ আমি ফিরছি স্কুল থেকে প্রাইজ পেয়ে সব ছেলেরা আমাকে ছেঁকে ধরল মৌমাছির মতন—যেন আমি মধুর ভাঁড়।"

বালার আরো অনেক পাকা পাকা কথা আজ মনে পড়ে সুদূর কাশ্মীরে। যেমন যখন মোটরে সেদিন বলেছিল কি কথায়

কথায়: "জানেন অসিতমামা, সেদিন একদল মেয়ে এসে আমাকে বলছে কি 'তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে' গানটি বলো তো মা! শুনে হেসে বাঁচি নে। 'গান বলো তো মা' বলে বুড়িরা ক'নে দেখতে এসে—সে যে কী মজা লাগে শুনতে।"

কমলা হেসে বলেছিল: "ক'নে তোকেও একদিন হ'তে হবে রে মেয়ে—তখন যত হাসি তত কান্না—টেরটা পাবি।"

বালা সগর্বে বলেছিল: "ঈ—শ্। আমি ছায়াদির মতন শুধু গানেরি ক'নে হ'য়ে থাকব—দেখো।"

ছায়ার সম্বন্ধে একথাটি ও অসিতের মুখেই শুনেছিল। অসিত মাঝে মাঝে বলত: "ছায়া! বরকে বিয়ে তো ঢের মেয়েরা করেছে, করবেও। তুমি দেখিয়ে দাও—এমন মেয়েও ভূভারতে আছে যে শুধু গানকে বিয়ে করে আর কাউকে না।

ছায়া কথাটা ভোলে নি। বালা?—হয়ত ভুলে যাবে—ভাবে অসিত সুদূর তানমার্গে।

আজ সুদূর কাশ্মীরে অসিতের কেবলই ঘুরে ফিরে মনে হয় একটা কথা। মানুষ কেন এক ভাবে—হয় আর? ভালো করতে গিয়ে কেন সে মন্দকে আনে টেনে? কেন বালাকে ও শ্রীরামপুর থেকে মোটরে নিয়ে গিয়েছিল সেদিন সন্ধ্যাবেলা? কেন ছায়াকে শোনালো ওর গান? ভেবেছিল ছায়ার খুব আনন্দ হবে, এইজন্যেই তো? কিন্তু কেন কল্পনা করেনি এতে ক'রে ছায়ার মনে কী ধরণের প্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা?

মনে পড়ে প্রথম দিকে ছায়ার মুখে জ'লে উঠেছিল বিস্ময়ের আলো যখন বালা গাইল ছায়ারই গাওয়া দুটি গান—"বুলবুল

মনফুল" ও "মুরলী মধুসুরে"। কী সু—ন্দর অসিদা!" বলেছিল ও ওর অভ্যস্ত মিড় দিয়ে। কিন্তু তারপরই ওর মুখে যেন যুগের আঁধার এল ছেয়ে যখন বালা গাইল "দুঃখ আমায় চাইলে দিতে।"

গানের শেষে ও শুধু বলল: "অসিদা, এই প্রথম শুনলাম এমন একটি গান যা আমার শেখার আগে আর কোনো মেয়ে শিখে নিয়েছে।"

প্রীতি ওর কপালে হাত রেখে বলল: "তুমিও শিখবে মাণিক —সেরে উঠলেই।"

ছায়া হাত সরিয়ে দিয়ে বলেছিল: "কেন মিথ্যে ছেলেভোলাও মাসিমা?" ব'লেই বালিশে মুখ গুঁজে চুপ ক'রে রইল। কিন্তু মাত্র একটুখানির জন্যে। তার পরই মুখ তুলে বালার দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন হাসি হেসে ডাকল: "এসো বালা।"

বালা এসে বসল ওর খাটের কাছে একটা টুলে।

ছায়া: আমার অত কাছে বসতে নেই ভাই।

বালা: কেন ছায়াদি?

ছায়া: আমার শক্ত অসুখ কি না—

কমলা (কাছে এসে): কী যে বলে মেয়ে যা তা—

ছায়া (কমলার দিকে চেয়ে ম্লান হেসে): অসিদার একটা কথা মনে প'ড়ে গেল কমলাদি।

কমলা (কপালে হাত রেখে) কথা?

ছায়া (কমলার চোখে চোখ রেখে): I am not quite such a fool as I look।"

* *   * *

*   *

উদারকে দুদিনের জন্যে যেতে হয়েছিল বলেশ্বর। বালাকে উদারের মোটরে কমলার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে রাতে বাড়ি ফিরেই অসিত দেখে লন-এ ব'সে সশরীরে উদার ওর চিরসঙ্গী রাজ-ফরশি নিয়ে।

"কী ব্যাপার? রাজকার্য সাঙ্গ?"

"আর বলো কেন ভাই? আমারি শিল আর আমারি নোড়া—বাকিটুকু বুঝে নেও না।—কিন্তু যাক্—'ভাগ্যবান আমি তপোধন এ হেন পিতৃব্য যার' বলেছিল না অমর কবির লব? তোমাকে দেখলে মনে হয় তোমার মুখ সর্বদা বলছে: 'ভাগ্যবান আমি রাজসুত, সাম্রাজ্য নাহিক যার।' ও সুভদ্রবাবু—রাজভোগ কোথায়?"

বলতে না বলতে এলাহি কাণ্ড। কত যে পাত্র থালা রেকাবি···

"করেছ কি হে? সাম্রাজ্যেরও যে একটা সরেস দিক আছে তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য?"

"আহা, খাও খাও। যা strain যাচ্ছে তোমার—কল্পনা কি আমার কিছুই নেই ভাবো?"

খেতে খেতে ব'সে গল্প সুরু। অসিত ওকে বলে বালার কথা।

উদার চম্‌কে ওঠে: "বলো কি হে? বালাকে তুমি নিয়ে গেলে ছায়ার কাছে গান শোনাতে? O my Asit, Asit, you are surely the limit.'

অসিত আমতা আমতা ক'রে বলে: "ভুল হয়ে গেছে। তবে···ভাবলাম যদি ওর মনটা একটু প্রফুল্ল হয়—"

উদার বাধা দিয়ে বলে: "সেদিন তুমিই বলছিলে না—তোমার এক মেশোমহাশয় তোমার মাসিমাকে খুব বকেছিলেন তিনি মাতৃ-হারা শিশুর সামনে নিজের মেয়েকে আদর করছিলেন ব'লে? —অসিত! অমর কবির দিলীর খাঁ-র ভাষায় শুধু বলতে ইচ্ছা হয়—'জানতাম তুমি অবোধ কিন্তু এত অবোধ তা জানতাম না।'

সুভদ্রবাবু কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন বললেন অসিতকে: "আর একটু পায়েষ?"

অসিত "না না" ক'রে ওঠে সভয়ে।

*　*　　　*　*

*　　　*

খাওয়া সাঙ্গ হ'লে অসিত উদারকে বলে: "কাল তোমাকে নিয়ে যাব ওর কাছে—to undo the harm I have done ও বলছিল তোমার হাসির গল্প শুনলে ওর মন বড় ভালো থাকে—ভালো কথা ও আজই জিজ্ঞেস করছিল—আজকাল তুমি ডুমুরের ফুল হয়েছ কেন?"

উদারের চোখে জল ভ'রে আসে আর কি, ও সামলে নিয়ে বলে: "সইতে পারি না ভাই।" ব'লে একটু থেমে অসিতের হাতে চাপ দিয়ে: "কিন্তু না, অন্যায় আমারই। ওর কিসে ভালো লাগে সেইটেই বড়, আমার কষ্ট হয় হ'ল—তাতে কি?—সুভদ্রবাবু, কাল ঠিক সকাল নটায় মোটর—অসিতের সঙ্গে আমিও যাব।"

অসিত এত আর্দ্র বোধ করে। উদার যে ছায়াকে এতখানি স্নেহ করে কে ভেবেছিল?

উদারকে দেখে ছায়া প্রায় হাততালি দিয়ে ওঠে: "কার মুখ দেখে উঠেছিলাম আজ?"

উদার ওর দুটি হাত কোলের উপর টেনে নিয়ে বসে ওর খাটেই। বলে: "আশা করি অসিতের নয়।"

ছায়া: কেন?

উদার: ও আমার সঙ্গে কী ঝগড়াটা করে রাতদিন জানো না তো!

ছায়া (হেসে): এক হাতে কি তালি বাজে উদারদা?"

উদার: নিশ্চয় বাজে। আমি ওর কী পাকা ধানে মই দিয়েছি বলো তো যে ও আমাকে চলতে ফিরতে বলবে—আমার ঠাকুর্দা আমার নামকরণ ঠিকই করেছেন?

ছায়া (হেসে): এত বড় সাহস? অসিদা কী ক'রে সাহস পাও ভাই ওঁকে উদার ব'লে গালিগালাজ করতে?

অসিত: না করলে প্রাণে মারা যেতে হয় যে দিদি।

কমলা: এমন সাংঘাতিক অবস্থা?

অসিত (কমলাকে): জানো না তো ও আমাকে পাল্টে কী বলে চলতে ফিরতে।

কমলা: কী শুনি?

অসিত: পেসিমিস্ট।

ছায়া: তাতে তুমি কী বলো?

অসিত: বলি—বেশ। উদাররা যদি হয় রাজ্যভুক্ তাহ'লে পেসিমিস্টরা সর্বভুক্।

উদার : অর্থাৎ সাদাবাংলায় আমি যদি হই বিশমুণে ও হ'ল বাইশমুনে এ-ও বুঝলে না ?

ছায়া : বাইশমুনে কী বস্তু উদারদা ?

উদার : সে মহান্ । কেবল তার একটা অধ্যায় বলি। বিশমুনের খুব দেমাক সে বিশ মণ চাল খেয়ে হজম করে ব'লে। সোজা অসাধ্য-সাধন ? 'আমি যা পারি তা-ই তো চরম—নাতঃপরম্,' আর কি। কিন্তু মন্দ লোকে হাসে, বলে—না বাইশ মুনে খায় ঝাড়া বাইশমণ—সব্বাই দেখেছে। বিশমুণে রেগে বলে : "কক্ষনো না—নিশ্চয় ওর কুনকে ছোট।" কিন্তু লোকে তবু বাইশমুণের পেল্লায় শক্তির বিষয়ে রটায় হাজারো গুজব। বিশ-মুণে রেগে আগুন হ'য়ে রওনা হয় বাইশমুণেকে বে-ইজ্জৎ করতে। মিথ্যাবাদী কোথাকার। বাইশমণ আবার কেউ না কি হজম করতে পারে ?

চলেছে সে বাইশমুণের গাঁ টিপ. ক'রে। চলেছে তো চলেইছে পৌঁছল বাইশমুণের দেশে। ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছে—কম হেঁটেছে ও বাইশমুণেকে হারাতে ? হঠাৎ দেখে সামনে এক তাল গাছ—উঠল তাল পাড়তে। কিন্তু যেই উঠেছে কী হোলো জানো ? বাবা রে।

ছায়া (চমকে) : কী ?

উদার : দেখে কি ওদিক থেকে ছুটে আসছে এক মহাকায় ব্যক্তি—তালগাছ ছাড়িয়ে তার মাথা। সে বললে : এইয়ো। কী করছিস ?—এই তালগাছ নিয়ে যে আমি দাঁতন করি।

ছায়া (খিল খিল ক'রে হেসে) : তারপর ?

উদারই বিশমুণে শুনেই স্রেফ্ দে দৌড়। বাপ্‌রে! কার সঙ্গে লড়তে এসেছে—তালগাছ যার দাঁতন। হয়ত বা দাঁতন করা শেষ হ'লে ওকে চেপে ধরবে আমসত্ব ব'লে। পালা পালা।"

ছায়া হেসে কুটি কুটি। হাসি থামলে প্রীতি বলে: "মাঝে মাঝে আসেন না কেন? এধরণের গল্প টল্প শুনলে ওর মনটা ভালো থাকে।

উদার একটু চুপ করে থাকে। পরে বলে: "আসব এখন থেকে।"

* * * *
* *

কিন্তু বৃথা।

অসিত উদারের প্রাসাদের সাম্‌নে লনে বেড়িয়ে বেড়িয়ে পরদিন সকালে গুন্ গুন্ ক'রে একটা গান বাঁধছে:

জানা নয় সহজ কথা—কত কী জানতে হবে?
ভাবনার মালা গেঁথে ভাবীকে কে পায় কবে?

এমন সময় হঠাৎ গেটে ঢুকল ছায়ার মোটর। নামল প্রীতি ওদিকে উদার তার ফরশিতে টান দিচেছ গুড় গুড় ক'রে মোটর থেকে প্রীতিকে নামতে দেখেই চিৎকার করে ওঠে:

"আরে! এ কী? কী সৌভাগ্য?" ব'লে কাছে ছুটে এসেই চম্‌কে যায়: প্রীতির চোখে জল! ক্ষমা করবেন।"

প্রীতি চোখ মুছে সহজ সুরে বলবার চেষ্টা করে: "না না। বিশেষ কিছু নয়।"

উদার : অসুখ বাড়ে নি তো ?

প্রীতি : না—তবে—

অসিত : তবে ?

প্রীতির চোখে ফের জল উপছে পড়ে : "কী ক'রে চোখের জল রাখি অসিদা মেয়ের কথা শুনে ?

উদার : কী ব্যাপার ?

প্রীতি : জানেনই তো ও আজকাল কী রকম চবিবশ ঘণ্টাই হাঁপায়—জ্বরও ছাড়ে না তো। বেশি কথা কইতেও ডাক্তারের মানা। অথচ আজ—বোধহয় পরশু বালার গান শুনেই—ও বলছে কি জানো ? বলছে মাসিমা লক্ষীটি, কতদিন গান গাই নি আজ একটা গাই। গাই ? একটা—শুধু তুমি শোনো একলাটি। মামারা তো দেবে না গাইতে কিছুতে।"

আলোর পরেই ছায়ার কালো···এত কালো···সামনের আকাশে কিরণের প্লাবনকেও মনে হয় মায়া।···

* * * *
* *

এ-ছায়া আরও ঘনিয়ে এল পরদিন। হঠাৎ ছায়ার সে কী বেদনা পেটে! মাঝে মাঝে হ'ত ওর এ-বেদনা। কী জন্যে ডাক্তারে বুঝতে পারে না—শুধু শোনা যায় কোলাইটিস, পেরিটোনাইটিস,—রকমারি দুরুচ্চারণীয় নাম।

দুঃখ যখন আসে একা আসে না। ছায়ার মূল ব্যাধির সঙ্গে হাজারো উপসর্গ তো ছিলই লেগে, কখনো কাশি কখনো ক্ষুধা-

মান্দ্য—কখনো বা এম্‌নিই—কিছুই ভালো লাগে না। অথচ চোখের জল তো সহজে ফেলবে না মেয়ে। তাই আরো কষ্ট পায়। গড়পড়তা যারা নয় তাদের দুঃখ কল্পনার সুদে বাড়ে চক্র-বৃদ্ধি হারে। সয় তো সে-ই বেশি যে ঘুমোয় কম।

কিন্তু সেদিন যে-দেহের-দুঃখ অসিত দেখল স্বচক্ষে সেকথা বিশ্বাস করতেও ওর দুঃখ নিবিড় হ'য়ে ওঠে—এহেন যন্ত্রণা সৃষ্টি করতে পারলেন ভগবান? রাত্রে শুয়েছিল, হঠাৎ সুনীল এসে হাজির টেলিফোনে না পেয়ে : ছায়ার ধনুষ্টংকার মতন হয়েছে।

উদার অসিতকে নিয়ে ছুটে যায় পথে একজন মস্ত সার্জনকে তুলে নিয়ে : অধিকন্তু ন দোষায়।

গিয়ে দেখল—যা চোখে দেখা যায় না। ঐ দুর্বল দেহ—একটু বেশিও কথা বললেও যার ক্লান্তি আসে, উঠে বসতে পর্যন্ত যাকে দেওয়া হয় না—সেই মেয়ে অস্ত্রের মধ্যে বেদনায় কি না ধনুকের মতন বেঁকে যায়।…

আর ওরা ঠায় ব'সে থাকে শিয়রে…অসহায়।…

* * * *

* *

দিন তিনেক বাদে। উদারের বন্ধু সেই সার্জনটির চিকিৎসায় ছায়া ওরি মধ্যে একটু যেন ভালো। কিন্তু সে আর এক করুণ দৃশ্য দুঃখের যাওয়ার পথ—একটি, কিন্তু আসার পথ অগুন্তি।

হয়েছিল কি মাঝে দুদিন ওকে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল ওর এক প্রিয় বন্ধু প্রবীর তার স্ত্রীকে গান শেখাতে। নাম—দীপ্তি।

দীপ্তির সিনেমায় খুব নাম। গাইতও ভালো কিন্তু ভালো গান বিশেষ শেখে নি—প্রবীরের খুব ইচ্ছা নববধূকে একটু গানের মত গান শেখায়। তাই দীপ্তির মোটরে ক'রে এসে মাঝে মাঝে ওকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যেত। কিন্তু বালার ঘটনার পর থেকে অসিত ঠিক করেছিল—এ-সময়ে আর কাউকে গান শেখাবে না। কিন্তু পাছে প্রবীর ভুল বোঝে, ভাবে দীপ্তি অভিনেত্রী ব'লেই ওর কুণ্ঠা এই ভয়ে না বলতে পারে নি। চার পাঁচ দিনে দীপ্তিকে শিখিয়েছিল গোটা দুই ভজন আর গোটা দুই 'ঐসিতি' বাংলা গান—বলত প্রবীর হেসে। প্রবীর ছিল ওর শুধু বন্ধু নয় —দরদী। তাই বুঝত কেন ওকে বাজে যখন বাংলা গানের মহিমাকে লোকে অস্বীকার করে। বুঝত যে অভিমান ওর থাকলেও সবটাই আত্মাভিমান নয়। ও যে সত্যিই বাংলা গানের মঙ্গল চায় —ওস্তাদদের ওস্তাদি অবজ্ঞা বা পিঠ-চাপড়ে প্রশংসা উভয়কেই তৃণজ্ঞান করে ওর প্রতিভার সহজ গর্বে একথাও সে বুঝত। কারণ সে ছিল নিজেও কবি, বুদ্ধিমান, আদর্শবাদী, স্নেহশীল—তার উপরে বড় ঘরের ছেলে। জানত যে খাঁটি আভিজাত্যের মধ্যে যে-গর্ব তার মধ্যে নিন্দনীয় কিছু থাকলেও প্রশংসনীয় উপাদানই বেশি। নিন্দা অবজ্ঞায় আহত হয় হঠাৎ-নবাবেরা: আভিজাত্য যাদের রক্তে they laugh last—তাদের বাগ মানানো যায় না কুৎসা রটিয়ে, ভয় দেখিয়ে, এক-ঘরে ক'রে। বিশেষ যদি বংশের আভিজাত্যের সঙ্গে থাকে প্রতিভার আভিজাত্যের যোগ। অসিতের দুর্বলতা ও জানত ব'লেই বুঝত ওর ব্যথা। সম্প্রতি প্রবীরের সঙ্গে

অসিতের দেখা হ'ত না আগেকার মতন—কিন্তু তবু ওদের দরদের বন্ধন ছিল স্থায়ী—স্নেহও বহুদিনের। তাছাড়া ছায়ার গান প্রবীর গভীর ভাবেই ভালোবাসত আর ছায়ার গান যারা ভালোবাসে তাদের সঙ্গে অসিতের বনিবনাও হ'ত সহজেই।

কেবল ঐ এক-জায়গায় মনটা খুঁৎ খুঁৎ করত। তাই ছায়ার কাছে পারৎপক্ষে বলত না দীপ্তির গানের কথা। কিন্তু প্রীতির ও সুনীলের বা অজয়ের কাছ থেকে ছায়া খবর পেত যে অসিত মাঝে মাঝে দীপ্তিকে গান শিখিয়ে আসে আলগোছে। খবরটা প্রথম দিয়েছিল ওকে অজয়—এম্নি মুখ ফসকে। পরে সুনীলও বলত—এম্নিই, না ভেবে চিন্তে—যে, দীপ্তি অসিতের কাছে গান শিখে বেশ উন্নতি করছে।

সেদিনও কী ক'রে কথার পিঠে কথা উঠল। অজয়ই বুঝি বলল—দীপ্তির টকির গান শুনে বোঝবার উপায় নেই যে গানে ওর এতটা সহজ নৈপুণ্য আছে।

ছায়া বলল: "ওকে আজ শেখাতে গিয়েছিলে বুঝি অসিদা?"

অসিত কুণ্ঠিত ভাবে বলল: "হ্যাঁ" বেশিক্ষণ ছিলাম না—ওরা মোটর পাঠিয়ে দিল—প্রবীর নিজে এসেছিল কি না—"

ছায়া ম্লান হাসে: "তুমি অমন করো কেন অসিদা? ওখানে গিয়ে গান শিখিয়েছ এতে তো কিছুই অন্যায় হয় নি। বরং—(দীর্ঘনিশ্বাস)—সমস্ত দিন আমার বিছানার পাশে তোমাকে ধ'রে রেখেই আমাদের পাপ হচ্ছে।

দুদিন আগে দুদুটো গানের আসরে ও যায় নি যেটা শুনে

ছায়া গভীর তৃপ্তি পেয়েছিল। কিন্তু আজ একেবারে অন্য সুর।

অসিত ওকে আদর ক'রে বলে : "পাপ কি রে? আমি কি বলি নি সেই প্রথম দিনই যে এবার আমি আর কারুর জন্যে আসি নি?"

ছায়ার স্নিগ্ধ চোখ দুটি চিক চিক ক'রে ওঠে—ও বলে : কিন্তু আমার বিছানার পাশে ব'সে থেকে কী হবে অসিদা? —তবে থাকো। বেশিদিনের মেয়াদ তো নয়।"

প্রীতি ওদিকে ছায়ার জন্যে একটা গলাবন্ধ বুনছিল, শুনে "ষাট ষাট" ক'রে ওঠে। কাছে এসে ওর কপালে গাল রেখে বলে : "অমন কথা কি বলে মাণিক?"

অজয়ের সঙ্গে প্রীতির চোখোচোখি হয়। অজয় কোনোদিনই সান্ত্বনাবিৎ ছিল না, ব'লে ওঠে ওর অপটু ঢঙে : "এমন তো কোনো—মানে শক্ত অসুখ হয় নি—কেবল—"

ছায়া (হেসে) : বাঁচানো যাবে না এই যা। অজয় বাবু, আপনি আমার একটি কথা রাখবেন, লক্ষ্মীটি?

অজয় : কী?

ছায়া : তব্‌লার বোল ছেড়ে ডাক্তারি বুলি ধরবেন না। কেমন? যার কর্ম তাকে সাজে—অসিদা বলে না?

বড় হয়েছে বৈ কি—নৈলে এভাবে নির্ভয়ে পারে হাসতে মৃত্যুর প্রসঙ্গ নিয়ে?

একটু বাদে রাত নটায় ও ঘুমিয়ে পড়ে। অসিত অজয়ের সঙ্গে বেড়িয়ে এল। ঠিক এম্‌নি সময়ে কমলার অভ্যুদয়।

বৈঠকখানায় ওদের কথাবার্তা চলছে চাপা স্বরে।

কমলা : কেমন ?

অজয় : একটু তো ভালই মনে হচ্ছে। ঘুমুচ্ছে।

প্রতিমা (ঘরে এসে) : এই যে কমলা—কখন এলে ভাই ? আজ সারাদিন তোমার দেখা পাইনি। মন কেমন করছিল।

কমলা : আজ ভাই বাড়িতেও একজনের অসুখ—

প্রতিমা (হেসে) : তুমি ভাই পূর্বজন্মে এমন কিছু করেছিলে যার প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ল এ জন্মে হাবিজাবিদের জন্যে দিনরাত খেটে—কী রে ?

প্রীতির প্রবেশ : "চল তোমরা—ও ডাকছে।"

কমলা : উঠেছে ?

প্রীতি : হ্যাঁ—ঘুম আর ওর কতক্ষণ বলো ? এই ঘুমোয় এই ওঠে—আর তখন এমন ক'রে তাকায় চারদিকে (চোখে জল আসে ফের) আর জানো অসিদা, এইমাত্র কি বলছিল ?

অসিত : কী—কী ?

প্রীতি : আহা—বলছিল আমার গলা জড়িয়ে—অসিদা এবার শুধু আমার জন্যেই এসেছে মাসিমা। বিশ্বাস হয় ?

কমলা (অশ্রু গোপন ক'রে) : চলো চলো যাই—ওর কাছে কেউ আছে তো ?

প্রীতি : হ্যাঁ সুনীল আছে। তবে ও চায় সবাইকে।

* * * *

* *

ছায়ার ঘরে ওরা পা দিতেই ছায়া পাশ ফিরে তাকায়।

ছায়া : (সাভিমানে) : কোথায় যে থাকো সবাই ? এ ঘরে গল্প করলে কী হয় অসিদা ?

প্রীতি : তুমি ঘুমোচ্ছিলে কি না মাণিক।

ছায়া : ছাই ঘুম—আমার আবার ঘুম—এই যে কমলাদি! আজ সারাদিন তোমায়—

কমলা (ওর কাছে এসে ওর কপালে হাত রেখে) : এই একটু—এম্‌নি দেরি হ'য়ে গেল।

ছায়া (প্রতিমাকে) : কমলাদির বাড়িতেও কারুর খু—ব অসুখ বুঝি মা ? ওরা হাসে। দুঃখের মধ্যেও ক্ষণায়ু হাসি ওঠে বেজে ছায়ার করুণ পরিহাসে।

সুনীল ওর পায়ের কাছে ব'সে ওর পায়ে হাত বুলিয়ে দেয় ছায়া মৃদুস্বরে বলে : "থাক"। সুনীল শোনে না। ছায়া একটু এদিক ওদিক তাকায়।

প্রতিমা : কী মাণিক ? কিছু চাই ?

ছায়া : মাসিমা কোথায় ?

প্রীতি : এই যে মাণিক, তোমার ওষুধটা—(ছোট শিশি থেকে ঢালে পেয়ালায়)

ছায়া : ছাই ওষুধ—কিচ্ছু হয় না—ফেলে দাও ফেলে দাও নর্দমায় এক্ষুনি—

অসিত : সে কি রে ?

ছায়া : কী হয় ওসব ছাইভস্ম খেয়ে—ডাক্তাররা কিচ্ছু জানে না—জানে শুধু ভড়ং—মা গো।

প্রতিমা : এই যে মাণিক।

ছায়া : ক্ষিদে।

কমলা একটু আগে বেরিয়ে গিয়েছিল, জানত এই সময়ে ওর খাওয়ার কথা। ট্রে-তে সাজিয়ে আনল।

ছায়া (হেসে) : কমলাদি আমাদের অন্তর্যামী। বেচারি।

কমলা : না না—আমার কিছুই করতে হয় নি—প্রতিমাই সব ঠিক ক'রে রেখেছিল আমি শুধু নিয়ে এলাম।

ছায়া (মুখে দিয়েই) : ছাই হয়েছে এ-রান্না—নুনে পুড়ে গেছে। মা—মা—ওমা!

প্রতিমা (ব্যস্ত হ'য়ে এসে) : কী মা? কী হয়েছে।

প্রীতি : না না কিছু হয়নি শুধু—

ছায়া : শুধু ক্ষিদেয় খেতে পেল না মেয়েটা—এ আবার 'কিছু' না কি?—জানো মা, মাত্র এই একটা তরকারিই আমি ভালোবাসি—তাও ফেললে নুনে পুড়িয়ে। তোমরা কিচ্ছু দেখ না। (কান্না)

অসিত (কাছে গিয়ে) : লক্ষ্মী মেয়ে, অমন করে কি। তোমার জন্যে সবাই কত করছে বুঝতে তো পারো। তোমার উদারদাই বলছিল : রাজরাজড়ার ঘরেও এমন স্নেহের সেবা পায় না কেউ। তোমার মতন ধীর মেয়ের—অবিশ্যি আমরা বুঝি সবই—ক্ষিদে পেলে খাবার না থাকলে আমরা সুস্থ মানুষেও রেগে উঠি—কিন্তু তবু এটা তো বুঝতে হয়—দিনের পর দিন যদি তুমি কাউকে সেবা

করতে, দেখতে তোমারও কত ভুল হ'ত।

ছায়া নরম হয়ে আসে। অসিত ওর চোখের জল মুছে দেয়। প্রতিমা বলে: "একটু বাদেই ফের এনে দিচ্ছি মাণিক। এবার থেকে তোমার রান্নাটা আমি নিজে হাতেই রাঁধব।

ছায়া (অনুতপ্ত): না মা, লক্ষ্মী মামণি। তুমি রাঁধবে কেন মা? তাছাড়া এখন সূপ খেয়েই আমার ক্ষিদে মিটে গেছে, রাত দুপুরের জন্যে না হয় একটু সূপ রেখে দিও—এখন থাক্।

প্রতিমা (স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে): ঠিক তো?

ছায়া: হ্যাঁ—এখন বরং একটা গান শুনি—গাইবে অসিদা?

অসিত (ওর হাতে হাত বুলোতে বুলোতে): তোমাকে বলিনি—যখন তুমি গান শুনতে চাইবে তোমার অসিদাকে শুধু হুকুম করার অপেক্ষা?

সুনীল: এখন অজয়বাবুও আছেন হাজির—

ছায়া: আছেন? কই? তাঁকে দেখিনি তো—

অজয়: এই যে যথাস্থানেই—

খাটের ওপাশে হেঁটমুণ্ড উচ্ছ্রিত হ'য়ে ওঠে।

প্রীতি: অজয় বাবুকে না ডাকলে উনি থাকেন হাওয়ায় মিলিয়ে—

ছায়া: তোমার সেই কী বিশেষণটা অসিদা, সাপের?

অসিত: মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য?

অজয়: না না—আমি মানে—

ছায়া (হেসে): হয়েছে অজয় বাবু—তার চেয়ে আপনি বাজান। অসিদা—গাইবে ভাই?

অসিত : কোনটা ?

ছায়া : যদি অনুরোধ রাখো তো বলি।

অসিত : তোমার অনুরোধ কবে না রেখেছি ছায়া ?

ছায়া : 'থেকো প্রিয় পাশে' গানটা।

কমলার সঙ্গে অসিতের চোখোচোখি হয়। প্রীতির সঙ্গেও, কারণ এগানটি ওরা অত্যন্ত বেশি ভালোবাসত—দুজনেই।

প্রতিমা : ওটা বড্ড বড়—থাক্ না।

ছায়া : না ঐটেই শুনব—কথা দিয়েছ—মনে থাকে যেন।

অগত্যা অসিতকে গাইতে হ'ল প্রথম ওর ইংরাজিটা :

"Abide with me···fast falls the eventide···
The darkness deepens···Lord, with me abide···

তার পর এর তর্জমাটা—ঐ মূল গানেরই সুর ভেঙে :

থেকো প্রিয় পাশে···সাঁঝ-পাখা আসে নেমে···
আঁধার ঘনায় প্রভু, থেকো পাশে প্রেমে।
যবে ছেড়ে যায় সবে—সুখ নাহি হাসে,
অনাথের নাথ, তুমি থেকো মোর পাশে।

জীবনের ছোট দিনখানি হয় মায়া···
ধরণীর খেলা দীপমেলা হয় ছায়া···
মরণে অচিরে সবি ঝরে অবিকাশে···
হে চিরন্তন, তুমি থেকো মোর পাশে।

পলক-আড়াল নয়—থেকো কাছে কাছে:
তুমি ছাড়া আর বলো কে আমার আছে?
তুফানে কে আর তারা-দিশা উদ্‌ভাসে?
আঁধারে আলোকে তুমি থেকো মোর পাশে।

শেষ স্তবকটি ও ইচ্ছা ক'রেই বাদ দিল:

"কাছে এসো যবে আঁখি মুদিব হে শেষে…
দেখায়ো আকাশ কালো-বুকে আলোরেশে…
ধরাছায়া সরে—অধরার উষা আসে:
জীবনে মরণে নাথ, থেকো মোর পাশে।

প্রীতি ও কমলার ফের চোখোচোখি। অসিত বুঝল নিহিতার্থ।

ছায়া (ম্লান হেসে): কথা রাখলে না অসিদা।

অসিত (কাছে গিয়ে): সে কি ছায়া?

ছায়া: কী যে তা বেশ জানো অসিদা, তবু কেন এসব ভান বলো তো? কিন্তু কত আর ভোলাবে ভাই?

ওর দুচোখ উপছে জল পড়ে গাল বেয়ে।

অসিত কী বলবে?…প্রতিমা ছায়ার চোখের জল মুছিয়ে দেয় কপালে চুমো দিয়ে। মেয়ে চুপ করে থাকে। ঘরের মধ্যে কেউ কথা কয় না।…ওর মুখখানি স্তিমিত আলোয় কী ম্লান অথচ সুন্দর দেখায় যে।…প্রীতি কমলা চোখ মোছে। অসিত ওর মুখে দৃষ্টি রেখে ওর গালে কপালে চুলে হাত বুলিয়ে দেয়। ও চুপ ক'রে চেয়ে থাকে একদৃষ্টে—অসিতের মুখের পানে। সে দৃষ্টিতে শুধু কোমল কৃতজ্ঞতা।

সত্যিই কি ও বাঁচবে না—মনে হয় অসিতের সেদিন বার বার···তাই কি ও কেবল শুনতে চায় এই সব জীবনের সীমানা-পেরুনোর গান?

*   *   *   *
*   *

সেদিন সন্ধ্যাবেলা কমলা অজয় সুনীল কেউ তখনো আসেনি। প্রতিমা নিচে গিয়েছিল ছায়ার জন্যে ব্রথ তৈরি করতে।

অসিত একলা ওর গালে কপালে চুলে ওর অপটু ঢঙে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গল্প করছিল।

ছায়া হঠাৎ বলে: "ঘরের আলোটা নিভিয়ে দাও না ভাই।"

অসিত নিভিয়ে দেয়।

ছায়ার মুখে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। শীর্ণ মুখ··· কিন্তু চোখ দুটিতে যেন একটা নতুন আলো। অসিত তাকিয়ে থাকে।

ছায়া (হেসে): কী ভাবছ?

অসিত: আগে বলো তুমি কি ভাবছ?

ছায়া: ভাবছিলাম কী শুনবে? ভাবছিলাম যুদ্ধের মধ্যে শুধু একটি জিনিস ভালো—এই ব্ল্যাক-আউট।

অসিত: ভালো?

ছায়া: নয়? বাইরের দিকে চেয়ে দেখ—চাঁদের আলো কেমন নিটোল হয়ে উঠেছে। শহরে থাকার এই এক দারুণ শাস্তি—চাঁদের আলো কী বস্তু—শহুরে লোকেরা কোনোদিন জানতেই পারত না এই ব্ল্যাক-আউটের কৃপা বিনা। নয়?

অসিত চুপ ক'রে থাকে।

ছায়া নিজের মনেই ব'লে চলে: "আচ্ছা অসিদা, তোমার কি কখনো মনে হয়েছে—যেমন আজকাল আমার প্রায়ই মনে হয় —যে আমাদের আমোদ আহ্লাদ ধুমধাম সবই এইধরণের…কী বলব…মানে একটা ঝিকিমিকি…না, শুধু ঝিকিমিকি নয়… যেন একটা এমন গরম দেয়ালি যার তাপে ঢেকে যায় আলো? কাজেই হয়ত এ-দেয়ালির ব্ল্যাক-আউট হ'লে তবে সেই আলো উঠবে ফুটে যার তাপ নেই। মনে হয়েছে তোমার কখনো এমন কথা?

অসিত চমকে ওঠে…সেই ছায়া—কে বলবে? ওর চোখে চোখ রেখে বলে মৃদু হেসে: "তবে যে মুখ্য মেয়ে বলেন তিনি বো—ঝাতে পারেন না কোনো কথা? মনে আছে তোর সেই আগেকার বো—ঝাতের মিড়খানা?"

ছায়াও হাসে, বলে: "খুব মনে আছে। কেবল তোমাদেরি মনে থাকে না যে, সে-মিড় যখন দিতাম তার পর দশ দশটি বছর গেছে পেরিয়ে।"

"তোর পাটিগণিতে বুঝি তিনের নাম দশ?"

"আমার পাটিগণিতে নয় ভাই, দুঃখের পাটিগণিতে।"

অনুকম্পায় অসিতের হৃদয় ছেয়ে যায়। কিন্তু কী বলবে ওকে? সান্ত্বনা দেবার ভাষা খোঁজে তো মানুষ কতই, কিন্তু দরকারের সময় দেউলের ধনী আত্মীয়দের মতনই দেয় না কি সে গা-ঢাকা?'

"কী ভাবছ অসিদা?"

অসিত ওর চোখে চোখ রেখে বলে: "তোর ঐ উপমার কথাটাই ভাবছি দিদি।"

ছায়া খুসি হ'য়ে বলে: "দেখ অসিদা, কবিসঙ্গের গুণ।" ব'লেই গম্ভীর হ'য়ে যায়: "কিন্তু ঠাট্টা না অসিদা, বলো, একথা কি তোমার মনে হয় না?"

"হয় ভাই, তাই আনন্দও হয়।"

"কেন? আমার মন সেইদিকে ঘুরছে ব'লে যেদিকে ঘুরলে ভগবানকে পাওয়া যায়?" একটু চুপ ক'রে থেকে: "কই, উত্তর দিলে না? যা—ও। তুমি এখনো ভাবো আমাকে সেই আগেকার খুকি।"

অসিত ওকে আদর ক'রে বলে: "তা নয় রে নয়। আমি ভাবছিলাম কী জানিস? ভাবছিলাম এধরণের কথা তোর মুখে শুনব দুবছর আগেও ভাবিনি—স্বপ্নেও না।

ছায়া হাসে: "বনবাসে যারা থাকে তাদের স্বপ্নের দৌড় খুব বেশি নয় অসিদা। একদিন পরে বুঝবে একথার মানে যখন তোমার নয়নতারার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানবে যা স্বপ্নেও ভাবো নি।

"কী এমন কথা শুনি।"

"আমিই কি জানি?"

"তুই হেঁয়ালিতে কথা কইতে শিখলি কবে থেকে রে?"

"হেঁয়ালি নয় অসিদা। ঐ গানটা তুমি আমাকে শিখিয়েছিলে মনে পড়ে:

ওগো বিধুরা তারা
তুমি তন্দ্রাহারা

তার পর কী যেন—ঐ দেখ, অসুখে এত ভুলে যাই।"

অসিত বলল: "কার ধ্রুব শরণে—"

ছায়া বলল: "দূর্, গান নাকি আবার কেউ আবৃত্তি করে গাইতে পারলে—আমি করলাম ব'লে তুমি করবে—গেয়ে বলতে কী হয়? অন্তত গুন গুন ক'রে?

অসিত গায় আস্তে আস্তে—ছায়া চোখ বুঁজে ওরই হাতের 'পরে তাল দেয়—সমানে:

ওগো বিধুরা তারা,
তুমি তন্দ্রাহারা
কার ধ্রুব শরণে!
কার পথ চাহিয়া
দীপ খেয়া বাহিয়া
এলে দিন-মরণে?
কার বরণে তারা
তুমি শ্রান্তিহারা?

তুমি কত যে দূরে...
তবু কাছের সুরে
তব যে-কিংকিণি
বাজে অন্তরে মোর—
গাও তারি কি অঝোর
সুর সুধা-রাগিণী
নভো বীণায় তারা,
চির ভ্রান্তিহারা?

ছায়া (বাধা দিয়ে) ও কী হ'ল? মাঝে আর একটা স্তবক ছিল না—তুমি চির বিবাগী—

অসিত: ঐ দেখ্, আমিও ভুলে যাই—অসুখে না প'ড়েও।

ছায়া (ধমকে): শ্—শ্ গাইয়ে না কি আবার গানের মধ্যে কথা কয়?

অসিত গায়:

তুমি চির বিবাগী
জাগো কাহার লাগি'
ওই নীল শয়নে?
চারি ধারে করো কার
কায়া গন্ধ-বিথার
ছায়া ফুল চয়নে!
কার ধেয়ানে তারা,
তুমি আপনহারা?

ছায়া শুয়ে শুয়েই মাথা দোলায়। মাঝে মাঝে বলে "আহা"—কখনো "কী সুন্দর!" কখনো বা একটি দীর্ঘনিশ্বাস। একেবারে ওর কোলের কাছে ব'সে গায় কিনা তাই অসিত সবই শুনতে পায়—স্পষ্ট।

অসিত (গায়): তাই গোধূলি হিয়া…

ছায়া: ও কী? "মেঘ ঢেউয়ে গগনে" কোথায় গেল? অসিতের বুকের মধ্যে খালি খালি লাগে। এত যত্ন ক'রে ওর কাছে কে গান শিখেছে? এ তো গান শেখা নয়—এ যেন দীক্ষা নেওয়া।

ছায়া : ও কী ? থামলে যে ?

অসিত (ওর কপালে গাল রেখে) : এমন ক'রে আমার গান কেউ শেখে নি নয়নতারা !

ছায়া (তর্জনী তুলে শাসিয়ে) : মনে থাকবে একথা—যখন—

অসিত : যখন কী ?

ছায়া : বলো তো কী ?

অসিত : আজ তোরই দিন, আমি "মেনেছি হার মেনেছি।"

ছায়া : উদারদার ভাষায়—উটি কোরো না অসিদা ?

অসিত : কোন্‌টি ?

ছায়া : রবীন্দ্রনাথের কোটেশন। উদারদা বেশ বলে—তোমার মুখে রবীন্দ্রনাথের কোটেশন শোনায় কেমন যেন—কী কথাটা যেন—ঐ দেখ, ফের ভুলে গেলাম।

অসিত (হেসে) : অবাক্ জলপান ?

ছায়া : হ্যাঁ হ্যাঁ। উদারদা বেশ বলে কিন্তু এক একটা কথা, না ?

অসিত : এ-কথাটাও বেশ ? রবীন্দ্রনাথকে আমি যে সত্যি ভক্তি করি—

ছায়া : জানি—কিন্তু তবু কেমন যেন—কী বলব—মন নেয় না। যেখানকার যা। তোমরাই তো বলো কী সে কথাটা ?—হ্যাঁ মনে পড়েছে—"স্বধর্ম" : রবীন্দ্রনাথকে তুমি যতই ভক্তি করো না কেন অসিদা, এই স্বধর্মে তোমরা আলাদা, আর এত আলাদা যে—" —একটু ভেবে—"তবে হয়ত এতটা আলাদা হ'য়ে পড়তে না কারণ

রবীন্দ্রনাথকে যে তুমি ভক্তি না হোক আন্তরিক শ্রদ্ধা করো এর প্রমাণ আমি পেয়েছি—কিন্তু কী বলছিলাম যেন ?—হ্যাঁ বলছিলাম, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে মিলটুকু তোমার ছিল বা, সেটুকুও গেছে উবে তোমার গুরুদেবের প্রভাবে—কারণ তোমার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল যদি থাকে দু আনা তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল বড় জোর সিকি পয়সা—আর—আঃ—কী ক'রে বোঝাই ?—হ্যাঁ, মনে করো সেই রঙ্গলাল বাবুর ওখানে তর্ক রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে—মনে পড়ে ?

অসিত (জোর ক'রে হেসে) : সে কি ভুলবার কথা ? কিন্তু সে-তর্ক ছিল তো রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নয়—তাঁর গান নিয়ে।

ছায়া : মানি—কিন্তু অসিদা—না থাক্ গে।

অসিত : তাহ'লে ছাড়ব না—বলতেই হবে—না রে না—এখনো কি আমি তোর উপরে রাগ করতে পারি ? তোর বিশ্বাস হয় ?

ছায়া (অসিতের একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে) : না ভাই। অবিশ্বাস আমার আর যেখানেই থাকুক না কেন, তোমার সম্বন্ধে যে নেই এও কি তোমার বিশ্বাস হয় না ?

অসিত (হেসে) : উল্টো চাপ ? কিন্তু থাক্ সে কথা, বল্ কী বলতে যাচ্ছিলি। বলতেই হবে।

ছায়া (অগত্যা) মনে হয়— (ইতস্তত ক'রে)—তুমি রাবীন্দ্রিক ব'নে যেতে পারো না এটা যাঁরা রাবীন্দ্রিক তাঁরা টের পান—তাই তাঁদের সঙ্গে তোমার বাধে—যেমন বাধে, ধরো, আমার সঙ্গে তাঁদের যাঁরা 'ওস্তাদিপন্থী—কেন না তাঁরা আমার মুখে যতই কেন হিন্দুস্থানি গান শুনুন না—ভাবতেই পারেন না যে আমি তাঁদের

দলে ভিড়ে যেতে পারি যদিও—(ঠেশ দিয়ে) তোমাকে একথা কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারিনি।

অসিত (হাসতে চেষ্টা ক'রে) : শিক্ষা দিতে হয় কেমন ক'রে তাও বড় হবার পথে শিখেছিস বটে—তবে আমারি শিক্ষায়—কাজেই মুখ বুঁজে সইতে হবে।

ছায়া (অনুতপ্ত) : ও কি ভাই—আমি সত্যি অত কিছু ভেবে বলি নি ওকথা। ঐ দেখ, ফের কী বলতে ফের কী বলে ফেললাম। অসিদা, বড় হওয়া কি সহজ কথা ?

অসিত (সান্ত্বনার সুরে) : দূর্। এতে কি আমি কিছু মনে করতে পারি রে ? (হেসে) বিশেষ যখন তুই এত সুন্দর বো—ঝাতে শিখেছিস। (প্রসঙ্গান্তর আনতে)কিন্তু কথাটা চাপা প'ড়ে গেল। কী কথা হচ্ছিল যেন ? ঐ দেখ্, এবার আমিই গেছি ভুলে।

ছায়া : ভালোই হয়েছে অসিদা। সুরেলা গান থাকতে কী হবে বেসুরো কথা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে—(হঠাৎ)—কিন্তু আমি ভুলি নি যে, তোমার গানটা শেষ হয় নি।

অসিত : সে কি ?

ছায়া : বাঃ মনে নেই—ওর শেষ টুকু—"মেঘ ঢেউয়ে গগনে" গাও না ভাই, লক্ষ্মীটি।

অসিত অগত্যা ধরে :

মেঘ- ঢেউয়ে গগনে
তৃষা অনুসরণে
তুমি কোথা ভেসে যাও

যার বরে উজালা
তব রূপসী ডালা
তারি তরে কি উধাও
তব তরণী, তারা,
প্রেম স্বপনে হারা ?

খানিকক্ষণ নিশ্চুপ।

ছায়া বলে উদাস সুরে: "কী সুন্দর এই জায়গাটা অসিদা! আমার সময়ে সময়ে সত্যি মনে হয় আমরাও যদি ঐ তারার মতন ভেসে যেতে পারতাম কোথাও—"

"কোথায় ?"

"যেখানে হোক না—এ-পৃথিবীর চেয়ে তো খারাপ হ'তে পারে না!"

"বলিস কী।"

ওর চোখে জল ভ'রে আসে: "কিন্তু কথাটা কি সত্যি নয় অসিদা ? তুমি আমার ওপর রাগ করো ভগবানকে ডাকতে পারি না ব'লে। কিন্তু বলো তো, এই পৃথিবী যিনি তৈরি করেছেন তাঁকে ডাকতে কি কারুর ইচ্ছা হয়—হ'তে পারে কখনো ?" ব'লেই অসিতের মুখের দিকে চেয়ে ওর দুটো হাতই টেনে রাখে নিজের গালে: "ঐ দেখ অসিদা, কথা বলার আর্ট যে জানে না তার কেন কথার ফাঁদে পা বাড়ানো ? কিন্তু লক্ষ্মীটি ভাই, কিছু মনে কোরো না। সত্যি বিশ্বাস করো—কথাবার্তায় আমি এমন বেসামাল হতাম না—যদি না অসুখের যন্ত্রণায় ভুল হয়ে যেত। না, ভুল না—দোষই বলব।

অসিত শান্ত সুরেই বলে: "যা সত্যি ব'লে বিশ্বাস করিস ব'লে ফেললে বড় জোর ভুলই হ'তে পারে—দোষ হবে কেন?"

ছায়া সুর নামিয়ে নিয়ে বলে: "দোষ হ'ত না যদি তুমি দুঃখ না পেতে। ভগবানকে যে তুমি ভালোবাসো। যাকে ভালোবাসি তার দোষ আছে নিজে জানলেও অপরের মুখে শুনতে কার ভালো লাগে বলো?" একটু চুপ ক'রে থেকে: "কী? ভাবছ, ছায়া কী খারাপ মেয়ে—নৈলে ভগবানকে বলে খারাপ?"

অসিত স্নিগ্ধ কণ্ঠেই বলে: "সেদিন নদীকে ওর মা বকেছিল, মেয়ের কী কান্না! বলল—মার মতন দুষ্টু মেয়ে আর দুটি নেই।"

ছায়া হাসল: "এবার আমাকে নিয়েছ একহাত—মানছি।" বলতে বলতে সুর যায় ওর বদ্‌লে: "কিন্তু সত্যি বলো তো অসিদা—কালও শুনলাম কত জায়গায় বোমা পড়েছে—কত ছেলে মেয়ে রুগ্ন দুর্বলরা মারা যাচ্ছে। যে জগতে এই সব—"

"কিন্তু এইটেই তো এজগতের স—ব নয়।"

"সব নয় মানি। ভালো লোকও আছে। তোমাকে দেখেছি, বাপীকে দেখেছি, মাকে দেখেছি, কমলাদিকে, ছোটমামাকে—কিন্তু রাগ কোরো না ভাই···এদের জন্যেই আরো আমার ভালো লাগে না এ-পৃথিবী। মনে হয় এ-নরককুণ্ডে এধরণের ভালো লোক কেন জন্মায় দুচারটেও? কারণ কষ্ট দেয় যারা তাদের তো কষ্ট নেই—কষ্টের বোঝা বুকে চেপে বসে বেশি ভালো লোকেরই, তাই এ-পৃথিবীর যদি সবাই হ'ত রাক্ষস তাহ'লে আমি বুঝতাম এ-ব্যবস্থার তবু একটা মানে আছে।"

"কী মানে?"

"নরকটা নরকের লোকের কাছে চমৎকার লাগে—এ তো দেখাই যাচ্ছে। কিন্তু সে-রাজ্যে দুচারটে অসহায় স্বর্গের বাসিন্দাকে এনে ছেড়ে দেওয়া কেন?"

"তাহ'লে স্বর্গ কোথাও একটা আছে স্বীকার করছিস তো?"

ছায়া একটু ভেবে বলে: "তা জানি না। তবে বাপার মতন লোক, তোমার মতন লোক দেখে মনে হয় হয়ত থাকতেও পারে। নৈলে তোমরা এলে কোত্থেকে?"

অসিতের বুকের রক্ত দ্রুত বয়। কী গভীর শক্তি শ্রদ্ধা করবার—ঘৃণা করবার। যাকে গ্রহণ করে সত্য ব'লে—পূজা দেয় সর্বান্তঃকরণে—কিন্তু যাকে মিথ্যা ব'লে জানে তার কথা ভাবতেও হ'য়ে ওঠে ক্ষিপ্তের ম'ত। এর নাম কি নাস্তিক, না আস্তিক? অস্তি-র 'পরেই নয় কি সব গভীর অনুভূতির ভর?

ছায়া অসিতের চিবুক ধ'রে বলে: "কী ভাবছ ভাই? রাগ করলে?"

অসিত বলে কোমল কণ্ঠে: "তোর ওপর কি কেউ রাগ করতে পারে রে?"

"তবে কী ভাবছিলে অমন দুঃখু দুঃখু মুখ করে?"

"ভাবছিলাম—তোকে কত সময়েই না ভুল বুঝেছি।"

"কী ভাবে?"

"বলব? না—আজ থাক্।"

"লক্ষ্মীটি ভাই, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

"আচ্ছা আচ্ছা—শোন্ বলি তবে। কিন্তু মন দিয়ে শোন্—আর ভেবে জবাব দিস্—আমার ভুল হ'লে টুকিস কিন্তু।"

"তোমার ভুল টুকব কি না আমি?"

"নৈলে এই মুখ বন্ধ।"

"আচ্ছা আচ্ছা, যা মনে হবে বলব—কথা দিচ্ছি।"

"প্রথম কথা, বল্ দেখি, যখন তুই হিন্দুস্থানি গান প্রথম শুনিস—ভালো লেগেছিল?"

"একটুও না।"

"আচ্ছা। কিন্তু তার পর যখন একটু একটু ক'রে হিন্দুস্থানি গানে তোর ভালোবাসা এল তখন তোর মনের মধ্যে কি রকম বিপ্লব ঘ'টে গেল মনে করতে চেষ্টা কর্। ধীরে ধীরে বুকের মধ্যে যেন একটা দরজা মতন খুলে গেল—আর তখন দেখলি অবাক হ'য়ে যে (দু'দিন আগেও যে ছিল বাইরের পথিক সে কখন উড়ে এসে বসেছে বুক জুড়ে) নয় কি?"

"বড় সুন্দর বলেছ ভাই। তুমি কী করে এমন কথা কও অসিদা?"

"যেমন ক'রে তুই গান গাস।"

"আ—হা" ফের সেই মিড় "আমি গাই—না তুমি গাওয়াও?"

"ও বললে শুনব না। কেউ কাকে কিছু করাতে চাইলেই কি করাতে পারে রে? আমি তো আরো কত ছাত্র ছাত্রীকে শেখাতে চেষ্টা করেছি—কিন্তু তাদের মধ্যে এমন গান কি আর একটিও গাইল?"

"যেতে দাও ও-সব বাজে কথা। যা বলছিলে বলো।—কিন্তু না রোসো। তুমি যা বলছিলে আগে আর একটু সমঝে নিই। হ্যাঁ হিন্দুস্থানি গান আমার ভালো লাগল এম্নি ক'রেই বটে। বেশ মনে আছে তোমার মুখে 'দীন দয়াল গোপাল হরি' গানটি শুনেই প্রথম মনে হ'ল কী যেন একটা হ'য়ে গেল এইখানে—খু—ব ভিতরে"—ছায়া ওর বুকের মধ্যে আঙুল দিয়ে দেখায়। কিন্তু—"

"বল্।"

"তোমাদের ভগবানকে ভালোবাসবার পথ এ নয়—তোমরাই তো বলো।—শোনো, আমি কী বলতে চাইছি বলতে দাও আগে—এসব তো ভালো বুঝি না ভাই।—কী বলছিলাম যেন?···হ্যাঁ, বলছিলাম তোমাদের ভগবানকে আগে মেনে নিতে হয় তবে তিনি দেখা দেন প্রথমে বিশ্বাস হ'লে—এই না? কিন্তু এইখানেই যে আমার বাধে। আগে থাকতে মেনে নেব কেন? কই, হিন্দুস্থানি গানকে তো এ ভাবে না জেনে মেনে নিই নি। মানে, তাকে ভালো-বেসেছি ব'লেই মেনেছি—ভালোবাসা উচিত ব'লে তো আর মেনে নিই নি আগে থাকতে? শুনতে শুনতে হিন্দুস্থানি গান ভালো লেগেছে তাই করেছি বরণ।"

"যদি বলি ভগবানের কথাও ঠিক এম্নিই শুনতে শুনতে ভালো লাগে—তারপর একদিন হঠাৎ দুয়ার খোলে—দেখা যায় অনেক কিছু যা ছিল অর্থহীন হ'য়ে উঠল সার্থক।"

"বুঝতে পারলাম না ভাই। এত বড় তো তাই ব'লে হওয়া যায় না দুদিনে।"

ওর মুখে ম্লান হাসি ফুটে ওঠে।

"আচ্ছা তবে অন্য ভাবে বলি কথাটা। আমার গুণগান তোর নগেন ওস্তাদের কাছে শুনে শুনে একটুও কি মনে হয় নি অসিদা লোকটা হয়ত খারাপ না হ'তেও পারে?"

ছায়া মুখ টিপে হাসে: "শুনিয়ে যারা তারা বলিয়ে নিতে চায় বার বারই, না? ভালো যে তোমাকে আমি বেসেছিলাম তোমার রূপ গুণ গানের গল্প শুনেই এ তো মাসিমার কাছে কতদিনই শুনেছ। তবু ফের?"

"কিন্তু তখন তো আমাকে জানতিস না নিজে?"

"না। কিন্তু যাদের কাছে শুনেছিলাম তোমার কথা—বাপীর কাছে, মাসিমার কাছে, আরো কতলোকের কাছে—তাদের কথায় বিশ্বাস না ক'রে পারা যায় না যে।"

"খাসা কথা। কিন্তু যখন আমি বলি যে, এমন লোকের মুখে আমি শুনেছি ভগবানের রূপের, গুণের, হাসির, বাঁশির কথা যাঁদের কথায় বিশ্বাস না ক'রে পারা যায় না—তখন তুই এত শত আপত্তি করিস কেন?"

ছায়া একটু ভাবল পরে বলল: "আপত্তি ঠিক করি না—তবে এমন লোক বড় বেশি তো দেখি না—অবিশ্যি তোমাকে ছাড়া। আর হ্যাঁ—তোমার বন্ধু আনন্দদেব।"

"কিন্তু নাম শুনেছিস তো? যেমন শ্রীরামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ, চৈতন্যদেব, যিশুখৃষ্ট—"

"তাঁদের ভক্তি করতে আমি নারাজ কবে?"

"একটু নারাজ নোস কি? আমাদের নারদ মুনি বলেছেন ভক্তির দুটি মুখ্য সাধন: 'মহৎকৃপয়া ভগবৎকৃপালেশাৎ বা—' অর্থাৎ মহাজনের কৃপা কি না সাধুদের সঙ্গ, আর ভগবানের করুণা।'

"কিন্তু ভগবানের করুণা তো ভাই আমরা পাই নি—কাজেই আমাদের একটি মাত্র আশা—ঐ সাধুদের সঙ্গ। সাধুদের তো আমি সত্যিই ভক্তি করি, তুমি জানো।" একটু চুপ ক'রে থেকে: "তাছাড়া···সাধুদের তেমন ভক্তি করলে তাঁদের ভক্তির ছোঁয়াচও লাগবেই তাহ'লে আমার লাগলো না কেন?"

"লেগেছে। তাই তো বলছিলাম—নিজেকে ঠিক চেনাও সহজ নয়। আর এ শুধু আমার কথা নয়। অনেকেই তোর ভক্তির গান শুনে টের পেয়েছে যে তুই ভক্তিমতী। যেমন আনন্দ বলত এলাহাবাদে—মনে নেই?"

"কিন্তু তাহ'লে অভক্তিও আমার মধ্যে এত বেশি কেন?"

"হয়ত এমন আরো অনেককে তুই ভক্তি করিস যাদের মধ্যে অভক্তি প্রবল। পরমহংসদেব বলতেন 'মন ধোপাঘরের কাপড় লালে ছোপাও লাল নীলে নীল'। মনকে যে-রঙে রঙাবি সেই রঙেই সে উঠবে রঙিয়ে। তাছাড়া"—

"রোসো রোসো—অত হু হু ক'রে নয়। আমি—মানে ভালো প্রভাব ভালো রঙ তো সত্যিই চাই। বিশ্বাস করো অসিদা—কত সময়েই যে আমার প্রাণ আকুলি বিকুলি করতে থাকে যে, ভক্তি আমার হোক—বিশেষ তোমাকে দেখার পর থেকে"—কথাটা শেষ হ'ল ওর চোখের জলে।

. অসিত ওর চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলে: "আমি তো বিশ্বাস করি রে—তুই-ই বিশ্বাস করতে চাস না যে ভক্তি তোর আছে। হয় কি জানিস। ভক্তির ঢেউ এসে লাগে আমাদের সবাইয়েরই বুকের তটে। কিন্তু ঢেউয়ের মতনই স'রে যায় তার পরেই। তাই জন্যেই না সাধনার দরকার। যে-ফিনকিটা জ্বলে সেটা আলোই বটে কিন্তু জগত জুড়ে অন্ধকারের গুপ্তচরেরা মুখিয়ে রয়েছে—আলো জ্বললেই দেবে নিভিয়ে। তাইতো যে-আলো জ্বলে স্ফুলিঙ্গ হ'য়ে তাকে গনগনে আগুন ক'রে দাঁড় করাতে চাইলে তাঁদের শরণাপন্ন হই যাঁরা প্রেমের ধুনি জ্বেলে ব'সে আছেন—নিভলেই ফের দেবেন ধরিয়ে।"

ছায়া একটু ভাবে, পরে বলে: "একথা হয়ত তোমার সত্যি। কারণ আমার নিজেরও অনেক সময়েই মনে হয়েছে যে আমি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রণাম এসব চাই বটে, সত্যিই চাই সাধু মহৎদের প্রভাব, কিন্তু আমাদের চারধারে যে সব অশ্রদ্ধা অভক্তির আঁধি সে-সবের প্রভাবও হয়ত কাটাতে চাইনে পুরোপুরি—কেবল, একটা কথা মনে আসছে ভাই। জিজ্ঞাসা করলে রাগ করবে না বলো?"

"বলি নি তোর ওপর রাগ করা যায় না চেষ্টা করলেও?"

ছায়া হাসে: "এসব কথা ব'লে যার মুখ একসময়ে বন্ধ করতে—সে-ছেলেমানুষটি যে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোপ পেয়েছে এটা কিন্তু তুমি মনে রাখতে পারতে—চেষ্টা করলে।"

অসিত হেসে বলে: "কথায় ফের হার মানালি—মানছি।"

ছায়া ওর মুখ চেপে ধরে, বলে: "কেন এমন ক'রে অপরাধ বাড়াও অসিদা? ছি—এরকম কথা ঠাট্টা ক'রেও বলতে নেই। কিন্তু

শোনো যা বলতে চাচ্ছিলাম। কি বলছিলাম যেন? হ্যাঁ। কিন্তু তার আগে একটা প্রশ্ন করতে পারি?"

অসিত উত্তর দেয় না শুধু হেসে ওর মাথায় হাত বুলোয়···ছায়া ব'লে চলে:

"জগতে যে সব নীচতা ক্ষুদ্রতা কুৎসিত কাণ্ডকারখানা রোজ ঘটছে—সেসব তো ভগবানের ইচ্ছাতেই ঘটছে?"

"না। তিনি প্রেমময় মঙ্গলময়। কিন্তু তাঁর রীতিনীতি বুঝতে হ'লে জ্ঞান চাই। আমরা যে-জ্ঞান বুদ্ধি নিয়ে ভাবি এই এই—তাদের গণ্ডি অতি ছোট। মনের দূরবীণে তাঁর স্বরূপের অতি সামান্যই ধরা পড়ে। আর, একটু দেখে, একটু শুনে, একটু চেখে, একটু গুণে তাঁর সম্বন্ধে ছক কাটা চলে না। কিন্তু এখানেও আসে দুটো কথা। এক, যাঁরা সাধু তাঁদেরকে সাধু বলে মানা—মানে যাঁরা ভগবানের হালচাল জানেন তাঁদের কথা প্রথমটায় যদি মানতেও না পারি শ্রদ্ধা নিয়ে শোনা: দুই—সাধুরা যে-জীবন যাপন করছেন সেটা সাধারণ মানুষদের জীবনের চেয়ে ভালো এই বিশ্বাসটিকে লালন করা প্রাণপণে।"

"ঐ ফের মুষ্কিলে ফেললে অসিদা। এ-বিশ্বাসকে লালন করব কী ক'রে যদি সেটা না-ই থাকে? শূন্যকে পুষে বাড়িয়ে পুণ্য দাঁড় করা যায় কি?"

অসিত মৃদু হাসে: "একথার জবাব দিতে পারি যুক্তিজাতীয় কথা দিয়ে। কিন্তু আশ্রমে গুরুদেবের সংস্পর্শে এসে আর কিছু না শিখি একটা জিনিস শিখেছি—যে এধরণের যুক্তি হ'ল খতিয়ে

বেসুরো ঢাকের বাদ্যি—সুরেলা রসুনচৌকি নয়। তার চেয়ে বলি শোন্ আমার নিজের একটা অনুভবের কথা। আমিও ছেলেবেলায় অবিশ্বাসী ছিলাম। কিন্তু দেখতাম বিশ্বাসও থাকত লুকিয়ে সেই সঙ্গে। তাই জানি যে, বিশ্বাস আমাদের মধ্যে আছেই, যেমন আছে সুর বোধ, রূপবোধ, স্নেহবোধ। কেন না তোর ওকথার মার নেই যে, যার বিন্দুবিসর্গও নেই তাকে লালন করার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু জীবনে দেখতে পাই কি? না, সাধুদের জীবনচরিত পড়তে পড়তে লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে জেগে উঠেছে প্রণামের সাধ। এরই নাম শ্রদ্ধা ভক্তি। তবে ঐ তো তুই নিজেই বললি না টুপ ক'রে যে, এ-শ্রদ্ধাকে বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে তাকে একটু আগলে রাখতে হয়: দিন রাত অভক্তি অশ্রদ্ধার আঁধিতে বাস করলে বীজ অঙ্কুরেই যায় শুকিয়ে। আমাদের এ-যুগে এই কথাটাই অনেকে বুঝেও বোঝে না যে, বীজের মধ্যে গাছটা থাকলেও রস আলো হাওয়ায় লালন বিনা সে কিছুতেই পারে না গাছ হ'তে। এ-কথার ভাষ্য এই যে, অনেক বড় অনুভবই প্রথম দিকে দেখা দেয় স্ফুলিঙ্গ হ'য়ে—কিন্তু স্ফুলিঙ্গের মধ্যে তেজ বা তাপ নেই ব'লেই কি আগুন বলে: তুমি আমার বংশেরি কেউ নও? একটুখানির জন্যে জ্বলবে যে-দেশলাই সেও যদি হাতের আড়ালের অপেক্ষা রাখে, তাহ'লে মনের, প্রাণের, অন্তরের মধ্যে যে-বাতি জ্বলবে চির দিনের আলো হ'য়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে একটু সাধনার দরকার হ'লে মুখ ভার করব এর নাম কি আবদার নয়?

ছায়া অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে, পরে বলে গাঢ়কণ্ঠে:

"অসিদা ভাই, এবার তোমাকে প্রণাম করাই হয়নি—দাও না একটু পায়ের ধুলো।"

অসিত কোমল কণ্ঠে বলে: "দূর্।"

ছায়া বলে গাঢ় কণ্ঠে: "দূর্ না। দাও একটু। আমার সত্যি দরকার।" ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বলে: "কিন্তু তুমি কত বড় ভুলে যাই ভাই তোমাকে দেখেই। দোষ তোমারই।" ব'লে ম্লান হাসে: "সত্যি কত সহিষ্ণু। কী স্নিগ্ধ। না—প্রতিভার কথা বলব না—কারণ—বলব অসিদা?"

অসিত চুপ ক'রে থাকে। কী বলবে?

"বলছিলাম—প্রতিভা তোমার কতবড় একথা আমার মতন ক'রে কজন জানে বলো? কিন্তু—আমি বলতে যাচিছলাম যে তবু—মানে এ-প্রতিভাও তোমার বাইরের জিনিস—এক হিসেবে।" একটু দম নিয়ে: "কারণ—এ যদি তোমার নাও থাকত তবু তোমার পায়ের ধুলো নিতে ইচেছ হ'ত আপন ব'লে—অন্তত আমার হ'ত, বিশ্বাস কোরো।···তবে পরকে তুমি আপন করতে পারবে না কেন? আমাদের মতন গণ্ডি তো তোমার নেই—না শোনো আর একটু—কী বলছিলাম? হ্যাঁ—আশ্রমজীবন আমার ভালো লাগে না ভাই, তুমি জানো—ক্ষমাও করেছ সেজন্যে, কিন্তু এ যে পেয়েছ এ হয়ত আশ্রমে থাকার জন্যেই। কারণ কী একটা পেয়েছ তুমি আশ্রমে থেকে—এ বাপীও বলত, আমারও মনে হয়—বিশেষ আজকাল। একটু থেমে ফের ও ব'লে চলে: "বিশেষ আজকাল বলছি এইজন্যে যে, জগতটাকে একটু চিনতে পেরে হয়ত চোখ আমার একটু খুলেছে।

আর আমি জানি তো এ কতবড় উদারতা—আমার চেয়ে বেশি জানে কজন? আমার মতন কজন তোমাকে এত দুঃখ দিয়েছে তোমার জীবনের সব চেয়ে বড় বিশ্বাস, সবচেয়ে বড় অবলম্বনকে কেবল সন্দেহের চোখে দেখে, অবিশ্বাসের ভাষায় জেরা ক'রে—অথচ অসিদা, তবু তুমি দাও নি তো হাল ছেড়ে—ঠেলো নি তো আমাকে দূরে—ঘিরে রেখেছ তোমার নিঃস্বার্থ স্নেহ দিয়ে—তোমার পায়ের ধুলো নেব না তো নেব কার?—না, বলতে দাও আমাকে—ও কিছুনা—আমি অমন হাঁপাই সময়ে সময়ে—গা-সওয়া হ'য়ে গেছে। শোনো ভাই। হয়ত আজ না বললে বলা হবেও না আর।···এ সত্যি কথা যে এ-পৃথিবীটা আমার ভালো লাগে না। তবু এ-ও সত্যি যে, কষ্ট হয় ছেড়ে যেতে, আর, তার কারণ কী শুনবে?—কারণ তোমার মতন দুএকটা লোককে এখানেই দেখেছি—অথচ দেখে এখনো সাধ মেটে নি—বিশ্বাস কোরো।"

ও ফের থেমে একটু দম নেয়, তারপর বলে হাসি টেনে: "বিশ্বাস করবে না? না করবে—আমি জানি। কারণ—আমরা অবিশ্বাসী হ'লামই বা, তুমি তো ভাই বিশ্বাসী। সত্যি অসিদা, আমি চ'লে গেলে তুমি দুঃখ পাবে জানি ব'লেই এক একবার ভাবি বাঁচলেও ক্ষতি ছিল না। না না—অমন মুখ কোরো না, লক্ষ্মীটি?—কে জানে অঘটনও তো ঘটে—তাই হয়ত বাঁচতেও পারি—আর তখন কে বলতে পারে—দেখবে হয়ত—তোমার নাস্তিক নয়ন-তারাও শুধু তোমাকে প্রণাম করতে করতেই একদিন হঠাৎ আস্তিক

ব'নে গেছে—শুনেছি সুঁয়োপোকাও হঠাৎ একদিন হয় প্রজাপতি পাখা গজিয়ে।"

প্রতিমা "ছায়া" ব'লে ঢুকেই থম্‌কে গেল। সঙ্গে কমলা।

"কী মা?—না না, খুব ভালো আছি—ও আমি তো সময়ে সময়ে একটু বেশি হাঁপিয়েই থাকি।—কী ব্যাপার?"

প্রতিমা বলল: "বড্ড দেরি হ'য়ে গেল মাণিক—হয়েছিল কি—"

ছায়া বলল হেসে: "ভয় নেই মা, আজ তেমন কিছু স্কিদে নেই। অসিদা আজ এত সুন্দর সুন্দর সব কথা বলেছে—তাই হয়ত।"

কমলা অসিতের পানে তাকিয়ে বলে মৃদস্বরে: "বলি নি?"

অসিত হেসে বলে: "বলেছিলে।"

* * * *

* *

সামনের একটি ধুতুরা গাছের দিকে চেয়ে আজ অসিতের কেবলই মনে পড়ে কমলার "বলি নি?" ও ছিল ভারি চমৎকার মেয়ে—এ সদা-সন্দিগ্ধ—যুগে এমনটি বড় দেখা যায় না। শুধু ছায়াকে ব'লে নয়, সবারই মধ্যে ভালোটা দেখতে পেত। কত লোকের সম্বন্ধে অসিত কত সময়ে কঠোর সমালোচনা করেছে, কিন্তু অসিতকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করা সত্ত্বেও কমলা প্রতিবাদ করেছে শান্তকণ্ঠে, বলেছে নিন্দিত মানুষটির নানা গুণের কথা। যখন ও কারুর দোষ স্বীকার করত—যেন বাধ্য হয়েই, বলত হতাশ

স্বরে : "তাই তো দেখছি।" বিশেষত সাধক সাধিকা কারুর দোষ দেখলে। ও অনেকদিন পর্যন্ত এই সাদা সত্যটিকে সাদা ব'লে চিনতে পারেনি যে, মহাপুরুষদের সঙ্গে সংস্পর্শে আসতে না আসতে কাপুরুষরা সুপুরুষ হ'য়ে ওঠে না—তাই স্বচক্ষে দেখেও ও কেবলই বলত যে এ হ'তেই পারে না, ও-ই ভুল দেখেছে কেন না গুরুদেবের উজ্জ্বলসংস্পর্শে যারা এসেছে তারা রাতারাতি দেবদূত ব'নে যায় নি এ কখনো হয়? এই নিয়ে অসিতের সঙ্গে ওর প্রায়ই তর্ক বাধত—শুধু ছায়াকে নিয়েই নয়। ছায়া নাস্তিক ভেবে অসিত কখনো কখনো গভীর বেদনা বোধ করলে কমলা যে ভাবে বলত ঘাড় নেড়ে "হ'তেই পারে না—দেখে নিও, ও মেয়ের মধ্যে রয়েছে ভক্তির কাঁচা সোনা—নৈলে"—ব'লে অবতারণা করত কত যুক্তিরই যে—ঠিক তেমনি ঢঙেই ও আপত্তি করত যখন অসিত বলত যে অনেকদিন সাধনা করলেই যে রাম শ্যাম যদু মধু সবাই মস্ত সাধক হ'য়ে দাঁড়াবে এমন কোন কথা নেই, দেখতে হবে কে কী ভাবে সাধনা করেছে। কমলা যদি গুরুদেব বা শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বা বিবেকানন্দের নজির দিত তাহ'লে অসিত বলত ব্যঙ্গ হেসে ওঁরা ঈশ্বরকোটির থাকের লোক দুদিনেও সাধনায় যে-ফল পাবেন যে ভাবে দ্রুতসিদ্ধ হ'তেই পারে না জীবকোটি থাকের মানুষ।

ছায়া কমলার সঙ্গে অসিতের এসব তর্ক শুনতে খুব ভালোবাসত, মাঝে মাঝে বায়না ধরত : "অসিদা, লক্ষ্মীটি ভাই, কমলাদিকে একটু বসিয়ে দাও না।"

কমলা তো অবাক্ : "মেয়ে বলে কি গো?"

"না ব'লে করি কী কমলাদি। প্রাণে বাঁচতে হবে তো। আমার মন বেচারিকে অসিদা এতদিন শিশুমন শিশুমন ব'লে যা অপদস্থ করত যে সে অনেক সময়ে সেই খরগোষের মতন চাইত পুকুরে ডুবে মরতে। ভাগ্যে সে সময়ে দেখল ব্যাং খরগোষকেও ভয় পায়—তাই না সে সান্ত্বনা পেয়ে বলল—আচ্ছা বাঁচা চলে তাহ'লে।"

কমলা খুব হাসত। প্রীতি বলত: "কমলাদিকে ব্যাং বললি মেয়ে?"

ছায়া অপ্রতিভ হয়ে, বলত: "মাফ কোরো ভাই—আমি তা কিন্তু বলতে চাই নি—"

কমলা হাসত: "যদি বলতেই ছায়া, তোমার আধ আধ ভাষায় তা-ও মিষ্টি লাগত।"

ছায়া বলত হেসে: "এখানে ফের এক হাত নিতে চাইলে বটে কমলাদি, কিন্তু ফস্কে গেল। কেন না স্বভাবটি সুন্দর হ'লে শিশুদের আধ আধ ভাষার চেয়েও মিষ্টি লাগে বিজ্ঞ তোৎলামি। বিশ্বাস না হয় অসিদাকে সালিশি মানো।"

প্রীতি রাগ করত: "ওকে তোৎলা বললি? বড় বাড় বেড়েছে না?"

অসিত সায় দিত: "হ্যাঁ—দাও তো ধমকে ক'ষে। বিদুষীকে বলা তোৎলা?"

কমলা শুধু এম এ নয়—পড়াশুনো অনেক করেছিল এবং বইকে সত্যি সংসারের চেয়েও ভালোবাসত। কিন্তু ভারি অপ্রস্তুত বোধ করত কেউ যদি ওকে বলত বিদুষী। দেখে অসিত আরো ক্ষ্যাপাত ওকে এই নামে ডেকে।

অসিত কমলার "বিদুষী" নামকরণ করেছিল আরো এইজন্যে যে কমলার মানবজীবন সম্বন্ধে বহু ধারণাই গ'ড়ে উঠেছিল পুথির রায় জড়ো ক'রে ক'রে। সংসারে ভালো পুথিও মেলে, তাদের পাতা ওল্টালে ভালো মতামতও হাজিরি দেয় কাতারে কাতারে। কাজেই কমলা খুব হেসে খেলে কাটাত—'দাদা গো, দুনিয়ার সকল ভালো'-কে ওর মালাজপের বীজমন্ত্র ক'রে। নিতান্ত কোনঠাশা হ'লে দিত উদ্ধৃতি : রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মানুষের স্বভাবে (human nature এ) তাঁর বিশ্বাস আছে—অতএব যুদ্ধোন্মত্ত জগতও নরক নয়—তার মধ্যেও স্বর্গ রয়েছে উহ্য ; কিংবা মেয়েরা ভালোবাসে শুধু নিজেকে দিতে—বলেছেন এলেন কে—অতএব মেয়েরা দজ্জাল হ'লে পস্তাবেই ; কিম্বা, খৃষ্ট বলেছেন--শিশুরা স্বর্গরাজ্যের অধিকারী—অতএব শিশুদের মধ্যে নীচতা স্বার্থপরতা থাকতেই পারে না—এই ধরণের সব অকাট্য নজির।

এ-ধরণের আদর্শবাদে অসিতের মন কোনোদিনই সাড়া দেয় নি। ওর জীবনের প্রধান উপজীব্য ছিল শুধু কল্পনার সৌন্দর্য নয়—জীবনের মধ্যে অনস্বীকার্য সত্যবস্তু। তবে যাকে সত্য ব'লে মনে হচ্ছে কোনো বিশেষ চেতনা দিয়ে—সে-চেতনার যতক্ষণ না বদল হচ্ছে ততক্ষণ চেতনার সেই এজাহারকেই মেনে চলতে হবে—পরের মুখে ঝাল খাওয়া চলবে না—এই ছিল ওর পণ।

সাধনার ক্ষেত্রে মানুষ হবে ভাববিলাসী এ কেমন কথা? বরং সাধনার রাজ্যেই তো দাবি করব এমন অকাট্য উপলব্ধি যা ধোপে টেঁকে ; সাধকদের সাক্ষ্য ও চরিত্র সম্বন্ধেই তো আরো

বেশি সজাগ হ'তে হবে—এই সব কথা অসিত বলত যখন কমলা নানা সাধকদের দেখতে না দেখতে স্থুরু করত তাদের রকমারি জপতপ বিধিনিষেধের গুণগান। এখানে ছায়া ছিল অসিতের সঙ্গে পুরোপুরি একমত: যেমন, যখন অসিত বলত: "সত্যিকার সাধনা হ'ল ভিতরটার বদলের সাধনা। বাইরের আচার অনুষ্ঠানে পান থেকে চুণ খসলে ধনুষ্টংকার হওয়া—এসব হ'লেই যে সব সময়ে ভিতরটা বদলাবে এমন কোনো কথা নেই।"

কমলা বলত: "আন্তরিক ডাকলে ভগবান্ শুনবেনই—কাজেই বদলাবেই বদলাবে—নৈলে শুদ্ধি কথাটার মানে কি শুনি!'

ছায়া বলত: "আমি এসব বিষয়ে কিছু জানি না কমলাদি, কিন্তু তাহ'লে অসিদার সেই চাক্ষুষ-করা ঘটনাটির বিষয় তোমার রায় কী—বলবে? যদি তোমার কথা সত্যি হয় তবে একজন ভদ্রলোককে তিনি ওভাবে উঠিয়ে দিতে পারলেন কী ক'রে ধ্যানের জায়গা থেকে?"

ব্যাপারটা হয়েছিল এই। কমলা যখন গতবার আশ্রমে গিয়েছিল তখন একজন খ্যাতনামা সাধকের কৃচ্ছ্রসাধন দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়। বাস্তবিক মানুষটির ইচ্ছাশক্তির জোর ছিল খুবই। তিনি কারুর সঙ্গেই মিশতেন না—কথা বলতেন সাংঘাতিক আল-গোছে—কারুর সম্বন্ধে তাঁর এতটুকু ঔৎসুক্য কি স্নেহ-প্রীতির লেশও কদাচ কেউ চাক্ষুষ করে নি। অতি পবিত্র চরিত্র: কোনো মেয়ের দিকে কেউ তাঁকে তাকাতে পর্যন্ত দেখে নি—অধোবদন ও ভূমিনেত্র না হ'য়ে তিনি কদাচ চলতেন। কমলা

তাঁর দুরন্ত ঐকান্তিকতা দেখে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠত। অসিত কিন্তু সাড়া দিতে পারত না, সন্দিগ্ধস্বরে বলত: "উঁ হুঃ—the test must come—আসল যোগ তো বাহ্য আচরণের শুচিবাই নয়—অন্তরের রূপান্তর।" কমলা বিস্ফারিতনেত্রে বলত: "কিন্তু এখানে শুচিবাইয়ের প্রশ্ন ওঠে কী ক'রে? এরি নাম তো সাধনা—আর এত ক'রে যে-সাধক সাধনা করছেন তাঁর ভিতরটাও তো বদ্‌লাবেই বদ্‌লাবে।" অসিত বলত: "এ সব হ'ল ধ'রে নেওয়ার কথা, বিশ্বাসের কথা—যাকে বলে a priori: আমি চাই আগে দেখতে যে বদ্‌লেছে ভিতরটা—দেখতে চাই আত্মাভিমান সত্যি কমেছে"...ইত্যাদি। এ ধরণের কথায় ছায়া বলত হাততালি দিয়ে: "অসিদা, এবার তোমার কথা আমি একেবারে সব বুঝতে পারছি, স—ব—একেবারে জলের ম'ত।"

যাহোক এমন সময়ে একটা ঘটনা ঘটে—যাতে কমলা-যে-কমলা সে-ও একটু চম্‌কে ওঠে। যদিও মুখে কিছু বলে নি—তবু ওর সুকুমার সংস্কৃত মন যে খুব ঘা খেয়েছিল এটা অসিত টের পেয়েছিল। ব্যাপারটা এই: দিল্লি থেকে এল এক লেখক ও ভবঘুরে—চন্দনলাল। কত দেশই যে সে ঘুরেছে। গুরুদেবকে দেখে সে মুগ্ধ হয়। বলে যোগ তার না করলেই নয়। অসিতের সঙ্গে তার একদিনেই ভাব হ'য়ে যায়। চন্দনলাল বলে ওকে ওর জীবনের নানা গভীর বেদনার কথা, ব্যথ প্রেমের ইতিহাস, আরো কত কাহিনী। তার ধারণা হয়: মানুষকে সাধনা ক'রে আত্মশুদ্ধির পথ নিতেই হবে নইলে এসব দুঃখ কষ্টকে ডিঙিয়ে

কোনো শান্তিলোকে পৌঁছনো অসম্ভব। কিন্তু সে ভারি একটা আঘাত পেল আসতে না আসতে। হয়েছিল কি, সে-সময়ে ওরা সন্ধ্যাবেলা বসত একটা মস্ত চাতালে—চারদিকে গাছ, সুন্দর জায়গা। গুরুদেব এসে সেখানে ধ্যান করতেন। গুরুদেবের আদেশ ছিল স্থান কারুর মার্কামারা সম্পত্তি নয়—যে যেখানে জায়গা পাবে ব'সে যাবে ধ্যানে। সেদিন চন্দনলাল না জেনে বসেছে সেইখানে যেখানে সেই খ্যাতনামা পৃথ্বীনেত্র সাধকটি বসতেন। হঠাৎ ও চম্‌কে গেল যখন ওর ধ্যান ভাঙিয়ে সাধকটি আধ্যাত্মিক ভাষায় যা বললেন তার সাংসারিক তাৎপর্য: "এটি আমার জায়গা—স'রে পড়ুন।"

অসিত শুনে অত্যন্ত আহত হয়েছিল। কমলারও মুখচোখ কেমন যেন হ'য়ে গিয়েছিল যখন চন্দনলাল বলল একথা—কমলা অসিতের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল।

অসিত হেসে বলেছিল: "বন্ধুবর, আমি আমাদের এই সরল প্রাণা মাননীয়া সাধিকাটিকে এই কথাই বলি যে, বাইরের জাঁক-জমক আর ঠাট-ঠমক দেখে সাধনার হাঁড়ির খবর পাওয়া শক্ত।"

চন্দনলাল গভীর ভাবে অপমানিত বোধ করেছিল—না করাই আশ্চর্য। সে নবাগত—নিরভিমান নয়—তার ওপরে প্রকাশশীল মানুষ। বলেছিল: "সত্যি অসিত, আমার খুব শক্ লেগেছিল ভাবতে যে, যে-ধরণের কদর্য রূঢ়তা আমাদের মতন আত্মাভিমানীরাও করেন না সে ধরণের রূঢ়তা তাঁরা করতে পারেন—যাঁরা অনেক দিন ধ'রে সাধনা করছেন।"

কমলা মৃদু আপত্তি করেছিল: "কিন্তু সাধারণত যাকে রূঢ়তা বলা হয় যোগে তাকে ঠিক সেভাবে দেখা হয় না তো।"

অসিত বলেছিল: "মানি, কিন্তু আমি-একজন-কেওকেটা-নই এই মনোভাব থেকে যে-রূঢ়তার অভ্যুদয় তাকে কোন্ যোগে বলেছে—ওঁ আয়াহি বরদে দেবি? কমলা, মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকে এক জায়গায় ভীষ্ম বলেছেন মনে আছে—সেদিন তোমাকে প'ড়ে শোনাচ্ছিলাম?—

দ্ব্যক্ষরস্তু ভবেন্মৃত্যু-স্ত্র্যক্ষরং ব্রহ্ম শ্বাশতম্
মমেতি চ ভবেন্মৃত্যু ন মমেতি চ শাশ্বতম্।।

অর্থাৎ 'মম' এই দুটি অক্ষর হ'ল মৃত্যু, 'ন মম' এই তিনটি অক্ষর হ'ল শাশ্বত ব্রহ্ম। অমর কবির একটি বাউল গানে আছে সংসারীর উদ্দেশে তিরস্কার:

আমার ছেলে আমার মেয়ে আমার বাবা আমার মা
আমার পতি আমার পত্নী সঙ্গে তো কেউ যাবে না।

কিন্তু সংসারে যখন লোকে 'আমার আমার' করে তাদের স্বপক্ষে অন্তত এইটুকু ওকালতি করা চলে যে, তারা জানে না তাই ধরেছে অবোধ বুলি। কিন্তু বড় সাধকদের মুখে 'অপার অপার' টঙ্কার শোনার পর যদি তাঁদের আচরণে দেখি সেই একই 'আমার আমার' ঝঙ্কার—আর সেটা এই ধরণের তুচ্ছ জিনিস নিয়ে—তখন কি 'বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা'-র অবস্থা হয় না বলতে চাও? না, শোন কমলা। নিজের প্রতিভা বা গুণপনা নিয়ে অহংকার তবু খানিকটা ক্ষমনীয়—শুধু এই জন্যেই যে সেটা একটা কৃতিত্বের

অহঙ্কার—কাজেই তাকে জয় করা কঠিন—কিন্তু যদি দেখি আসক্তি স্থূল ছেড়ে এমন কি সূক্ষ্মের কোঠায়ও ওঠে নি—স্থূলই রয়েছে অথচ সে চিনতেও পারছে না তাকে স্থূল আসক্তি ব'লে—এমন কি ভাবছে অতিথিকে তার আসন থেকে উঠিয়ে দেওয়া তার সাধনার অঙ্গ—তখনো যদি অসহিষ্ণু হ'য়ে না উঠি তবে অসহিষ্ণু হব কোথায়?"

যাহোক চন্দনলালকে ও বুঝিয়েছিল পরে যে সাধনায় আত্মাভিমান অনেক সময়ে আরো উগ্র হ'য়ে ওঠে প্রথম দিকে।

চন্দনলাল বলেছিল: "কিন্তু ভাই, এ-সাধকটির তো শুনলাম বহুদিনের সাধনা ও উচ্চ অবস্থা।

অসিত মাথা হেঁট ক'রে চুপ হ'য়ে গেল। এর পর কী-ইবা বলবে?

এ-গল্প পরে ও করেছিল ছায়ার কাছে। ছায়া বলেছিল হেসে: "আহা বেচারি কমলাদি! কোনো কিছু চক্ চক্ করতে না করতে চমকে উঠেছে গিনি সোনা ব'লে। কিন্তু অসিদা, যাকে বড় বড় কথা শুনে সোনা ভেবে অনেকদিন ধ'রে গদ্‌গদ হ'য়ে পূজো আচচা ক'রে এসেছি তাকে যখন হঠাৎ একদিন দেখি শুধু যে লোহা তাই নয়—মরচে-পড়া, চক্‌চক্‌ও করে না—তখন একটু বেশিই বাজে। তোমাদের এ-সাধকটির অ-চক্‌চকে আচরণের কথা তাই আর বোলো না কমলাদিকে। বলে না—'কিসের ওপর খাঁড়ার ঘা!'

* * * *

* *

এধরণের টুকরো টুকরো স্মৃতি ওর আরো মনে পড়ে আজ। বিশেষ ছায়ার সঙ্গে সেদিন দীর্ঘ আলোচনার পরে। তখন থেকে ওর শরীর একটু ভালো হচ্ছিল যেন। তাই উভয়ের কথাবার্তা হ'ত—কখনো একান্তে কখনো বা কারুর কারুর সাম্‌নে। এ ঘটনাটাও ও বলেছিল ছায়াকে এই সময়ে। এর আগে সাধনা নিয়ে কথা তো বড় একটা হয় নি। এসময়ে কমলা থাকলে ও আরো জোর পেত কারণ বাইরে এসে ওর কমলাকে যেন আরো আপনার লোক মনে হ'ত—গুরুবোন ভেবে। বাইরে এসে এ-অভিজ্ঞতাটা বড় বিচিত্র কিন্তু। আশ্রমে যাদের সঙ্গে কথা কইতেও ইচ্ছা হয় না—এমন কি অনেক সময়ে রীতিমত অনিচ্ছা হয়—আশ্রমের বাইরে তাদের মনে হয় বহুপরিচিত। আর তখন টের পাওয়া যায়—(মানুষের মধ্যে অনেক সম্বন্ধ ভিতরে ভিতরে গ'ড়ে উঠতে থাকে যা সব সময়ে নিজেকে জানান দিতে চায় না।)

কমলার গুণগান করতে করতে একদিন ছায়াকে বলেছিল অসিত এই কথাটি। শুনে ছায়া বলেছিল খুসি হ'য়ে "কী সুন্দর কথা অসিদা! কিন্তু বললে বিশ্বাস করবে না যে আমার শিশুমনও এটা জানত খানিকটা: আমার কত সময়েই না মনে হয়েছে যে যাদের সঙ্গে হঠাৎ চেনা হ'ল তাদের সঙ্গে বহুদিনের চেনা ছিল আর কোথাও—কেবল যেখানে হয়েছিল দেখাশুনো তার নামটা গেছি ভুলে।"

* * * *

* *

সুদূর তানমার্গে আজ এই সব অতীতের স্মৃতিবিলাসের সময়ে কত কী যে ওর চোখে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে! সব উপলব্ধিই কিছু বিদ্যুতের মতন হঠাৎ ঝল্‌কিয়ে ওঠে না। অনেক জ্ঞানই আসে ধীরপদক্ষেপে—উষার আকাশে আলোর মতন: আঁধার ঠিক কোন্ মুহূর্তে কাট্‌ল বলা ভার—অথচ কাটার পরে বুঝতে বেগ পেতে হয় না যে, অন্ধকারের লীলাখেলা শেষ হয়েছে। কমলা ও ছায়ার সঙ্গে এই সব আলোচনা তর্কাতর্কি যখন হ'ত তখন ও বুঝতে পারত না কিসে কী হয়—কিন্তু আজ তো কই ধাঁধা মনে হয় না, তাই অনুতাপ আসে আরো নিবিড় হ'য়ে যে ছায়াকে কত সময়েই ভুল বুঝেছে অনিচ্ছায়ও বটে অথচ একটু ইচ্ছাও ছিল যেন তলে তলে। তাই ও বুঝেও বুঝতে চায়নি যে স্বভাব বদলানো চারটি খানি কথা নয়।

অনেকদিন বাদে হঠাৎ মনে প'ড়ে যায় এই প্রসঙ্গটি। তখন মনে হয়—এ-সাধকটিকেও খানিকটা কঠোর ভাবেই বিচার করা হয় নি কি? অসিত নিজের কথাই ভাবে। কতবারই তো ভেবেছে অসহিষ্ণু হবে না ছায়ার প্রতি—অথচ তবু বার বার করেছে তো সেই একই ভুল। একথা সত্য যে ও সর্বান্তঃকরণেই চেয়েছিল সহিষ্ণু হ'তে। কিন্তু আশৈশব যে অহঙ্কারী, অসহিষ্ণু—সে কেমন ক'রে দুচার বছরে পারবে এ-অসাধ্যসাধন করতে? তাই ছায়া তার স্বভাব বদলাতে চাইত না এটা স্বতঃসিদ্ধের মতন ধ'রে নিয়ে কেন ও নিজে দুঃখ পেত—আর, তারচেয়েও বড় কথা, ছায়াকে দুঃখ দিত? চাইলেই কি কেউ পারে স্বভাব বদলাতে? ঐ খ্যাত-

নামা সাধকটি হয়ত সত্যিই চেয়েছিলেন অতি-আচারের অত্যাচার থেকে মুক্তি—কিন্তু অন্ধ আচারী সংস্কার কি সহজে দেয় অব্যাহতি? চাওয়া পাওয়ার প্রথম ধাপ বটে কিন্তু যত বড় পাওয়া ধাপও কি সেই অনুপাতে সংখ্যায় না বেড়ে পারে?

কিন্তু তবু আসে বদল। ভিতরে ভিতরে রূপান্তরের ক্রিয়া চলছেই অহরহ একথা যেন আজ আরো স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে ওর চোখে। বিশেষ ক'রে বেদনার ভূমিকম্পে। সবচেয়ে ত্বরিত গতিতে বদল আনতে এর জুড়ি মেলা ভার। তাই কি জীবনে বেদনার এত জয়জয়কার?

মনে পড়ে এ নিয়েও কত তর্ক হয়েছে ওর ছায়ার সঙ্গে।

ছায়া খুব কমই বলত নিজের শোকের কথা। তবে কখনো কখনো প্রকাশ হ'য়ে পড়ত বৈকি—অসতর্ক মুহূর্তে। একদিনের কথা আজ ওর বেশি মনে পড়ে যেদিন ও হঠাৎ কেঁদে বলেছিল: "কেন রাজু মারা গেল অসিদা, আর আমি রইলাম বেঁচে?"

রাজু টাইফয়েডে মারা গিয়েছিল বড় যন্ত্রণায়। শেষ অবস্থায় বাক্‌রোধ হয় সজ্ঞানে: "সে-দৃশ্য দেখা যায় না অসিদা! ও কিছু বলতেও পারছে না কত চেষ্টা ক'রে হয়ত বেরুল 'মা'—তার পরেই চোখ জলে ভ'রে এল।"

অসিত বলেছিল: "থাক থাক একথা।"

ছায়া চোখ মুছে বলেছিল: "ভয় নেই অসিদা। ভিতরটা পোড় খেয়ে অনেক শক্ত হ'য়ে গেছে। রাগ কোরো না ভাই, করুণা ব'লে একটা কিছু আছে যতক্ষণ জানি ততক্ষণ কষ্টটা

বাজে বেশি। যখন জানি হাজার দুঃখ হোক কষ্ট হোক যন্ত্রণা হোক--রক্ষা করবার কেউ নেই—তখন আর লাগে না তত। যদিও—"

"কী" ?

"মনের ভিতরে কোথায় যেন হু হু করে।"

"কেন করে ভেবে দেখেছিস কি? যদি রক্ষা করবার কেউ কোথাও নেই তবে কেন বলি রক্ষা করো—কেন বলি—Abide with me ? মনে নেই সেদিনকার কথা ?"

ও কি বলতে গিয়ে থেমে যায়।

"কী বলছিলি ?" শুধায় অসিত।

"কি জানি।"

"বললেই বা। কেউ তো নেই ঘরে।"

ছায়া অসিতের চোখে চোখ রেখে বলে: "তোমার একটা কথা আমার সেদিন মনে খুব লেগেছিল।"

"কোন্ ?"

"সাধুরা যে জীবন যাপন করেন সেটা বড় জীবন। যতই দুঃখ পাই না কেন ভাই···নিরাশাকে যতই কেন না আঁকড়ে ধরি আশাকে আলেয়া নাম দিয়ে—তবু—কী যে একটা সুর বেজে ওঠে বুকের মধ্যে যাকে···কী বলব ?—বলতে হয় হাঁ-র সুর, কারণ অগুন্তি না-র পাশে সে একা দাঁড়িয়ে বটে—কিন্তু একাই একশো--নৈলে বেঁচে রইল কিসের জোরে ? তোমার মুখেই সেদিন শুনেছিলাম পরমহংসদেবের একটি উপমা মনে গিয়ে ছ্যাঁৎ ক'রে লাগল : হাজার বছরের অন্ধকারও এক মুহূর্তে চ'লে যায়—একটি

বাতি জ্বাললে : তাই হয়ত একটি হাঁ মহড়া নিতে পারে হাজারো না-র। অথচ তবু অসিদা, ভগবানকেও তো মেনে নিতে পারি নে। অথচ তবু—তবু—তবু—সার সার কতগুলো 'তবু' আসে ভিড় ক'রে এ-ও কি কম আশ্চর্য, বলো তো? যখন বলি ভগবান মিথ্যে তখনও কেন একটা আশ্বাস মতন পাই যে, অন্তত সাধু মহাত্মারা তো সত্য? যাকে ভালোবাসি সে সত্য না হ'লে ভালোবাসা কি সত্য হয় অসিদা?"

অসিত চমকে ওঠে, বলে: "আগে বল্ দেখি সাধু মহাত্মা বলতে কাদের কথা মনে হয়?"

ছায়া মুখ টিপে হেসে বলে: "জানি না—তবে অতিথিকে যাঁরা নিজের ধ্যানের আসন থেকে তাড়িয়ে দেন ভগবানকে গ্রেপ্তার করতে তাঁদের নয় এটুকু জানি।"

"অতটা বলতে নেই ছি! মানুষের আচরণে ভুলও তো হয়।"

ছায়া একটু ভাবে, বলে: "হয়। কিন্তু অসিদা! সত্যিই কি তুমি বলতে চাও এটা মাত্র একটা আচরণের ভুল? এক একটা আচরণ কি নেই···যা···কি বলব?—যা গোটা মনের ভঙ্গিকে দেখিয়ে দেয় চোখে আঙুল দিয়ে?"

অসিত অবাক হ'য়ে যায়: এ-ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে ঠিক এই কথাই যে ওর নিজেরো মনে হয়েছে। তাই না সাধকটির আচরণকে ক্ষমা করা সত্ত্বেও ও পারেনি কমলার মতন সহিষ্ণু, উদার ঢঙে দেখতে। বলতে কি, মানুষের ভুলও তো হয়" কথাটা বলেছিল প্রথম কমলাই, ও যেন ঈষৎ তিরস্কৃত হ'য়েই তার এ-কথাটা মেনে নিয়েছিল কারুর নিন্দা করার পরে আত্মগ্লানির মুহূর্তে।

কিন্তু তবু মেনে কি সত্যি নিয়েছিল?—ভাবে ও আজ। যেখানে অসুন্দর কিছু চোখে পড়ে সেখানে সত্যি কি যায় উদার হওয়া? খতিয়ে, এখানে টানাটানিটা মানুষের মূল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই নয় কি? যেমন ধরো যারা বলে জীবনের লক্ষ্য একলা থাকা, আর যারা বলে জীবনের লক্ষ্য সবার সাথী হওয়া—নিরালা সাধনা মানবজীবনের লক্ষ্য নয়, বড় জোড় কিছুদিনের জন্য সমর্থনীয় —এ-দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কি সত্যিকারের কোনো বড় মিল পারে গ'ড়ে উঠতে?

আজ ও বোঝে অনেকটা। কমলা ভুল বলে নি। ছায়ার সঙ্গে গভীরে ওর একটা মিল ছিলই। আর সেটা এই সবার সাথী হওয়া নিয়ে—উদারতা নিয়ে। মনে পড়ে ওর সেদিনকার গভীর অথচ শান্ত উচ্ছ্বাস: "তোমার পায়ের ধুলো নেব না তো নেব কার?"

এমন সুরে একথা ওকে কে বলেছে কবে? সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় আজ—কালের ব্যবধানের মধ্যে দিয়ে যেন ও আরো স্পষ্ট দেখতে পায়—যে ছায়ার অনুভব গহনসঞ্চারী ছিল ব'লেই এমন কথা ও বলতে পেরেছিল এত সহজে। তাই গভীরতার ছন্দ ঝ'রে পড়ত ওর গানে, পবিত্রতার আলো ফুটে উঠত ওর দৃষ্টিতে হাসিতে করস্পর্শে।

সেদিন অসিত ব্যথা পেত—না বুঝে। আজ ব্যথা পায়—না বুঝে ব্যথা পেয়ে ওকে কতবারই অকারণ ব্যথা দিয়েছে ব'লে। এ ও পারল কেমন ক'রে? যার অনুভব এমন গভীরস্পর্শী—আর সেই গভীরে যার সঙ্গে হয় ছোঁয়াছুঁয়ি তার সঙ্গে নাই বা থাকল

বাইরের মিল—কী যায় আসে? চলার ছন্দে যাদের মিল প্রতি-পদেই, করস্পর্শের তাদের কী দরকার। তাছাড়া সাধু মহাত্মাকে যে মানে ভগবানকে সে মানে না এ-ও কি সম্ভব? আসলে ভগবানকে ও মানে না তা নয়—ভগবানকে আপন বলতে পারে না বড় বেশি আপন ক'রেই চেয়েছিল ব'লে। নৈলে এ-গভীর অভিমানকে ও সযত্নে লালন করত কি? অসিত কত ক'রে বলেছিল—ভগবানকে সরল বিশ্বাসে ডাকলে তিনি ওর দেহকে নীরোগ করবেনই করবেন; এ-ভরসা দিয়েছিল—অন্তরে ভরসা দেবার তাগিদ পেয়েছিল ব'লে—কিন্তু কিছুতে ও রাজি হয় নি ভগবানকে ডাকতে। কেন? বিরুদ্ধতার মধ্যে দিয়েই স্মরণ আরো নিশ্ছিদ্র হ'য়ে ওঠে ব'লেই হয়ত—কে বলতে পারে? যারা সহজেই নত হয়, সহজেই গড় করে, সহজেই চলতি পূজার তন্ত্রমন্ত্র মেনে নেয় তারা কি সত্যি জানে হৃদয়ের পূজা কী বস্তু? অথচ এই পূজাই ছিল ওর কাছে সহজ। যাকেই ভালোবেসেছে ও বরণ ক'রে নিয়েছে শুধু ওর কমারী হৃদয়ের আশ্চর্য পবিত্রতা দিয়ে নয়—স্বভাবের নিরভিমানে। যখন কাউকে ও দিয়েছে ওর ভালোবাসার দান, স্নেহের দান, প্রীতির দান, কৃতজ্ঞতার দান, দিয়েছে সহজ সরল শ্রদ্ধায়—যাকে দিচ্ছে তার কথাই মনে ক'রে, যে দিচ্ছে তার কথা একেবারে ভুলে। এ-আত্মবিলোপ যে কতবড় কথা ভাবতে আজও অসিতের বুকের মধ্যে অশ্রুসাগর ওঠে দুলে।

* * * *

* *

আজ মনে পড়ে ওর শেষের দিনের কথা—যেদিন ও চ'লে এল···আসার সময়ে কত চেষ্টা করল ছায়া হাসতে অথচ হাসতে গিয়ে ফেলল কেঁদে। সেই বিকেল বেলা যখন এক ফালি রোদ পড়েছিল এসে ওর পায়ের কাছে—মনে পড়ে এখনো।

আর কী ভাবে হঠাৎ ঘটল আরো একটা যোগাযোগ—যেজন্যে ছায়া আরো মুগ্ধ হয়েছিল। মনে পড়ে শেষের দুতিন দিনের কথা। কতরকম আশ্চর্য ব্যাপারই যে ঘটে জীবনে!

ছবি ভেসে ওঠে ফের:

* * * *

* *

লক্ষ্ণৌয়ে প্রবীরের এক বন্ধু গিয়েছিল গান শিখতে। নাম প্রমথ। ছেলেটিকে ও চিনত না। শুনেছিল লক্ষ্ণৌয়ের নামকরা পাশকরা ওস্তাদ। ওর সব চেয়ে খারাপ লাগত এই অত্যাধুনিক পাশকরা বাঙালি ওস্তাদদের। বাংলা গানের ভক্তির গানের প্রতি এমন গভীর অবজ্ঞা খাঁটি হিন্দুস্থানি ওস্তাদদের মধ্যেও বিরল। বলে না সূর্যের আঁচ সয় কিন্তু বালির তাপ অসহ্য? কিন্তু প্রবীরের ওখানে ও একদিন যখন দীপ্তিকে শেখাচ্ছিল একটি কীর্তন—হঠাৎ প্রমথর আবির্ভাব। মুগ্ধ হয়ে গেল প্রমথ গানটি শুনে। ধরল: ওদের ওখানে একদিন গাইতেই হবে।

রাজি হ'তে হ'ল। কীর্তনের প্রশংসা করলে অসিত প্রসন্ন না হ'য়ে পারত না তার উপরে ও শতমুখে সুখ্যাতি করল ছায়ার গানের। বলল অমন প্রতিভা ও সুরেলা গলা কালে-ভদ্রে শোনা

যায়। "এর পরে অসিদা তোমাকে আর না বলবে কী ক'রে প্রমথ?" ব'লে প্রবীর একগাল হেসে উঠল। "ও শুধু তালিয়াৎ নয়—চালিয়াৎ-ও যে কাজেই ঠিক চালটি চেলেছে—ঝোপ্ বুঝে কোপ্," বলল দীপ্তি একটি সার্থক কটাক্ষ ক'রে।

প্রমথ ওকে নিয়ে গেল এক প্রকাণ্ড সভায়। মস্ত হল ঘর—লোক গম গম করছে। সেখানে গানের ইস্কুল হবে ও বিশেষ ক'রেই শেখানো হবে ভজন। টাকা দিচেছ্ন এক মাড়োয়ারি ক্রোরপতি—জয়মল শেঠ। শেঠজির সঙ্গে অসিতের আগে যথেষ্ট পরিচয় ছিল। তাঁর ওখানে সে গিয়েওছিল দুএকবার ভজন গাইতে। শেঠজি সত্যিই বিচলিত হ'য়ে উঠতেন ভজন শুনে। ওস্তাদি গান তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না কিন্তু ভজন গানে তাঁর চোখে বইত ধারা।

শেঠজির অনেক গুণ: শুধু আচারী নন—ধার্মিক। অসিত তাঁকে মনে মনে সত্যিই শ্রদ্ধা করত। নৈলে ও প্রমথদের গানের সভায় যেত না বিশেষ এই সময়ে যখন ছায়ার কাছ থেকে বিদায় নেবার দিন এসেছে ঘনিয়ে। তবে এসময়ে ডাক্তারেরাও বলল ছায়ার অবস্থা বেশ ভালোর দিকে—সত্যিই ওর জ্বর বেদনা হাঁপানি সবই কমছিল ধীরে ধীরে—ওদের আশা হয়েছিল, হায়রে, যে হয়ত এযাত্রা ছায়া বেঁচে যেতেও পারে।

ছায়াও বলল: "না গেলে ভারি দুঃখিত হব অসিদা। আমি তোমাকে আটকে রাখব যখন এতলোক চাইছে? ছি!" ওর মন একটু সবল হয়েছিল গান বিষয়ে। কাজেই অসিত গেল একটু

হাল্কা মন নিয়েই। ছায়াকে বলল ঘন্টা খানেকের মধ্যেই ফিরে আসবে।

সভায় শেঠজির সঙ্গে দেখা হবে ভেবে ও খুসিমনেই গিয়েছিল, কিন্তু শেঠজির সঙ্গে চারিচক্ষুর মিলন হ'তেই মনে হ'ল তিনি অনেকখানি দূরে স'রে গেছেন। অসিত জানত—শেঠজি চাইতেন না ওর আশ্রমবাস। তাঁর মত—অসিতের ফিরে গানের প্রচারে কীর্তন ভজনের দল গড়ায় লেগে যাওয়া উচিত—যা ওর কাজ। এই নিয়ে অসিতের সঙ্গে শেঠজির খানিকটা মনোমালিন্য মতনই হয়েছিল বৈকি। গাম্ভীর্যের ছায়া দেখলেও অসিতের মন বেঁকে বসত। কাজেই শেঠজির সঙ্গে দায়ে-সারা গোছের একটা করমর্দন নির্বাহ ক'রে ও বসল চেয়ারে শেঠজির ডবল গম্ভীর হ'য়ে।

সভাপতি ছিলেন ওর এক বাল্যবন্ধু—পরম সুদর্শন সুরসিক ভূতপূর্ব মহারাজকমার এখন সাক্ষাৎ গদিয়ান শ্রীল শ্রীযুক্ত বরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী কে সি এস আই—ব্রাহ্মণসভার প্রেসিডেণ্ট, হিন্দুমহাসভার একজন সেরা পাণ্ডা, বাংলার গাতসভার গন্ধর্বকুমার ইত্যাদি ইত্যাদি।

এরকম বড় আভিজাত্য সে কমই দেখেছে। যেমন তেজস্বী তেম্‌নি বদান্য : "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূণি কুসুমাদপি" যাকে বলে।

কিন্তু বরেন্দ্রের দোষ—সে-ও আভিজাত্যের দোষ, নিরুপায়—জীবনে কোনোদিন কোনো সভায় সে সময়ে আসে নি, আসবে না, আসতে পারে না—ও ভাবাই যায় না।

অসিত ভারি অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠল। ওদিকে ছায়া অপেক্ষা করছে—দুদিন বাদেই সে যাবে আশ্রমে ফিরে—গুরুদেবের জন্মোৎসব,

না ফিরলেই নয়। কাজেই ও চায় এখন যতটা পারে ছায়ার কাছে কাছেই থাকতে। তাছাড়া দুএকটা অবশ্য-কর্তব্য আছে। দীপ্তি গ্রামোফোনে ওর শেখানো চারটি গান দেবে—সেগুলি গড়া হ'য়েছে, কিন্তু পালিশ দেওয়া বাকি। এরকম আরো কয়েকটা খুচরো কাজ হাতে—কোনোটা তৃপ্তিদায়ক, কোনোটা বা বিরক্তিজনক, যথা দুএকটা দেখাশুনা। কাজেই ও আর পারল না—উঠল। শেঠজি একবার ওকে ব'লে পাঠালেন—একটা গান করতে। অসিত বলে পাঠালো : না। মন ওর দারুণ বেঁকে বসেছে। অথচ ও জানে শেঠজি সত্যিই চান ওর গান শুনতে। কিন্তু অভিমানী তো। আশ্রমে ও কেন গেল—এ-প্রশ্ন করবার কী অধিকার ওঁর? বাইরে যারা লাঠালাঠি করে না তারা ক্ষতিপূরণ চায় অন্তরের রিহার্সালে মাথা-ফাটাফাটি বাধিয়ে।

একটা আক্ষেপ জাগে শুধু: বরেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হ'তে হ'তে হ'ল না। কী আর করা যাবে?—ছায়া পথ চেয়ে রয়েছে —একঘণ্টা হ'তে চলল। ও উঠে পড়ল রুখে।

কিন্তু যেই নিচে গিয়ে মোটরে উঠতে যাবে—মহা শোরগোল : "মহারাজ—মহারাজ!"

প্রকাণ্ড ঝালর-দোলানো নিশান-ওড়ান ডেমলার থেকে নামলেন মহারাজ সাঙ্গপাঙ্গ সমেত। অসিত দোমনা হ'য়ে ভাবছে যঃ পলায়তি স জীবতি কিনা—এমন সময়ে মহারাজের সঙ্গে হঠাৎ চারিচক্ষের মিলন।

"আরে! কে ও? অসিতবাবু না? " ব'লেই ওর কাছে দ্রুত পদে এসে কটিবেষ্টন ক'রে :

"বলি, চক্ষু কেন পথপানে চেয়ে? যাবেন? কোথায় শুনি?—সেটি হচ্ছে না—ইয়ে ক'রে—অন্তত একটি গান না শুনিয়ে। মশয়, ভাবুন দেখি—ইয়ে ক'রে—কত দিন কতরাত শুনি নি ভবদীয় সঙ্গীত! ট্রাজিক মশয়, স্রেফ ট্র্যাজিক যাকে বলে ম্লেচ্ছ-ভাষায়। কুলীন ব্রাহ্মণকে, ইয়ে ক'রে, কোথায় সংস্কৃত কমেডির রস পরিবেষণ করবেন, না শেষটায় কি না—ইয়ে ক'রে—এই গ্রীক ট্র্যাজিডির ব্যবস্থা? তবে আপনার বিরহ অসিতবাবু—ইয়ে করে—"(চোখ ঈষৎ বুঁজে) "বিনিশ্চেতুং ন শক্যে সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা। কী? অপেক্ষা ক'রে আছে? আরে মশয়, দিন-দুনিয়ায় কে কার, অপেক্ষা করে? চলচিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্‌জীবনযৌবনম্‌—চলাচলমিদং সর্বং কীর্তির্যস্য স জীবতি। তাই আপনার কাজ অজ্ঞাত-বাস নয় মশয়—জগতে এই—ইয়ে ক'রে—কীর্তি রেখে যাওয়া। সত্যিই তো, 'ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয় মিছে ফেরো ভূমণ্ডলে—' আপনিই গাইতেন না? কী? ওটা গাইবেন না? আচ্ছা ওটা না গান—সেই, ইয়ে ক'রে, সুরফাঁকটা?—কী খাসা তাল আপনার! কী? আপনি, ইয়ে ক'রে, তালিয়াৎ নন? যত সব চালিয়াতের স্ক্যাণ্ডাল! ভালো কাকে বলে, ইয়ে ক'রে, জানে কি এই সব পত্নীভ্রাতার দল! ভালো মানে কী? রক্তে যা, ইয়ে ক'রে, দোলা দেয় ঘুরে ঘুরে চাকার মতন একই period এ—না-ই বা মানলেন আপনি ফাঁক সোম। ওদের কথাও আবার নাকি কেউ কানে তোলে যোগী-তপস্বী হ'য়ে! আরে, আমরাই যে ভুলি না? হোঃ হোঃ হোঃ—রাজা! আরে মশয়, রাজা তো এযুগে খাজা—

রাজা কলি যুগে খাজা
হাড় হ'ল ভাজা ভাজা--

বলতেন আমার ঠাকুর! এখন রাজা প্রজা সব কালের স্থূল-হস্তাবলেপে মুছে গিয়ে ধরেছে একতাল, ইয়ে ক'রে. গজার রূপ। কোথায় আজ সেই দুর্দান্ত সে-ল্ জেলাসি—না না,হেল সেলাসি বুঝি? থ্যাংকিউ ফর্ দি করেক্‌শন প্রমথবাবু। কিন্তু মশয়, এ শুধু জেলাসিরই যুগ তাই ঐ কথাটাই, ইয়ে ক'রে কেবল কেবল তড়পে ওঠে জিভের ডগায়। সবাই জেলাস্ মশয়, স-ব জেলাস্। আপনাকে আমাকে বুর্জোয়া ওরফে ধম্মের ষাঁড় ব'লে দেগে দিয়ে পাড়ু করবে যারা—ভেবেছেন না কি তারা—সেই সব প্রলেটারিয়েটরা কমিসারিয়েট হ'লে জীবের দানাপানি বাড়বে—না ভবযন্ত্রণা কমবে? শুধুই হাতবদল মশয়, হাতবদল।—জানি নে কি আর? জানি সবই—নিমতলাও চিনি কাশামিত্তিরের ঘাটও চিনি রে ভাই কেবল গণকের গণনায় মরে আছি বৈ তো নয়—বলেছিল না সেই মাতাল হোঃ হোঃ হোঃ। দেখছেন তো গানের কী হ'তে চলল এই সব ভ্যাণ্ডালদের স্ক্যাণ্ডালে? ভালো গান, জলসা, ধ্রুপদ খেয়াল ভজন কীর্তন সব গেল উঠে, রইল কেবল, ইয়ে ক'রে, ঠুংরি—

পিউ কঁহা পিউ
মিউ মিউ মিউ

ছোঃ। ভালো গাইতে পারে এমন মেয়ে কি একটি দেখতে পান ঐ সব মৃদুলা দোদুলা চটুলাদের মধ্যে?—কেবল হ্যাঁ—ঐ একটি মেয়ের গলা শুনেছিলাম সেদিন—চন্দ্রাবাইয়ের আসরে—কুমার

বাহাদুরের বাড়ি। আমি ছিলাম বলে নি সে? তা বলবে কেন? সে হ'ল পরম বোষ্টম—আমাদের মতন, ইয়ে ক'রে, চরম নষ্টম্রদের নাম উচ্চারণ করলেও তাদের যেতে হবে-যে রৌরব নরকে। কিন্তু (অসিতের পিঠে দিলাশা দিয়ে) সাবাস মরদ! শিষ্যাকে শিখিয়েছেন বটে। কী মালকোষই গাইলো মেয়েটা—তারপর কীর্তন। হ্যাঁ একে বলি গান। আমি তো শুনে টি-এইচ-এ-ডবিল্উ "থ" যাকে বলে মশয়, সিম্‌প্লি—হাঁ—gaping—(একান্তে টেনে নিয়ে) বড় কষ্ট হ'ল শুনে। এমন শক্ত অসুখ হ'ল কোত্থেকে বলুন দেখি? আহা, অমন গলা! গলা তো নয় যেন, ইয়ে ক'রে, বাঁশির সঙ্গে বাজছে বীণা রে ভাই বীণা! গাইল মেয়েটা তালফের—দুধারে দুটো দেড়ে সারঙ্গি—কিন্তু একটু কি গলা, ইয়ে ক'রে, বেচাল হোলো? এমন গান বুঝব না? কী বলেন মশয়? বেঁড়ে ব'লে কি আর কুকুর নই?—হোঃ হোঃ হোঃ। (সুর নামিয়ে) হয়েছে কি জানেন অসিতবাবু? সত্যিকার গানকে এই সব টকি রেডিওর দল চালান দিয়েছে পুলিপোলাও। কী? কন্‌ফারেন্স? বলবেন না মশয়, বলবেন না। রগচটা মানুষ আমি কী বলতে কী ব'লে বসব আর ওরা সব রৈ রৈ ক'রে উঠবে বুর্জোয়া বুর্জোয়া ব'লে—তখন আর, ইয়ে ক'রে, মুখে রা-টি থাকবে না। এ সব বুলির সামনে কি, ইয়ে ক'রে, দাঁড়াতে পারে মশয় আপনার আমার মতন মুখচোরা মনিষ্যি? তাই না আপনি হ'লেন দেশান্তর। কেবল অসিতবাবু, সত্যি বলছি আপনার এই যে মনের দুঃখে বনে যাওয়া এর ফলে লিটার‍্যালি, 'রইল না আর কেউ।'

আপনিই ছিলেন the last of the Romans : তারপর থেকেই হ'ল এই, ইয়ে ক'রে, কন্‌ফারেন্সের দুর্ভোগ। দুর্ভোগ ছাড়া কী বলব? কারণ এ সব জায়গায় যেতে হয় তো আমাকেই। কিন্তু মশয়, বলুন তো বুকে হাত দিয়ে: কন্‌ফারেন্সে কখনো সত্যি গান হয়? বলে না, ইয়ে ক'রে, 'ঘ'ষে মেজে রূপ আর ধ'রে বেঁধে যৌবন?' সত্যিকার গান হ'ল শ্রোতার আর গুণীর মালা-বদল: আতর মেখে ব'সে শুনছে—দিলখোস, তান ছেড়ে গাইছে মন্ খুস, আর মিটছে জীবনের আপশোষ। তা না—যত সব টাইম-লিমিট, নামধামহাঁকা, প্রোগ্রাম, মেডাল দিলেন খাঁ বাহাদুর, ধুম-ধড়াক্কা সিং, পায়াভারি চৌবে, এতে কি গান হয়? হ্যাঁ বাপের বেটা হোস তো দে দেখি গলা থেকে মোতির মালা খুলে—যা ইয়ে ক'রে আমার সত্যি সেদিন দিতে ইচ্ছে হয়েছিল মশয়—মোতি না থাকা সত্ত্বেও—ঐ আপনার ছাত্রীটিকে—কী নাম বললেন? ছায়া! আহা! নামটি শুনেই মন গলে—সত্যি বলছি। কী একটা মায়া যে আছে মেয়েটির মুখখানিতে মাখানো! আমার, ইয়ে ক'রে, কেবল মনে হচ্ছিল তার গান শুনতে শুনতে রবি ঠাকুরের সেই 'তুমি কেমন ক'রে গান করো যে গুণী'! সত্যিই 'অবাক হ'য়ে' শুনেছিলাম সেদিন—তামাতুলসীগঙ্গাজল ছুঁয়ে বলতে পারি। আর মনে পড়ে এখনো শেঠজির আসরে আপনার সেই 'মেরে তো গিরধর গোপাল'। কেঁদে কি রকম ভাসিয়ে দিল ও মনে আছে আপনার। তা, ইয়ে ক'রে, ও হ'ল খাঁটি ভক্ত, জাত সাপ, কাঁদবেই তো মশয়—আমি যে আমি, না ধারি ধার

বেম্মার না কেষ্টর—যদিও (ফিশফিশ ক'রে) মানি যা তা ঐ, ইয়ে ক'রে, শ্রীরাধে ঠাকুরুণকে—জানেনই তো—আপনি না জানলে জানবে কে বলুন—বলেনা সাপের হাঁচি, ইয়ে ক'রে, বেদেয় চেনে? —কী বলছিলাম? ও হ্যাঁ, এহেন আমি সেদিন আপনার ঐ শেষের দিকে অঁসুঅনজল সীঁচ সীঁচ শুনে—একেবারে বললে না পেত্ত্যয় যাবেন মশয় এই (বুকে হাত দিয়ে) এইখানকার শক্ত পাঁজরাগুলো যেন হ'য়ে গেল ঝাঁঝরা স্রেফ্ তুলতুলে ঝাঁঝরা—পাছে বুকভাঙা হ'য়ে ভেস্তে যাই শুধু সেই ভয়েই আরো যেন, ইয়ে ক'রে, বুক ফুলিয়ে রইলাম—হোঃ হোঃ হোঃ। হ্যাঁ হ্যাঁ প্রমথ বাবু—যাচ্ছি যাচ্ছি। আহা কদ্দিন পরে দেখা হ'ল এই ঠাকুরটির সঙ্গে—দুটো বলব না, ইয়ে ক'রে, প্রাণের কথা? (সুর করে):

মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা

দরদী নৈলে প্রাণ বাঁচে না।

না চলুন যাই এবার ওপরে। আপনার কথা একটাও শোনা হ'ল না। তা হবে এখন গানের সভায়। এখানে তো আর ঐ বার্বারাস্ টাইম-লিমিটেড নেই। আর আপনি তো হচ্ছেন A liver in eternity—না না সে লিভার নয়—যা আমাদের খারাপ হয়—আপনার তো ও বালাই নেই। এ হ'ল one who lives—সেই লিভার হো: হোঃ হোঃ—চলুন এবার সাধ মিটিয়ে দুটো গান শুনি। কী? গাইবেন না আজ? মশয়, কত্তা গাইতেন রঙ চড়িয়ে মনে পড়ে সেই (অসিতের চিবুক ধ'রে গুনগুনিয়ে কীর্তন): বন্ধু, তুমি

মণি নও মাণিক নও যে আঁচলে বাধিলে রও
ফুল নও যে কেশে পরি হায় !
(তোমায় যদি) বোষ্টম না করিত বিধি তোমা হেন রূপনিধি
ল'য়ে ফিরতাম কে জানে কোথায় ?

হোঃ হোঃ হোঃ। তা চটান কেন ? নৈলে কি আর, ইয়ে ক'রে, গাল মন্দ করি ? যেমনটি চাই তেমন পেলে আমি তো সেরেফ্ গঙ্গা-জল মশয়, গঙ্গাজল। গান শোনান্ ব্যস দেখবেন সেরেফ (সুর ক'রে)

(যদি)অগুরু চন্দন হইতাম তুয়া ত্বকে মাখা রইতাম
ঘামিলে ঝরিতাম রাঙা পায়—বঁধুহে !

কী ? সময় নেই—এসব বেসুরো কথা সাজে কি আপনার মুখে ? গাইবেন না ? বিলক্ষণ ! এ কি মগের মুল্লুক না কি মশয় ? ভেবেছেন কী বলুন তো ? আশ্রমে গাঢাকা হ'য়ে রয়েছেন তাই। নৈলে কী হালটা করতাম দেখতেন—আপনার দুঃখে শেয়াল কুকুররাও কাঁদত—গলায়, ইয়ে ক'রে, শিবের অসাধ্য ব্যাধি তুলে তবে দিতাম ছেড়ে চ'রে খেতে। তারপর অবিশ্যি এসে বলতাম—আহা কী ভক্তি অসিতবাবুর—ক্যান্সারেও কি না গাইছেন :

আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছ গর্ব করিতে চূর !

না না ঠাট্টা নয় অসিতবাবু ! সত্যি, আমাদের ওখানে আসছেন কবে ? মোটর পাঠিয়ে দেব। একদিন পায়ের ধুলো দিতেই হবে। ধুলো বলে ধুলো মশয় ! যতই পাষণ্ড হই—একেবারে তো, ইয়ে ক'রে, গোল্লায়-যাওয়া বেল্লিক নই। জানি তো আপনি ইচ্ছে করলে —কী হ'তে পারতেন। এই সব ওস্তাদরা যারা আপনাকে গালমন্দ করছে

থাকত সব সমবেত হ'য়ে ইয়ে ক'রে, ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে শুধু ভবাদৃশ যুযুদের উৎসব দেখতে। কিন্তু সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে যে লোক এককথায় হয় উদাসী মশয়—"

অসিত আর পারল না—"কী করেন ?" ব'লেই নিল প্রমথর সঙ্গ—"চলো প্রমথ" ব'লে। সে বেচারি মহামুস্কিলে পড়েছিল—কাছাকাছি ঘুরছিল—রাজাবাহাদুর রগচটা লোক, কিন্তু উপায় কি ? ওদিকে শেঠজিও লোক পাঠিয়েছেন দুবার—আর চলে না। অসিত তার শরণ নিতে ভরসা পেয়ে ভয়ে ভয়ে বলল : "রাজা বাহাদুর, এবার দয়া ক'রে ওপরে গা তুলতে আজ্ঞা হবে কি ? শেঠজি ব'লে পাঠাচ্ছেন—"

"কে ? শেঠজি ? ও হ্যাঁ হ্যাঁ। তা তাঁকে আমি ঠাণ্ডা ক'রে দেব। একটু অপেক্ষা করুক না—আরো দুএকটা কথা আছে ওঁর সঙ্গে—"

অসিত : না না—মানে—

রাজাবাহাদুর চোখ কপালে তুলে বললেন : "Thou too Brutus—তবে আর উপায় নেই। চলুন। কিন্তু আমার ওখানে একদিন—"

প্রমথ : সে আমি নিয়ে যাব রাজাবাহাদুর—চলুন অসিতদা—রাজাবাহাদুর—মাপ করবেন—কিন্তু আর দেরি করলে—

* * * *

* *

সভায় ওদের একত্র আসতে দেখে একটা আনন্দগুঞ্জন ব'য়ে গেল। দেরি হ'য়ে গিয়েছিল সত্যিই। সবাই উশখুশ করছিল। শেঠজিকে একটি গায়ক অম্লানবদনে নির্জলা মিথ্যে পরিবেষণ করছিল : "এই এলেন বলে—রাজাবাহাদুর খবর পাঠিয়েছেন—"ইত্যাদি।

ওদের দেখেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। করমর্দন-পর্ব সমাপন হ'তেই শেঠজি অসিতকে একটি ভজন গাইতে অনুরোধ করলেন। অসিত লক্ষ্য করল শেঠজি অত্যন্ত মোলায়েম ভাষাতেই ওকে অনুরোধ করলেন। ওর তাপ জল হ'য়ে গেল মুহূর্তে। ও গাইল একটি সুফি ভজন:

হম ঐসে দেশকে বাসী হৈঁ
জহাঁ শোক নহী ঔর আহ নহীঁ
জহাঁ মোহ নহীঁ ঔর তাপ নহীঁ
জহাঁ ভরম নহীঁ ঔর চাহ নহীঁ

ও গান ধরতেই সভাপতির চেয়ার ছেড়ে মহারাজ ধরলেন তব্‌লা। সভায় সে কী আনন্দ—সভাপতির সপ্রতিভ বেচালে। রাজা হ'লে কি হয়, হাত খাসা—গান জ'মে গেল দেখতে দেখতে।

অসিত লক্ষ্য করল শেঠজির কঠিন মুখ কোমল হ'য়ে এসেছে। গান শেষ হ'তেই তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন ও সমবেত হাততালির মধ্যে ওর গলায় পরিয়ে দিলেন নিজের গলার ফুলের মালাটি। তারপর বললেন করজোড়ে: "একবার আমার ওখানে পায়ের ধুলো—"

অসিত আর্দ্র কণ্ঠে বলল: "সে কি কথা শেঠজি—যাব বৈকি!"

"কবে? মোটর যাবে অবশ্য।"

"কাল ছাড়া আর সময় কই?"

"বেশ। কখন?"

"সন্ধ্যাবেলা ছাড়া আর কখন?"

"বেশ। সাড়ে সাতটা?"

"আচ্ছা।"

বরেন্দ্রকে ছেঁকে ধরেছিল আর একদল লোক। অসিত ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এল ছায়ার গাড়িতেই।

* * * *

* *

শুনে চঞ্চল তো আর নেই! অসিতের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলল: "কাল সন্ধ্যায় শেঠজির ওখানে তোমার গান কী দাদা! এমন কথা কোনোদিন শুনেছে কোনো মনিষ্যি?"

অসিত: কেন? কী হয়েছে?

নন্দাও অবাক: "কী হয়েছে? এইমাত্র যে অজয়বাবু ওঁর তব্‌লাটা নিয়ে গেলেন, বললেন ছায়ারটা সুরে ভালো বলছে না!

অসিত (মাথায় হাত দিয়ে): ও হো। তাই তো!"

চঞ্চল (হেসে) নন্দা বলবে: তাইতো

ভাসুর আমার সে-ভাসুর আর নাই তো!

অসিত (হেসে): যা যা শীগ্‌গির। শেঠজিকে টেলিফোন কর্‌ এক্ষুনি—না এক্ষুনি—কোনো কথা নয় আর—বল্‌ (থেমে) কিন্তু কবেই বা গাই ছাই? পরশু—হ্যাঁ পরশু—সকালে—ব'লে আয়। (চিন্তিত) পরশুই যে রাতে ট্রেন—কিন্তু কী আর হবে?—কথা যখন দিয়েছি—

"দেখ দেখি কাণ্ড!" ব'লে গজ গজ করতে করতে চঞ্চল দ্রুতপদে নেমে গেল নিচে।

নন্দা হেসে বলল: "কী যে করেন দাদা—যে কেউ ধরলেই হ্যাঁ ব'লে বসবেন?"

অসিত: কী করি বলো—বয়সের দোষ, স্মৃতিশক্তি—

"জ্যাঠামণি, দেখ কে এসেছে! মালক্ষ্মী!" ব'লে তারস্বরে চেঁচিয়ে নন্দীর প্রবেশ।

মালক্ষ্মী এসে গড় হ'য়ে অসিতকে প্রণাম করল।

"এসো এসো মা," ব'লে আদর ক'রে ওর কণ্ঠবেষ্টন ক'রে অসিত বলল: "কবে এলে?"

"এইমাত্র মামা!"

দিন পনের হ'ল ও গিয়েছিল বিন্ধ্যাচলে ওর গুরুর ওখানে। মালক্ষ্মীর নাম শ্যামলী। চক্রধরের বৌ—কাজেই অসিতের ভাগনে বৌ।

অসিত ওদের ওখানে বালগোপালের বিগ্রহের সামনে যখন গান করত ও শুনত মুগ্ধ হ'য়ে। দিন পনের আগে হঠাৎ ওর গুরুর বিন্ধ্যাচলে আসার খবর পেয়ে গিয়েছিল সেখানে—না গেলে নয় বলে। কারণ অসিত ওদের ওখানে রোজ যেত—এসময়ে ওর কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার আদৌ ইচ্ছে ছিল না। অসিতও ওকে অত্যন্ত ভালোবাসত। "এমন লক্ষ্মী ভক্তিমতী মেয়ে দেখা যায় না এ-কলিযুগে" বলত ও প্রায়ই চক্রধরকে শান্ত করতে। চক্রধর ছিল রগচটা মানুষ—প্রায়ই কথা বলতে বলতে রেগে উঠত—রাম শ্যাম যদু হরিকে লক্ষ্য ক'রে হানত ওর কথার মুষ্ট্যাঘাত।

মুষ্ট্যাঘাতের একটু ইতিহাস আছে। চক্রধর একে রাগী তার উপর কলেজে পড়বার সময় মুষ্টিযুদ্ধ শিখেছিল। প্রতি কম্পিটিশনে

হ'ত ফার্স্ট। ওর রাগের রসদ জোগাত ওর সাংঘাতিক মুষ্টি। চঞ্চল ঠাট্টা ক'রে বলত: চক্রধরের জপমন্ত্র—'হাত থাকতে মুখোমুখি কেন?' সত্যি, মুষ্টি-যোগ ছিল চক্রধরের কাছে সন্দেশ পরিবেষণের চেয়েও সোজা। আর এ-পরিবেষণে ওর বাছবিচার ছিল না। সাহেব সাহেবই সই। একটি বড়বাবু ও দুটি ছোট সাহেব ওর ঘুঁষি খেয়ে শয্যা নিয়েছে মাত্র গত দুবছরের মধ্যে। সবশুদ্ধ ও সাতটি চাকরি ছেড়েছে গত চার বছরে, তার মধ্যে পাঁচটি ওর দুর্দান্ত ঘুঁষির জন্যে। শ্যামলী তো ভয়ে তটস্থ—পতি-দেবতা কখন কোথায় কী কাণ্ড ক'রে বসেন। চক্রধরের কোনো দিন বাড়ি ফিরতে একটু রাত হ'লে শ্যামলীর বুক কাঁপত—বুঝি আর এক দুর্ভাগা শয্যা নিল গো! কিন্তু শুধু ভয়ই নয়, ঘুঁষির কর্মফলে যখন চক্রধরের থেকে থেকে হয় বেকার অবস্থা তখন সংসার চালাতে হয় তো ওকেই দুদুটি ছেলে মেয়ে নিয়ে। কিন্তু হাজার অনশন অনটনেও ওর মুখে প্রসন্নতার স্নিগ্ধ দীপ্তিখানি কেউ নিভতে দেখে নি কোনোদিন। আর কী সুন্দর মুখখানি! মালক্ষ্মী ব'লে ডাকতেও সুখ। শামলা রঙ এই যা। কিন্তু ওর স্বভাবের সঙ্গে যেন সবচেয়ে ঐ রঙই মানায়। অসিতের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকখানি বদলে গিয়েছিল ছায়াকে দেখে অবধি। বিলেত যাবার সময়ে ওর সব চেয়ে প্রিয় ছিল গৌরবরণ। কিন্তু ছায়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হ'তে হ'তে ক্রমশ ওর চোখ যেন এক নতুন আভার হদিশ পেল। তবু অনেকদিনের সংস্কার তো—তাই প্রথম প্রথম ওর মনে হ'ত ছায়া কেন গৌরী হ'ল না? কিন্তু দুদিন যেতে না যেতে ওর

মন স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে যেন বলত: ভাগ্যে ছায়া গৌরী হয় নি।

ঠিক্ এম্‌নি শুভ যোগে শ্যামলী প'ড়ে যায় ওর চোখে। নৈলে অসিত এত সহজে ওর সৌন্দর্য সম্বন্ধে সচেতন হ'ত কি না সন্দেহ।

ওদের ওখানে দুএকবার যেতে না যেতেই শ্যামলীর মধ্যে আরো একটা অসামান্যতা ওর চোখে পড়ল। হিন্দুমেয়েদের দেবভক্তি দেখা যায়—কিন্তু শ্যামলীর ভক্তির মধ্যে মামুলিয়ানা ছিল না: না আচার নিয়ে কোন অত্যুক্তি, মাতামাতি, আড়ষ্টতা। তবে ওর ভক্তি এভাবে সহজ হ'য়ে উঠেছিল একটি বিশেষ কারণে। সেটি আর কিছুই নয়—সেই অপূর্ব শুভ্র বালগোপালের বিগ্রহ। ছোট্ট ঠাকুর: হাতে বাঁশি, পাশে ধেনু। শাদা পাথরের মূর্তি—অপরূপ। কোনো প্রতিমার যে এত রূপ হ'তে পারে চোখে না দেখলে অসিত কখনই অনুমান করতে পারত না। গড়পড়তা অসুন্দর প্রতিমা দেখলে ওর মনে ভক্তির উদয় হ'ত না, কিন্তু আশ্চর্য, এই বিগ্রহটির কাছে গড় করতে না করতে ওর বুকের মধ্যে যেন আবেগের জোয়ার উঠত জেগে। ছায়াদের বাড়ি থেকে চক্রধরদের বাড়ি কাছেই। কাজেই একটু ফুর্সৎ পেলেই অসিত ওদের ঠাকুর-ঘরে গিয়ে কখনো গাইত, কখনো লিখত, কখনো বা বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্প করত। সুবিধে হয়েছিল এই যে, ঘরটা ঠাকুরঘর হ'লেও শ্যামলীদের শোওয়ার ঘরও ছিল ঐ, খাওয়ার ঘরও। চক্রধরেরও ভক্তি ছিল অন্তরপন্থী। তাই সে বুঝতে পেরেছিল এত সহজে—যেকথা সে প্রায়ই বলত: "ঠাকুরকে রাখব আলাদা—

কুলুঙ্গিতে একঘরে ক'রে ?" বলতে না বলতে রুখে উঠে : "কক্ষনো না। খাই শুই যে-ঘরে সে-ঘরে তিনি থাকলে তবেই না ঘনিষ্ঠতা। যাকে আলাদা ক'রে দূরে রাখি—তাকে সমীহ করি, ভালোবাসি না।" বলতে বলতে ওর হাতের মুঠো শক্ত হ'য়ে আসত। আত্মীয় স্বজন পেছিয়ে গিয়ে বলত : "তা বটেই তো, তা বটেই তো।"

অসিত কিন্তু ভারি খুসি হ'য়ে উঠত। বলতে কি, চক্রধর আর শ্যামলীর সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা গ'ড়ে উঠেছিল প্রধানত এই অনাচারী ভক্তিরই রাখীবন্ধনে।

ওদের ওখানে গিয়ে অসিতের বড় ভালো লাগল বিগ্রহের পীতবাস। সেই থেকেই আসে ওর পীতবাস পরার ঝোঁক। মালক্ষ্মী খুসি হ'য়ে মামার পীতবাস দিত রঙিয়ে। বলত :"এইই তো ভালো মামা ! গেরুয়ায় কেমন যেন কৃচ্ছ্রসাধনের আমেজ আছে—পীতবাসে আছে দোললীলা হোলিখেলা—আহা গান না মামা ঐ গানটা

"কট পীতাম্বর অঙ্গে সোহে
চিত্তাভূষণ জগমন মোহে—"

অসিত মুগ্ধ হ'ত ওর সহজ ভক্তিতে—যদিও বলত প্রায়ই : "মালক্ষ্মী তুমি অ—ত স্বল্পভাষিণী না হ'লেও ভাগবত অশুদ্ধ হ'ত না হয়ত।" কিন্তু অসিত ওর ওখানে এলে ওর আনন্দ ওর মুখে প্রকাশ না-ই হ'ল—চোখে ফুটে উঠত না কি ! অসিত যখনই যাবে ওদের বাড়ি—ওরা যুগলে প্রণাম করবেই করবে। অসিতের আপত্তি কানেও তুলবে না। এই নিয়ে তর্কাতর্কি হ'ত প্রায়ই। অসিত স্নেহ নিতে রাজি কিন্তু ভক্তি নিতে কুণ্ঠিত। সে নিতে পারে তারা ভক্তি যাদের উপলব্ধ ধন।

চক্রধর শুনে তো রেগেই অস্থির: "কী যে সব বাজে কথা বলেন মামা, আপনার ভক্তি নেই একথা মেনে নেব?—যান যান আপনার কথা আবার কেউ বিশ্বাস করে ভেবেছেন না কী?"

মালক্ষ্মী ওর মুখ চেপে ধরত: "কী যে বলো মামাকে!"

চক্রধর রেগে উঠত, মুখ ছাড়িয়ে নিয়ে আরো অকুতোভয়ে বলত: "বলব না? ইশ্! সব জানা আছে গো জানা আছে। জোরসে ঘন্টা নেড়ে অং বং বললেই যদি ভাবভক্তির পূজো হ'ত তাহলে আর ভাষ্যি ছিল না। মামার গান শুনলে মনে হয় কারুর যে মামার ভক্তি নেই? আমরা কি কচি খোকা না কি"? আর ঢের ঢের দোবে চোবে মিয়াজান বিবিজানের গান শুনেছি গো শুনেছি—আমাদের ওখানে প্রতি হপ্তায় ওস্তাদি গান হ'ত। কিন্তু গাক তো দেখি কেউ মামার ভক্তির গানের পরে কোনো গান—জমাক না দেখি।"

মালক্ষ্মী ইচেছ ক'রেই টুকত মৃদু হেসে: "কিন্তু ছায়া?"

চক্রধর কেবল এই একটা নামের সামনে মন্ত্রৌষধিহতবীর্য হ'য়ে পড়ত। বলত: "I beg your parden মামা, ঐ একটা মেয়ে আছে বটে। আহা—"বলতে বলতে তার মাতুলভক্তি মোড় নিত মাতুল-শিষ্যার দিকে: "সত্যি, কী গানই গায় ঐ একরত্তি মেয়েটা!"

মালক্ষ্মী এসব সময়ে প্রায়ই অসিতের পিঠে ধন্বন্তরী তেল মালিশ করত সেই কালশিরাটার জন্যে। আর চক্রধর উঠত উজিয়ে, বলতে বলতে:

"ধন্যি আপনার শেখানো মামা। কিন্তু এ-ও বলব—এমন নিতে পারেই বা কটা মেয়ে? (শ্যামলীকে) বলি শুনছ? ওস্তাদি গান শেখা সোজা—কিন্তু মামার ভক্তির গানের ভক্তিটুকু ছেঁকে তুলে নেওয়া—এ চারটিখানি কথা নয়—বুঝলে? আমার কথা কানেই তোলো না এখন—চিনবে আমাকে যখন হারাবে।"

মালক্ষ্মীর মিষ্টি হাসি আরো মিষ্টি হ'য়ে উঠত: "দেখুন তো মামা! ঘুঁষি খেলে খেলে হাত নিশ পিশ করে—কাউকে না পেলে বউ বউই সই। (চক্রধরকে) আমি কবে বলেছি শুনি যে মামার গানের ভাবটুকু তোলা যার তার কর্ম?"

চক্রধর (হেসে): না—আমার বলার উদ্দেশ্য মামা, যারা ছায়ার গান বোঝে না তাদের বুদ্ধি শুদ্ধি থাকতে পারে কিন্তু ভক্তির ভ-ও নেই। সত্যি বলছি আপনার গা ছুঁয়ে, ও যখন একদিন এখানে আপনার কাছে গান শিখছিল ওর গান শুনে ঠাকুর হেসে উঠলেন—আমি স্পষ্ট দেখেছি—স্বচক্ষে।

"আহা থামো নাগো। এসব কথা বলতে নেই।"

"কেন নেই শুনি? আমি ওসব মানি টানি না। সত্যি কথা সব সময়েই বলতে আছে!—আমার মধ্যে বাবা, ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই।" বলতে বলতে ফের ও উজিয়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে কথার মোড়ও যায় ফিরে: "ওগো, চিনতে পারলে না তোমরা আমাদের এই মামাটিকে।"

মালক্ষ্মী হেসে বলে: "ফে—র সেই ছায়ার সঙ্গে লড়াই?

চক্রধর (কুপিত) : ছায়ার সঙ্গে লড়াই? কী নিন্দে যে মামার রটাচেছ্ সবাই খবর রাখো? কী? না উনি বাইজির কাছে গান শিখেছেন, সিনেমার মেয়েকে গান শেখান—আমার কাছে সেদিন বলতে এসেছিলেন এক গুঁপো ধনুর্ধর। বললাম: 'দয়া ক'রে আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবেন কি? আর হোঁচট খাবার সময় মনে রাখবেন যে প্রায়শ্চিত্ত সুরু হ'ল। কারণ যাঁর নিন্দে করে অক্ষয় পাপ সঞ্চয় করছেন তাঁর খড়ম পূজো করবার যোগ্যতাও আপনার নেই।'

অসিত : বলিস কিরে—এরকম কথা ব'লে দিলি তুই মুখের ওপর?

মালক্ষ্মী : ওঁর ঐ রকম সব কাণ্ড। জানেন মামা। আমি বলি মামাকে ভক্তি করো বেশ কথা—কিন্তু কেবল লড়াই করো কেন ভক্তি নিয়ে?

অসিত : ঠিক বলেছ্। এমন না হ'লে মালক্ষ্মী?—তাই তো আদর না ক'রে পারি না থাকতে।

চক্রধর : সেজন্যেও কি লোকে বলতে ছাড়ে। ভাগনে বৌ —ভাদ্রবধূ—এদের আদর?—

মালক্ষ্মী : কী করো? থামবে?

চক্রধর : থাম্‌ব? কেন শুনি? দিই নি সেদিন শুনিয়ে খুড়োকে? বলতে এসেছেন আমার কাছে—শুনোবো না? বললাম: 'যাও খুড়ো যাও—নিজের চরকায় তেল দাও—যদিও জানি না কোনটা নিজের চরকা বোঝবারও তোমার আক্কেল আছে কি না।'

মালক্ষ্মী : কাকে বললে? আমাদের গগনখুড়োকে?

চক্রধর : আবার কাকে ?—খুড়ো তো রেগেই অস্থির—বলে : 'ব্রহ্মশাপের ভয় নেই তোর ?' বললাম ভেংচি কেটে : 'আরে রাখো খুড়ো তোমার টিকীময় ব্রহ্মের মুরদ যা তা জানতে তো আর কারুর বাকি নেই—মোল্লার দৌড় মসজিদ অবধি—শুধু বছর বছর ঐ একটি ক'রে বংশবৃদ্ধি—তা-ও যদি নিজের মুরদে হ'ত—

মালক্ষ্মী (সকুণ্ঠ হেসে) : কী যে বলো ? মুখের যেন কোনো আগল নেই—

চক্রধর (রুষ্ট) : আগল আবার কী ? মামার আবার ভাদ্রবৌ ভাগনেবৌ কী শুনি ? জানে না খুড়ো কী চোখে দেখে মামা মেয়েদের ? বললাম—'ঢের খুড়ো দেখেছি খুড়ো—ব্রহ্মশাপও ঢের দেখেছি কেবল তুমিই দেখো নি বাপের বিয়ে আর খুড়োর নাচন, বুঝলে ?—তাই বলছি যাও'—নৈলে এই জিনিসটিই এখুনি চাক্ষুষ ক'রে ফিরতে হবে—ব'লে যা ঘুঁশি উচোলাম—খুড়ো তো দে দৌড়—ওঃ হোঃ হোঃ হোঃ।

মালক্ষ্মী : আচ্ছা বলুন তো মামা, এরকম করা কি উচিত ? (মুখে কাপড় দিয়ে হাসি)

চক্রধর (হেসে) : কিন্তু শুনছেন তো মামা, ওর আপত্তির সুরটা ? কী চিঁ চিঁ ক'রে আপত্তি ? শুধু ও কর্তব্যবোধে আপত্তি করে। নৈলে মনে মনে জানবেন এতে ও-ও খাসা খুসি।

মালক্ষ্মী : মানছি মামা, যে খুব দুঃখিত আমি হই না যখন উনি নোংরা লোকগুলোর নোংরামির উত্তরে তুড়ে শুনিয়ে দেন। তবু এসব ঘুঁষোঘুঁষি তর্কাতর্কি তো ধর্মজীবনের পক্ষে সত্যিই

ভালো নয়। ভালো কি? আপনিই বলুন তো। কত লোকে কত কী বলে। আপনি নিজেই কি জানেন না? তাব'লে কি গ্রাহ্য করেন আপনি?

চক্রধর: কিন্তু উনি করেন না ব'লে আমরাও করব না? বা রে যুক্তি! ছায়াকে সংকট অসুখে আপনি দেখতে এসেছেন তাতেও সেদিন এক পাকা গিন্নি আপনারই এক আত্মীয়া তিনি—বললেন কি জানেন? যে, ও মেয়ে ডুবে ডুবে জল—

মালক্ষ্মী: থাক থাক—মামা একটু গান করুন—আর আজ এখানেই দুটি খেয়ে যাবেন—কেমন? গরিব মালক্ষ্মীর হাতের রান্না এক আধদিন খেলেনই বা। অনেকদিন খান নি। আপনি এখানে আসেন সব সময়ে রেঁধে খাওয়াতে পারি না ব'লে মন কেমন করে।"

অসিতের সঙ্গে এম্‌নি ক'রেও ওদের অন্তরঙ্গতা গ'ড়ে উঠেছিল। কুৎসারও একটা ভালো দিক আছে। শ্রদ্ধার শক্তিকে তারা দলবদ্ধ করে—উদ্বুদ্ধ করে। মনে পড়ে মালক্ষ্মীর একটা প্রায়োক্তি: "ছায়ার সম্বন্ধে যারা ওরকম কথা ভাবতে পারে মামা, তাদের কথার প্রতিবাদ করতেও বিশ্রী লাগে নাকি? তাই তো বলি ওঁকে—আকাশের দিকে যারা থুতু ফেলে তাদের নিয়ে মাথা না ঘামানোই বা কেন? কারণ সে-থুতু শাস্তি দেয় কাকে—না জানে কে বলুন!

এহেন মালক্ষ্মীকে অনেকদিন বাদে ফের কাছে পেয়ে একথায় সেকথায় গল্প উঠল জ'মে। ফলে ছায়ার ওখানে পেঁ ৗছতে একটু দেরি হ'য়ে গেল।

*　*　　　*　*

*　　　*

দোরের কাছেই দেখা কমলার সঙ্গে। কমলা ওকে বৈঠকখানায় বসিয়ে বলল : "আজ ও অনেকদিন বাদে বড় কেঁদেছে ভাই।"

"কখন ?"

"তুমি প্রমথবাবুর সঙ্গে সভায় যাবার পর।"

"আমার সভায় যাওয়ার জন্যে না কি ?" অসিত উদ্বিগ্ন হ'য়ে ওঠে।

"না না," বলে কমলা, "সেজন্যে নয়···তবে···কী আর বলব···বুঝতেই তো পারো।"

"ও।"অসিতের মনে ফের বিষণ্নতা ছেয়ে আসে। আর একটা দিন মাত্র।···

হঠাৎ "কমলাদি" ব'লে প্রীতি ঘরে ঢুকেই অসিতকে দেখে বলল : "ওমা, অসিদা! কখন এলে ভাই ?"

"এইমাত্র—একটু দেরি হ'য়ে গেল—অনেকদিন পরে হঠাৎ মালক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা। কিন্তু সে যাক্—ছায়া এখন কেমন ?"

প্রীতি বিষণ্নস্বরে বলল : "সারাদিন তো ভালোই ছিল এইমাত্র টেম্পারেচার নিয়ে দেখি ফের জ্বর হঠাৎ একটু বেড়েছে। কী আর করা যাবে বলো ? আমাদের তো হাত নয়। এখন যা করেন ভগবান্।"

"হুঁ। চলো।"

ঘরে ঢুকেই দেখে ছায়া ঘুমিয়ে পড়েছে।

প্রীতি ফিশ্ ফিশ্ ক'রে অসিতকে বলে : "ওমা! এই দশ মিনিট আগেও জেগে ছিল।···কখন ঘুমোলো নার্স ?"

নার্স বলল: "এইমাত্র। তবে উঠলেন ব'লে। ঘুম তো ওঁর পাখির ঘুম।" প্রীতি নার্সের সঙ্গে বাইরে গেল টেম্পারেচার চার্টটি নিয়ে। অসিত একা বসল খাটে। হঠাৎ ছায়ার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল। হঠাৎ যেন মনে হ'ল কিসের ছায়া। মুখে কথাটা উচ্চারণ করতেও ইচ্ছা হয়না।

* * * *

* *

চুপ ক'রে ব'সে অনেকক্ষণ প্রার্থনা করল। প্রথমে বিষাদ এল ছেয়ে। সত্যিই কি বাঁচানো যাবে না ওকে এত ক'রেও? ভগবান কি এই-ই করবেন? মনে পড়ে ওর গুরু-দেবের কথা—শুধু মুখে বললে হবে না—অন্তরেও বলা চাই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

কিন্তু একথা কি সত্যি বলা যায়? এ-চেষ্টা ও করে আজ প্রথম। গোড়ায় কেবল চোখে জল আসে ভাবতে। কিন্তু ঘুমন্ত মেয়ের মুখে আজ যে-ছায়া ও দেখল সে-ছায়া সুধীও দেখেছিল দুদিন আগে—বলেছিল ওকে চুপি চুপি। সুধী ছিল ছায়ার একান্ত ভক্ত। বলত এরকম মেয়ে ও জীবনে দেখে নি আর। বলত: "মামা! আপনি দেখবেন—এ-মেয়ের মতন মেয়েও আর পাবেন না। গানের এতবড় ক্ষতি···

আজ কিন্তু ওর গানের ক্ষতির কথা মনে হয় না একবারও··· আশ্চর্য! মনে বেজে ওঠে কেবল সকালে নদীর কথা···তুমি চ'লে গেলে ছায়াদি যদি না বাঁ—ও ঠেলে দেয় কথাটাকে।

কিন্তু আজ ওর মুখে যে ছায়াটা দেখল সে তো আলোর সহচরী ছায়া নয়। সব আলো নিভে গেলে যে-ছায়া পড়ে সেই ছায়া।

বুকের মধ্যে ওর কেমন ক'রে ওঠে। কী প্রার্থনা করবে? কামনা থাকলে কি প্রার্থনা হয়? তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক—এরই নাম তো প্রাথনা। বাকি সব তো আর্জি—আবেদন—মিনতি।

* * * *

* *

প্রীতি সুধীকে নিয়ে ঘরে ঢুকল পা টিপে টিপে। অসিত চোখ খুলেই একদৃষ্টে চেয়ে ছিল ছায়ার ম্লান অবসন্ন মুখের দিকে। এত অবসন্ন যেন ওকে কখনো দেখে নি—সে-দারুণ ধনুষ্টংকারের পরেও না। কী একটা নিভে গেছে যেন। বাইরের কোনো আশ্বাস নয়—ভিতরের কি একটা ভরসা। তাই কি?

সুধী এসে নিঃশব্দে ছায়ার শিয়রে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর অসিতকে ইঙ্গিত করল। অসিত ওদের সঙ্গে পা টিপে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল গাড়ি-বারান্দায়। সুধী দিন সাতেক ছিল না কলকাতায়।

"সুধী। এলে ভালই হ'ল। কী রকম দেখলে আজ?"

"অনেকদিন বাদে দেখলাম। গতবার—"ব'লেই ও চুপ করল। অসিত বুঝল, বলল: "আজ নাকি বড় কেঁদেছে। হয়ত তারি রিয়্যাকশন? তোমার কী মনে হয়?"

সুধী একটু চুপ ক'রে থেকে বলল: "মামা। কিছু মনে যদি না করেন তো একটা কথা বলি।"

"বলো না।"

"কমলাদির সঙ্গেও এই নিয়ে হচ্ছিল কথা একটু আগেই। মানে···"একটু জোর করেই : "আপনি এই সময়ে না গেলেই কি নয়?"

"থেকে কি কিছু করতে পারি ভাই আমরা ?"

"চেষ্টা তো করতে হবে। কমলাদিও বলছিলেন একথা। সত্যি, মামা দুদিন বাদে গেলে কি হয় না ?"

অসিত : "যদি তেমন দরকার হয়—"

প্রীতি : "না ভাই। ও ভারি দুঃখিত হবে যদি ওর জন্যে তুমি তোমার গুরুদেবের জন্মদিনে না যাও।"

অসিত : "সে কি ?"

প্রীতি : বলছিল কাল।

অসিত : কী বলছিল ?

প্রীতি : বলছিল—'অসিতদাকে আর ধরাধরি কোরো না মাসিমা—কথা দাও করবে না। ওর গুরুদেবের এবার বিশেষ জন্মোৎসব সত্তরবছরে—এখন ধ'রে রাখলে খু—ব অন্যায় হবে। বিশেষ যখন' (হঠাৎ চোখে আঁচল দিয়ে)···'যখন আমি জানি যে আমার দিন আর বড়··· প্রীতি কথাটা শেষ করতে পারল না—কমলা এসে ওকে জড়িয়ে ধরল : "ছী ভাই। এসব কথা মুখেও আনতে নেই।" অসুস্থ অবস্থায় মন খারাপ হ'লে কার না মনে হয় এ-ধরণের কথা বলো তো ? না না, অন্য কথা হোক্। অসিত! তোমার খাওয়া হয়েছে? সেই দুপুরে খেয়েছ তাও নাম মাত্র। তার ওপর সভা টভায় গান—ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয় ?"

সুধী : সে কি! চলুন আমার ওখানে।

অসিত : ছায়া না উঠলে যাই কি ক'রে? (কমলাকে) না কমলা, ক্ষিধে একটু পেয়েছিল বটে কিন্তু এইমাত্র মালক্ষ্মী নিজে হাতে পিঠে ক'রেছিল ক'ষে খাইয়েছে—

সুধী : শুধু আমাদের ওখানেই খাবনা খাবনা করেন—তা, ভাগনে-জামাই তো আর ভাগনে-বৌ নয়—খোদা মেরে রেখেছেন—কী আর করব বলুন? (প্রীতির দিকে চেয়ে) দেখুন মার্কেটে-আজ খুব ভালো আপেল ও বেদানা পেলাম—আমার মোটরে রয়েছে—কাউকে আনতে বলবেন দয়া ক'রে?"

প্রীতি (গাঢ় কণ্ঠে) : আপনারা সবাই ছায়ার জন্যে এত করেন—

সুধী : দেখুন প্রীতিদি! আমি সামাজিক মানুষ নই, মন রেখে কথা বলতেও পারি না—যেজন্যে খুব কম লোকের সঙ্গেই আমার বনিবনাও হয়। কিন্তু ছায়ার সম্বন্ধে মামাকে আমি কী বলেছিলাম সেদিন জানেন?

প্রীতি : কী শুনি?

সুধী : বলেছিলাম—"মামা, ইহকালের চেয়ে পরকাল সত্য না মিথ্যা সে-সম্বন্ধে কোন কথাই আমি বলতে পারি না জোর করে—কিন্তু ছায়ার মতন মেয়েকে বাঁচাতে আপনার যোগের ক্ষতি হ'লে আপনার ব্রহ্মঠাকুর অপ্রসন্ন হ'তে পারেন কিন্তু আমাদের কেষ্ট-ঠাকুর যে মুখ ভার করবেন না এটুকু বাজি রেখে বলতে পারি।

*   *   *   *

*   *

অসিতের এক জ্যেঠতুত বোনের মেয়ে সুরমার সঙ্গে সুধীর বিবাহ হয়—যখন সুরমার বয়স তের কি চোদ্দ। সুরমা ছিল অসিতের ছেলেবেলাকার খেলার সাথী। অমন সুন্দরী মেয়ে সে খুব কমই দেখেছে। সুধী পূর্ববঙ্গের জমিদার, বড় ঘরের ছেলে। আভিজাত্য ওর শুধু রক্তে নয়, মজ্জায়। তাই বিলেত থেকে ফিরে এসে অসিত সুধীর সঙ্গে ঘোর তর্ক করত প্রথম প্রথম—যখন ওর মনে হয়েছিল যে কলিযুগের সেরা মহর্ষি হচ্ছেন কার্ল-মার্ক্স। তাই তখন ওর সন্দেহ মাত্র ছিল না যে ধনিকদের পুলি-পোলাও চালান দিতে পারলেই শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ জোর-জুলুমে রাতারাতি নিখুঁৎ সব-পেয়েছির-দেশ নেমে আসবে হু হু ক'রে বাস্তব-লোকে। সুধী দুনিয়াটাকে অসিতের চেয়ে একটু বেশি চিনত। তাই অসিতের জ্বলন্ত শ্রমিক-পূজায় নিজের শ্রদ্ধার নির্মাল্য জোগাতে পারত না। বলত: "মামা,মানুষ সবাই হরে দরে হাঁটুজল। জগত থেকে ক্যাপিটালিস্ট বা জমিদাররা সব পুলিপোলাও চালান হ'লে সভ্যতার বাইরের ঠাটঠমক একটু বদলাবে বটে কিন্তু মানুষের সুখশান্তি যে বিশেষ বাড়বে এমন কোন আশাই নেই। কারণ মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাবের মধ্যে যে-স্বার্থ, কুটিলতা ও অহং-এর পিছুটান আবহমানকাল সব মহৎস্বপ্নকে ধুলায় লুটিয়েছে—সে-সব তেমনি কায়েম হ'য়েই থাকবে তার আচরণে ও মতিগতিতে। এডুকেশনে কোনো গোড়াকার দৈন্যই ঘোচেনা।" অসিত সে সময়ে সুধীর এধরণের কথা শুনে নাম দিত vested interest বা bourgeois mentality —ঝাড়ত লেনিন বাকুনিন ক্রপটকিন

থেকে নানা বুকনি। কিন্তু আশ্রমে গিয়ে কিছুদিন যোগসাধনা করেই বুঝল সুধী মিথ্যে বলে নি—আমাদের আত্মাদর ও অভিমানের হাজারো শিকড় অনড়, অচল হ'য়ে বিরাজ করছে চেতনার গহনে বহুবিস্তীর্ণ হ'য়ে। আরো দেখতে পেল যে, সংসারে যে-থিওরিই সত্য হোক না কেন, এটা সত্য নয় যে, মানুষ সবাই সমান। সৃষ্টির মূলে বৈষম্য—যেকথা প্রতিভার বেলায় অনস্বীকার্য হ'য়ে ওঠে। অগত্যা ও একটু সদয় হ'ল ফের জমিদারদের উপরে। "যদি হরির কৃপায় দশজনে খায় ভূঁইয়াও কেন খাবে না—" আর কি।

এর আরও একটা কারণ ছিল। জীবনে নানা শ্রেণীর সঙ্গে আমরা যখন মিশি তখন যতই চেষ্টা করি না কেন, শ্রেণী বলতে নিরাকার কোনো পংক্তিকে কিছুতেই পারি না চাক্ষুষ করতে —সেই শ্রেণীর গুটিকতক মানুষের মধ্যে দিয়েই দেখি সমগ্র শ্রেণী-টাকে। ইংরাজ বলতে বুঝি হয় গোরা, নয় বড়সাহেব নয়, লাট, নয় দুচারজন বন্ধু। জমিদার বলতেও তেম্নি বুঝি জনকতক জমি-দারকে যাদের আমরা দেখেছি, জেনেছি, ভালোবেসেছি। বরেন্দ্র প্রমুখ দুচারজনকে কাছ থেকে জেনে যেমন ওর রাজাদের গুণা-গুণ সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হয়েছিল, সুধীর মতন দুচারজন জমিদারকে বন্ধু ভাবে পেয়েও ঘটেছিল অনুরূপ বিপ্লব—ওর ধারণারাজ্যে। এর আরো একটু কারণ ছিল: ওর ভাগনি সুরমা। সুন্দরী মেয়ের প্রতি টান ওর বরাবরই বেশি তাই সুরমাকে দেখে ও সহজে চোখ ফেরাতে পারত না। সুরমাও অসিতকে অত্যন্ত ভালোবাসত—বিশেষ, গান শুনতে ও নিজের হাতে রেধেঁ খাওয়াতে।

বিয়ের পরে তাকে একটু পর্দার মধ্যে থাকতে হ'ত প্রথম প্রথম—বড়মানুষ জমিদারের গৃহিণী তো! কিন্তু সুধী অসিতকে শ্রদ্ধা করত ছেলেবেলা থেকেই। তাই সুরমার সঙ্গে ওকে অবাধে মিশতে দিত—যেটা গোঁড়া হিন্দু জমিদার পরিবারে দেয় না—কুটুম্বকে তারা একটু দূরে দূরেই রাখে। কিন্তু অসিতের সঙ্গে সুধীর যে-সম্বন্ধ গ'ড়ে উঠেছিল সে-সম্বন্ধ কুটুম্বিতার নয়—বন্ধুরই বটে।

আশ্রমে যাওয়ার পরে এ-সম্বন্ধ কেমন ক'রে যেন আরও গভীর হয়েছিল। সে আর এক বিচিত্র ব্যাপার। কারণ যোগ সম্বন্ধে সুধীর কোনো উৎসাহই ছিল না। কিন্তু হ'লে হবে কিঁ, ছায়ার সঙ্গে ওর একটা জায়গায় খুব মিলত: মহৎ মানুষকে ও সহজেই শ্রদ্ধা করত। আর একবার যদি কাউকে শ্রদ্ধা করত তো তারপরে শ্রদ্ধেয়ের আর রক্ষে নেই—তাকে খাইয়ে দাইয়ে উপহার দিয়ে অভিভূত ক'রে তবে সুধীর সোয়াস্তি। ছায়াকেও ও তাই বই চকলেট এ ও তা কত কী যে উপহার দিত! বলত—অমন গান কোনো মেয়ের মুখে শোনে নি। পরে একটু আলাপ হ'লে বলত; "মামা! আপনার ভাগ্য ভালো—গানের চেয়ে গায়িকা আরো বড—লাখে না মিলল এক। আর এই কারণেই আপনার গান এমন গাইতে আর কেউ পারেনি পারবে না—কেন না গানে বড় হ'লেই তো আর প্রাণে বড় হওয়া যায় না।"

সুরমাও বড় ভালোবাসত ছায়াকে। কিন্তু এখানে সুরমার সঙ্গে সুধীর তফাৎ ছিল। ছায়াকে সুরমা ভালোবেসেছিল অসিতের জন্যে, সুধী ভালোবেসেছিল ছায়ার গানের তথা স্বভাবের জন্যে।

ছায়াকে ওর আরো ভালো লাগত এই জন্যে যে ওস্তাদি গানের মোহে পড়লে ওর আখের মাটি হবে, একথা শুনে ছায়া একবারো রাগ করত না। অন্য কারুর মুখে এধরণের কথায় হয়ত ছায়া বিরক্ত হ'ত কিন্তু সুধীর সাতখুন মাফ—যেহেতু ও স্পষ্টবক্তা। এই জাতের মানুষকে ছায়া সহজেই শ্রদ্ধা করতে পারত কি না, তাই দুদিনেই ওদের মধ্যে একটা ভারি কোমল অথচ সুন্দর সম্বন্ধ গ'ড়ে উঠেছিল। ছায়া বাইরের কোনো লোকের বাড়িতে বড় একটা যেত না অসিতের সঙ্গে ছাড়া—কিন্তু সুধীর ওখানে যেত খুসি হ'য়েই। ওর একটি ছোট্ট বাগান ছিল, সেখানে অসিত কখনো কখনো ওকে গান শেখাত—আর সুধী জোগাত রাজভোগ—চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয়।

ছায়াকে সুধী গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করত ব'লে অসিত সুধীকে মাঝে মাঝে জানাত নিজের ভয়-ভাবনা—যখন ছায়ার সঙ্গে একটু আধটু টানা-ছেঁড়া হ'ত—সময়ে সময়েঃ যেমন হিন্দুস্থানি গান সম্বন্ধে। অসিতের মামুলি ভয়—পাছে ছায়া ওস্তাদ ব'নে যায়। সুধী বলত: "ছায়া তেমন মেয়েই নয়। তবে এ-ও বলত: "ওস্তাদদের সঙ্গে বেশি না-ই বা মিশল। হিন্দুস্থানি গান বেশি শেখার ওর কী দরকার? আপনার কাছে বাংলা-গান শিখতে শিখতে ঐ প্রসঙ্গে যা শেখে তাই যথেষ্ট। আসল লক্ষ্য তো বাংলা গানে নব সৃষ্টি—হিন্দুস্থানি তানবাজিতে কেসরবাই হীরাবাই মোতি-বাইয়ের একটা বাংলা সংস্করণ হ'য়ে ওঠা নয়।" এ-হেন সমজদার দরদীকে কোল না দিয়ে অসিত করে কি?

কিন্তু তবু সুধী একদিকে যেমন ছায়াকে বলত অন্যায় হচ্ছে—যখন দেখত ও বেশি মিশছে ওস্তাদ মহলে—তেম্‌নি এদিকে অসিতকে সাবধান করত—ছায়ার প্রতি অবিচার না হয়: "ও কখনই ওস্তাদিয়ানার চাপে চুপ্‌ষে যাবে না—দেখে নেবেন।" কিন্তু মুখে একথা বললেও মনে মনে যে সুধীর একটুও ভয় ছিলনা তা নয়। তাই মাঝে মাঝে গিয়ে ছায়াকে শুনিয়ে দিয়ে আসত—"যতই তা না না না করো ছায়া—মামার বাংলা গানে তোমার যে-বিকাশ হয়েছিল তার সিকির সিকি বিকাশও হবে না হিন্দুস্থানি গানে—এ নিশ্চয় জেনো।"

"কেন হবে না বুঝিয়ে দেবেন?"

"কারণ মামার গান হ'ল একটা নবসৃষ্টি আর হিন্দুস্থানি গান হ'ল চর্বিত-চর্বণ। তুমি যদি ভবিষ্যতের দলে নাম লেখাতে চাও তো মামাকে ছেড়োনা। তবে যদি অতীতের মাঠে গোচারণ ক'রে জাবর কাটতে চাও তাহলে আমরা প্রথম প্রথম দুদিন দুঃখ করব কিন্তু শেষটায় তোমাকে স্রেফ ভুলে যাব—যেমন ভুলে যায় মানুষ ছেলেবেলার ছেলেমানুষি বোলচাল।"

হিন্দুস্থানি গানের প্রতি সুধীর এ-ধরণের কটাক্ষে ছায়া রাগ করত না, কেন না এই সূত্রেই অসিতের প্রতি সুধীর সহজ শ্রদ্ধা সবচেয়ে বেশি সহজে ফুটে উঠত: শ্রদ্ধা শ্রদ্ধাকে চিনে নেয় এক আঁচড়ে।

* * * *

* *

চিরচরণে

উদারকে দুদিন আগে ফের রওনা হ'তে হয়েছিল বলেশ্বর। রাজবাড়ির কী কাজ ছিল—জরুরি। রাজকার্যের খানিকটা মাত্র কোনোমতে সেরে—বেশির ভাগ কাজ মুলতুবি রেখে ও ফিরে এল কলকাতায় সেদিন হঠাৎ—ভোরবেলা।

অসিত তখনো বিছানায়। ঘরে টক টক টক।

"এসো!"

উদার ঘরে ঢুকতেই ও উঠে বসল বিছানায়।

"এ কী! এরি মধ্যে?"

"তোমার প্রস্থানের আগে তোমার সঙ্গে দেখা হবে না এ কি কখনো হয়" ব'লেই আলিঙ্গন। "বলো আমায় ভোলো নি? বলো।"

"আরে করো কি! তোমায় ভোলার কি পথ রেখেছ যে ভুলব? দেখ দেখি কাণ্ড—ছাড়ো।"

* * * *

* *

সেদিন রাতে সুধীর ওখানে অসিতের নিমন্ত্রণ।

অসিত উদারকে কিছু না ব'লে ফোন করল সুধীকে। সুধী উদারকে বড় পছন্দ করত। বলল: "বাঃ—তাঁকে তো আসতেই হবে।"

"কিন্তু—"

"কী মামা?"

"বলছি কি তোমাদের ওখানে আগে গেলে কেমন হয়?"

"মানে?"

"ছায়াকে সন্ধ্যায় গান শুনিয়ে আসতে দেরি হ'তে পারে। উদারকে যখন নিমন্ত্রণ করছ—চায়েই করো না কেন। ধরো পাঁচটা থেকে সাতটা?"

"বেশ। আমি প্রবীরবাবু ও দীপ্তি দেবীকে ফোন ক'রে দিচ্ছি—কমলাদিকেও বলব কিন্তু তাহ'লে।"

"খুব ভালো কথা।"

*　*　　　*　*

*　　　*

কমলা ও উদারকে নিয়ে অসিত সুধীর ওখানে পৌঁছল যথা-সময়েই। তখনো প্রবীর আর দীপ্তি আসে নি।

উদার ঘরে ঢুকতেই নদী লাফিয়ে এসে ওর হাত ধরল।

কমলা: এ কী মামণি! তুমি কোত্থেকে?

নদী: আমি আসব না? বাঃ—আজ গান হবে দীপ্তি দেবীর আমি না শুনলে চলে?

কমলা (সুরমার দিকে তাকিয়ে): ওমা! মেয়ে স—ব জানে!

চঞ্চল: বাঃ ও জানবে না তো জানবে কে? আর তোতা-পাখির ম'ত যা শুনবে আওড়াবে। আজ দুপুরে কী বলছে জানো দাদা?

অসিত: কী?

চঞ্চল: তুমি কাল মালক্ষ্মীর ওখানে গেছ শুনে বলছে জ্যাঠা-মণি ছায়াদিদিকে দেখতে এসে এসব কী হৈ চৈ ক'রে বেড়াচ্ছে? গুরুদেব শুনলে বলবেন কী?

কমলা : দাঁড়াও ব'লে দিচ্ছি মালক্ষ্মীকে। পিঠে খাওয়া তোমার বেরুবে।

নদী (সভয়ে) : না না—আমি মানা তো করি নি কারুর ওখানে যেতে—তবে—(ঢোঁক গিলে)—জ্যাঠামণির তো রুগির কাছেই থাকার কথা।

চঞ্চল : ঐ শোনো—সুধী বলছিল না সেদিন যে এবার দাদাকে গুরুদেব পাঠিয়েছেন শুধু রুগির জন্যে— অম্‌নি ও সেই সানাইয়ে পোঁ-এ রকম রকম বিস্তার পড়ন তুলছে।—ঐ বুঝি দীপ্তিরা এল।

দীপ্তির লাল মোটর দেখে নদী ছুটে গিয়ে চ'ড়ে বসল। প্রবীর সারথিকে বলল একটু ঘুরিয়ে আনতে লেকে—সঙ্গে গেল সুধীর ছেলে রজত। ও ভারি ভালোবাসে নদীকে।

ওদের নিয়ে সুধী বসালো এবার বাইরে ওর ছোট্ট বাগানে। লতায় পাতায় ঘেরা প্রায় একটি কুঞ্জগৃহ বললেই হয়। সুধী সৌখিন বটে। আজ মেঘলা দেখে ওর সবুজরঙের **arc lamp**টি দিয়েছে জ্বেলে। সুরমা অসিতকে জিজ্ঞাসা করে ছায়ার সম্বন্ধে কত কথাই যে। ওদিকে কমলা দেখতে দেখতে খুব ভাব ক'রে নেয় দীপ্তির সঙ্গে : ওর মনটি খুব সজাগ—ভাব করতে পারেও সহজে। ছায়া বলত : "কমলাদিকে দেখে হিংসে হয়—আহা, আমি যদি অম্‌নি টপ্‌ ক'রে ভাব করতে পারতাম !"

চা সর্বৎ আইসক্রীম কেক সন্দেশ—হুলুস্থুল কাণ্ড। তার উপর সুধী আবার উদার অসিত কমলা আর দীপ্তির জন্যে উপহার কিনে রেখেছে। এনে দিল যথাসময়ে।

দীপ্তি (উপহার দেখে সবিস্ময়ে): এসব কী কাণ্ড শুনি? পূর্ববঙ্গের জমিদারি চাপার্টির আদব-কায়দা বুঝি?

উদার: এ ভারি অন্যায় কিন্তু।

সুধী (করযোড়ে): আপনাদের মতন গুণীর শুভাগমন হ'লে একটু নজর না দিলে চলে কখনো?

প্রবীর: গুণী তো এখানে একটি।

কমলা: খু—ব নম্র। নিজের বৌ ব'লে বুঝি—

দীপ্তি টপ্ ক'রে বলে: "আহা এ-ও বোঝ না ভাই, ঘর কি মুর্গি ডাল বরাবর—শোনো নি?"

সুরমা: কথাটার মানে কি?

প্রবীর: ওর কথায় কান দেন কেন? যে-পাকে আমাকে ফেলেছে ও জানেনা না কি?

সুধী: পাকে না ফেললে কি এত interesting হ'তেন —O thou the most talked of man of Calcutta!

সুরমা: কী যে তোমরা বাজে ইংরেজি হিন্দি বুকনি ঝাড়ো কেবল কেবল—দীপ্তি এল কোথায় দুটো গান শুনবে—তা না—(হঠাৎ দীপ্তির দিকে চেয়ে) তোমাকে দীপ্তি ব'লেই ডাকলাম, কিছু মনে করলে না তো? ও দেবী টেবী ভাই আমার পোষায় না--

দীপ্তি (খুসি হ'য়ে): আপনি আমার দিদি যে—দেবী বলবেন কি বলুন? (ব'লেই ওকে প্রণাম করে অত্যন্ত সহজে)

প্রবীরের মুখ দেখে অসিত টের পায় ও খুব খুসি। প্রবীর একটু লাজুক। ও সহজে কোথাও দীপ্তিকে নিয়ে যেতে চায় না,

এমন কি সুধীকে প্রবীর খুব পছন্দ করা সত্ত্বেও ওর ওখানে নিমন্ত্রণ নেবার আগে ও খুব ইতস্তত করছিল। তাই সুধী ও সুরমাকে নিয়ে আগে একদিন অসিত ওদের ওখানে গিয়েছিল। নৈলে হয়ত আসব ব'লেও শেষটায় আসত না। এরকম প্রবীর প্রায়ই করত।

অসিত থেকে থেকে অন্যমনস্ক হ'য়ে যায়। তিন বছর আগে এই বাগানেই ওরা এম্নি আনন্দ করেছে দেবদা রাজু ছায়া প্রীতি কমলা আরও কত লোককে নিয়ে। মনে ওর প্রশ্ন জাগে: আমোদ-আহ্লাদের উচ্ছলতা তো একটু একটু ক'রে নিভে আসছে জীবনের আকাশ থেকে। কিন্তু যে-আলো বিদায় নিচ্ছে সে গভীরতর কোনো আলোর পথ সুগম করছে কই?

বাগানে সুন্দর রেডিও সেট। দীপ্তি বলল: "ধরুন তো। আজ হাফেজ আলি দিল্লিতে বাজাবেন পড়েছিলাম।"

অসিত (চম্‌কে): হাফেজ আলি? স্বরোদিয়া? কখন?

প্রবীর: বিকেলের দিকে। ধরুন না।

সুধী দিল্লি ধরতে গিয়ে হঠাৎ ধরল ঢাকা। শুনল ঘোষণাকারী বলছেন: "এবার রমা দেবী গাইবেন—ছায়াদেবীর একটি গান—বুলবুল।" তারপরেই গিটারের নাদ বেজে উঠল:

বুল্‌বুল্‌ মনফুল সুরে ভেসে…
চল নীল মঞ্জিল উদ্দেশে…

দীপ্তি (হেসে): এ গান তো ছায়াদেবীর নয়—এ যে অসিদার!

প্রবীর: চুপ্‌—

সুরমা : ছাই গাইছে—কে মেয়েটা ?

সুধী : ছায়ার কোনো admirer হবে।

সুরমা : ছায়ার গান আর কেউ গাইলে আমার গা জ্বালা করে, বিশেষ বুল্‌বুল্‌ গানটি। বুলবুলের গান মানায় কখনো শালিখের গলায়?

অসিত দীর্ঘনিশ্বাস চাপে জোর ক'রে।

কমলা : থাক্‌ রেডিও। এখন বরং দীপ্তি দেবীর মুখে শুনি অসিতের শেখানো কোনো একটি গান।

দীপ্তি : কিন্তু ওঁর গান একটাও এখনো ভালো বসে নি যে।

প্রবীর : আর কবে বসবে শুনি ?

দীপ্তি : অসিদা কবার আসেন আমাদের বাড়ি শুনি ?

প্রবীর : চাড় থাকলে আসতেন।

অসিত : না না—ও তুলেছে তো ভালোই, তবে দু একটা খোঁচ—ভালোকথা আজই তো ঠিক ক'রে দেবার কথা ছিল—

সুরমা : হ্যাঁ হ্যাঁ—আর দেরি নয় ভাই।

প্রবীর (দীপ্তিকে) : ধরো না একটা গান। না আরও একটু সাধাবে ওঁদের দিয়ে ?

দীপ্তি ধরে গান :

সুন্দর এসো আজ সাঁঝের খেয়ায়
সান্ধ্য তিমির যবে অন্তর ছায়।

আনন্দে দিলে দেখা অরুণ-ঝলকে কত
স্বর্ণ-সীমন্তিনী আশার অলকে-নত

হিমান্ত এনেছিলে বসন্তে অনাহত
ফুলে ফুলে বরণ মালায় :
আলোক-বিদায় যবে চায়—
ভরো ডালা নিশিগন্ধায়।

নব নব দোললীলা-রঞ্জন ছন্দে
আধজাগা-কিশলয়-সাধ অফুরন্তে
এসেছ পান্থ, আজি এসো ঋতু-অন্তে
দিনান্তে শান্ত ব্যথায় :
আলোক বিদায় যবে চায়—
ভরো ডালা নিশিগন্ধায়।

দীপ্তি গায় সত্যিই ভালো। কিন্তু তবু ওর মনে বার বারই জেগে ওঠে আর একখানি মুখ। এইখানেই সে গেয়েছিল একদিন এই গানটিই।…কানে বাজে আজো তার অতুলনীয় কণ্ঠের মিড়, দোলা, ঝঙ্কার। আর কেবলই ওর মনে রণিয়ে ওঠে

আলোক বিদায় যবে চায়
ভরো ডালা নিশিগন্ধায়।

ভরবে না কি কেউ? যুগ যুগ ধ'রে কি কেবল আশাপথই চেয়ে থাকবে মানুষ?

* * * *
* *

ঘরের মধ্যে ঢুকল নদী, বলল: "জ্যাঠামণি, ছায়াদির মোটর এসেছে।"

"কখন?"

"এইমাত্তর।"

দীপ্তিকে শেখানো গানগুলির রিহার্সাল দেওয়া আর হ'ল না। অগত্যা প্রবীর বলল: "কাল সকালে আসব তাহ'লে অসিদা?"

চঞ্চল: তুমি এলে তো হবে না ভাই—গান শেখায় প্রক্সি চলে না। দীপ্তি যে তখন ঘুমবে।

প্রবীর: ওকে ঘুমন্ত অবস্থায়ই তুলে নিয়ে আসব।

দীপ্তি: আহা! আমিই বুঝি শুধু উঠতে দেরি করি? জানেন অসিদা, ও নিজে এমনি ঘুমোয় থিয়েটার দেখার পরে যে একদিন আমি ডাকি নি—ও উঠেছে বিকেল ছটায়। তখন সূর্য ডুবু ডুবু। ও বলল হেসে: "দেখলে? আজ কত ভোরে উঠেছি?" পুব পশ্চিম ভুল হ'য়ে যায়—ভাবতে পারেন এমন কুম্ভকর্ণ?

সকলে হেসে ওঠে।

* * * *

* *

ঘরে চাপা আলো—হরিতাভ। জানলা দিয়ে হাওয়া আসছে মৃদুমন্দ। বাইরে চাঁদের আলো আজ আরো ফুটেছে।

ছায়া বলল: "আলোটা একেবারে নিভিয়ে দাও না মাসিমা।

কমলা উঠে নিভিয়ে দিল।

অসিত ওর বিছানার কাছে টুলে ব'সে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। ঘরে কেউ কথা কয় না অনেকক্ষণ। কেবল প্রীতির

চাপা কণ্ঠ শোনা যায়—রাতের নার্সের সঙ্গে। মাঝে মাঝে ওদিককার বড় খাটে কমলার স্বরগুঞ্জন—সুনীল ও অজয়ের সঙ্গে। প্রতিমা সেই অক্লান্ত ভাবে নিচে-উপর করছে। হঠাৎ একবার এসে কমলাকে কি জিজ্ঞাসা করল। কমলা উঠে গেল। ছায়া বলল: "দেরি কোরো না কমলাদি। আজ কাজ থাক্ না। সবাই বোসো আমার কাছে। অসিদা, আজ কলকাতায় তোমার শেষ রাত—এবারকার ম'ত। শুধু গান শুনব গানের পর গান। শোনাবে তো ভাই? সেই আগে যেমন ছাড়তে চাইতাম না সেইরকম। আচ্ছা?"

অসিত ওর চুলের মধ্যে হাত বুলোতে বুলোতে বলে: "বল্ না কোনটা গাইব প্রথম?"

ছায়া একটু চুপ্ ক'রে থেকে বলে: "নীলাকাশের অসীম ছেয়ে।"

অসিত গাইল:

নীলাকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো,
আবার কেন ঘরের ভিতর আবার কেন প্রদীপ জ্বালো?
রাখিস না আর মায়ায় ঘেরে,
স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে দে রে,
উধাও হ'য়ে মিশিয়ে যাই—এমন রাত আর পাবো না লো।

পাপিয়ার ঐ আকুল তানে আকাশ ভুবন গেল ভেসে,
থামা এখন বীণার ধ্বনি—চুপ ক'রে শোন্ বাইরে এসে।
এখন বড় শ্রান্ত আমি, ওমা কোলে তুলে নে না—
যেখানে ঐ অসীম সাদায় মিশেছে ঐ অসীম কালো।

ছায়া (মৃদু হেসে): ফের ডিঙিয়ে গেলে অসিদা?

কমলা: কই?

ছায়া: আমি যে শিখেছিলাম এটা—সেই প্রথমেই কমলাদি, ভুলে গেলে তোমরা সবাই?—একেবারে প্রথমে। কিন্তু যে চারটে লাইন তুমি বাদ দিয়ে গেলে অসিদা, সেই চারটে লাইনই আমার বরাবর সব চেয়ে ভালো লাগত—আজ ব'লে নয়—বরাবর—(ধরে গুণ গুণ ক'রে হাঁপাতে হাঁপাতে):

বুক এগিয়ে আসে মরণ—মায়ের মতন ভালোবেসে—"

প্রীতি (শঙ্কিত): ও কী মাণিক—ডাক্তার যে পই পই ক'রে মানা ক'রে গেছেন!

ছায়া: ছাই ডাক্তার—কিচ্ছু পারে না, পারে শুধু মানা করতে—আমি কোন কথা শুনব না (ফের ধরে):

পাপিয়ার ঐ আকুল তানে···

কমলা (ওর মুখের উপর ঝুঁকে): সেরে উঠে গাইবেই তো দুদিন পরে ভাই,—এখন যে গান করা মানা—

ছায়া (উত্তেজিত): কার মানা কমলাদি? ডাক্তারের তো? কে ডাক্তার শুনি? ওরা কি জানে কিছু—না বোঝে? নৈলে আমাকে মানা করে কিনা গান করতে! (প্রীতিকে) লক্ষ্মীটি মাসিমা, আজ আমাকে বোলো না চুপ করতে—

প্রতিমা (ঘরে ঢুকে): কী বলছে ও এত চেঁচিয়ে?

ছায়া: মা! আমাকে এরা কথা বলতে দিতে চায় না, গান গাইতে দিতে চায় না। বলে কেবল চুপ আর চুপ আর চুপ।

চুপ করার সময় তো আসছেই মা—আমার কথা গান কি কারুরই ভালো লাগে না—আমার শক্ত অসুখ করেছে বলে?

প্রতিমা : ষাট্‌ ষাট্‌—কী বলিস পাগল মেয়ে—তোর গান সারা বাংলা দেশের মেয়েরা শোনে রেডিওতে গ্রামোফোনে—

ছায়া : ছা—ই, কে-উ ভালোবাসে না আমার গান—কেউ কেউ কে—উ না—তাই গাইতে গেলেই সবাই ধরে গলা চেপে।

(প্রতিমা প্রীতির দিকে তাকায় সপ্রশ্ননেত্রে)

প্রীতি : অসিতদার গান শুনে ও গান গাইতে চায়—

প্রতিমা : আহা গাক্‌ (চোখ মোছে)—ওকে বাধা দিস্‌ নে—কী আর হবে একটু গুণ গুণ ক'রে গাইলে—

কমলা (মৃদুস্বরে) : একটু জোরে গাইছে কি না—

প্রতিমা (চুম্বন ক'রে) : গাও—কিন্তু একটু আস্তে মাণিক—

ছায়া (বিরক্ত) : গান না কি আবার ফর্মাসে হয়—হয় ঐ ড্রয়িংরুমের গান (হেসে) না অসিদা? আমাদের গান হ'ল বাংলা-গানের মুকুটমণি—একদিন সবাই বুঝবে—আজই বুঝেছে অনেকেই কিন্তু মানতে চায় না, বলেন না উদারদা?

অসিত (স্নিগ্ধ হেসে) : শুধু উদারদা কেন দিদি? তোর গান শুনে যার কানের ক-ও আছে সে-ই বলবে।

ছায়া (হাততালি দিয়া) : ব্যস্‌ তবে শোনো—আর কথাটি নয়—অসিতদা যখন বলেছে তার উপর তো আর কথা নেই (গায়):

পাপিয়ার ঐ আকুল তানে আকাশ ভুবন গেল ভেসে।
থামা এখন বীণার ধ্বনি—চুপ ক'রে শোন্‌ বাইরে এসে।

বুক এগিয়ে আসে মরণ মায়ের মতন ভালোবেসে।

এখন যদি মরতে না পাই—তবে আমার মরণ ভালো—

ওরা শোনে কান পেতে—স্বর ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে—দম নিতে থেমে যেতে হয় প্রতি পদেই—তবু সেই দেবীদুর্লভ কণ্ঠ ছন্দে সুরে মিড়ে গমকে ঝঙ্কারে—ভাবে অসিত সগর্বে—চোখে ওর জল ভ'রে আসে—এ তো নয় ড্রয়িংরুমের ঠুনকো গান, নয় খেয়ালের তানবাজি, ঠুংরির বিলোল কটাক্ষ, এ হ'ল অন্তরাত্মার আত্মনিবেদন মায়ের চরণে: সুরের কারুকলা নয়—আলোর অবতরণ।

ছায়া একটু থেমেই ধরে ফের:

"সাঙ্গ আমার ধুলাখেলা সাঙ্গ আমার বেচাকেনা···

এইছি হিসেব-নিকেশ ক'রে যাহার যত পাওনা-দেনা···

এখন বড় শ্রান্ত আমি···

(ছায়ার চোখে জল উপছে পড়ে প্রতিমা মুছিয়ে দেয়)

এখন বড় শ্রান্ত আমি···ও মা (গাইতে পারে না···থামে)

শ্রান্ত আমি···ওমা কোলে তুলে নে না!—

যেখানে ঐ অসীম সাদায় মিশেছে ঐ অসীম কালো···"

ঘরে কারুর চোখ নেই শুকনো···অজয় পর্যন্ত অলক্ষিতে জামার হাতায় চোখ মোছে শুনতে শুনতে। বুঝি আজ সেও বুঝেছে যে এ-স্পন্দন ধ্রুপদ-খেয়াল-টপ্পা-ঠুংরিতে বেজে উঠতে পারে না?···অসিত চোখ বুঁজে চেপে রাখে আবেগ।

ছায়া: মা!

প্রতিমা: কী মা!

ছায়া : কী রকম করছে বুকের মধ্যে—

প্রীতি (সভয়ে) : কী রকম মাণিক?

ছায়া (ক্ষীণকণ্ঠে) : বোধ হয় বেশি দেরি নেই (চোখ বোঁজে)

প্রতিমা : (আর্ত কণ্ঠে) প্রীতি যা যা শীগ্‌গির টেলিফোন—

ছায়া হাত নেড়ে নিষেধ করে—বসতে বলে, তার পরেই মূর্ছা।

*   *   *   *

*   *

সুনীল মোটরে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনে।...

মূর্ছা ভাঙে একটু পরে। তারপর ও ঘুমিয়ে পড়ে প্রতিমার কোলে মাথা রেখে। অসিত চুপ ক'রে ব'সে থাকে ওর শিয়রে। মনে জাগে ওর একটি চরণ আজ :

"এখন বড় শ্রান্ত আমি, ওমা! কোলে তুলে নে না—"

*   *   *   *

*   *

ছায়াদের ওখান থেকে বেরিয়ে উদারের মোটর ফিরিয়ে দিয়ে অসিত ধীরপদে হেঁটে একটা পার্কে গিয়ে বসে। ব্ল্যাক-আউটে এই একটা সুবিধা হয়েছে: একটু চাঁদের আলো পাওয়া যায়।

'ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো'-ই বটে। কী গানই বেঁধে গিয়েছিল সেই অতুলনীয় গুণী! আর কী সুর!

মনে পড়ে ওর আজ গানে তাঁর কাছে সেই প্রথম দীক্ষা। আর বেজে ওঠে :

মহাবিশ্ব অনকম্পায় ক্ষুব্ধ হয় না যাহার প্রাণ
গাইতে হয় না রুদ্ধ কণ্ঠ মিথ্যা তাহার গাওয়াই গান।

কত সত্য কথা। অথচ গান বলতে যা আমরা বুঝি তার সঙ্গে এ-সাক্ষ্যের মিল কত কম!—ভাবে অসিত একা ব'সে। বড় অনুভব বড় আবেগ পরম ভাবে পরম সুরে ফুটে ওঠে কজনের কণ্ঠে? 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'—এ পারে শুধু সেই মানুষ যাঁকে তিনি বরণ করেন 'নিজে এসে।

ওর গানের বেদনাই আজ বড় হ'য়ে ওঠে অসিতের কাছে। মনে হয় আজ যেন হঠাৎ—এ-প্রাণের কোথায় মৃত্যু?

যে-আলো বারেক জ্বলে
নিভে যায় কভু আর?
যে-সুরে বাজাও বাঁশি
সে যে তমসার পার!

* * * *
* *

ও ভোরে যখন গেল ছায়াদের বাড়ি, নার্স বলল ছায়া রাতে ঘুমিয়েছে।

"বুকে ব্যথা ট্যথা হয় নি?"

"না।"

ও আর কিছু বলে না। ছায়ার বিছানার পাশে সেই বড় খাটে প্রতিমা ঘুমচ্ছে—ঠিক সেই একই ভঙ্গিতে—উপুড় হ'য়ে শুয়ে এক হাতে মাথার বালিশ আঁকড়ে—অন্য হাতটা খাট থেকে খানিক ঝুলে।

ও সন্তর্পণে উঠে বসে—প্রতিমার পাশেই। প্রার্থনা করে একমনে।

এ-রকম ব্যাকুল প্রার্থনা বোধহয় সে কখনো করে নি। হৃদয়ের তারে বেজে ওঠে কৃষ্ণের উদ্দেশে দ্রৌপদীর প্রার্থনা :

"ত্বয়া নাথেশ দেবেশ সর্বাপদ্ভ্যো ভয়ং নহি।"

এ-প্রার্থনা ওর বরাবরই ভালো লাগত—মনের তারে এ-আবেদনের সুর কত সময়েই না বেজে উঠেছে। কিন্তু এমন গভীর সুরে রণিয়ে উঠেছে জীবনে কবার? অথচ, আশ্চর্য, প্রার্থনার মাঝেও চোখে ভেসে ওঠে ছায়ার মৃত্যুছায়াম্লান শীর্ণ মুখখানি, কানে স্পষ্ট শুনতে পায় ছায়ারই গাওয়া গান :

কাণ্ডারী যার সাথের সাথী, কী হবে তার পার-অপারে?
কী হবে তার দিনের আলোয়—রাতের কালো অন্ধকারে?

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে দ্রৌপদীর প্রার্থনায় কৃষ্ণের উত্তর :

"ধর্মনিত্যাস্তু যে কেচিৎ ন তে সীদন্তি কর্হিচিৎ।"

কী অভয়ের সুর! শোকের মধ্যে অশোকের এ-ভরসা কে জাগালো? মনে ছেয়ে গেল দেখতে দেখতে অদৃশ্য রাজ্যের অপার্থিব আলো—শুধু আলো নয়—অন্ধকারও যে আলোরই উল্টোপিঠ এই অনভূতি··· কিন্তু এ-অনুভবকে বোঝাবার ভাষা কোথায়? ঘটনা তো প্রতীক—বাহ্য। সংশয়ীর কাছেই তার সাক্ষ্যমূল্য। অনুভবে যে পেল প্রত্যক্ষ আলো তার কাছে বাইরে ঘটনার এজাহার তো ছেলে-মানুষি। এ-অতীন্দ্রিয় আলো সচরাচর—দৈনন্দিন চেতনায়—স্থায়ী হয় না সত্য। কিন্তু যখন ইন্দ্রিয়েরই কাঠগড়ায় নেমে এ-আলো

হয় সাক্ষী তখন কোন্ বুদ্ধিমন্তের সাধ্য করে তাকে নামঞ্জুর? তখন অন্য সব আলোই যে মনে হয় অন্ধকার, বেজে ওঠে এমন এক অভয়ের আনন্দ যার কাছে সব শোককেই মনে হয় অশোকের নামান্তর। কিন্তু এ-আলো এ-আনন্দ এ-অশোকের ছন্দ যে কত প্রত্যক্ষ, কত বাস্তব—কেউ কি বোঝাতে পারে কাউকে? সে স্পষ্ট শ্রবণ—সে কি ভুলবার—আমি আছি—রয়েছি ধারণ ক'রে! অবসন্ন হবে ও কী ক'রে! সঙ্গে সঙ্গে একটি অতি আবছা, নীল-আলোয়-মোড়া সোনালি রঙের হাত—ছায়ার মাথার উপরে!—মুহূর্তের জন্যে—তার পরেই যায় মিলিয়ে!...

* * * *
* *

ও কী গভীর তৃপ্তি নিয়ে ফিরল যে! যে দেখেছে সে ভুলবে কি কোনোদিন বরাভয় হাতের সে-অপূর্ব আশ্রয়দানের ভঙ্গি? উঠতে বসতে সর্বদাই মনের মধ্যে কেমন যেন শিহরণের ঢেউ খেলে যায় যখন তখন। স্নান করতে করতে চোখে আসে জল, কিন্তু সে-অশ্রুতে কই বিষাদের তো লেশও নেই। মন যেন গান গেয়ে ওঠে: তবে ভয় কি? শঙ্কাহরণের অভয় কর যার মাথার উপরে তাকে নিরাশ্রয় করে কে?

* * * *
* *

স্নান সেরে বেরিয়ে আসতে না আসতে প্রবীর দীপ্তিকে নিয়ে সশরীরে।

প্রবীর : হুজুরে হাজির ক'রে দিয়েছি—এখন—

দীপ্তি : বাকিটুকু হ'ল আমার অদৃষ্ট আর আপনার হাতযশ অসিদা ! এ-ও বুঝলেন না ?

চঞ্চল : অদৃষ্ট যে আপনার খুব মন্দ তা বোধহয় কলকাতায় আপনার অতিবড় শত্রুও বলবে না।

প্রবীর : বোঝো ! ওগো চিত্রতারকা ! পটের খাসা বিবি হ'তে পারাই অদৃষ্টের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ নয়। অতঃপরম্-ও আছে। অর্থাৎ প্রতিমার চেয়েও পুরুত বড় আর কি, নামীর চেয়ে নাম—এ-ও বুঝলে না ?

অসিতের হঠাৎ মনে জাগে আশ্চর্য প্রশ্ন : এরা কী জানে ওর মনে কী মণি আজ প্রার্থনার সময়ে জ্ব'লে উঠেছে ? ধরো, এসব হাসিঠাট্টার আভা যে আজ ওর কাছে খানিক-আগে-দেখা আলোর তুলনায় কী রকম নিষ্প্রভ অলীক অবাস্তব মনে হচ্ছে যদি ওদের সে বোঝাতে যায়—ভাষা খুঁজে পাবে কোথায় ? ও আজ যোগ দেয় গানে গল্পে হাসি তামাশা খাওয়া দাওয়া সব তাতেই—অথচ কিছুর সঙ্গেই যেন ওর যোগ নেই ! বাইরে দেখছে আর ভিতরে পাচ্ছে এ দুই যেন একেবারে আলাদা—বিচ্ছিন্ন !...

*   *   *   *
*   *

সুরু হয় গানের মহলা। দীপ্তি খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে—ধরে প্রতি খোচই চট্ ক'রে। ঐসিতি ঢঙটা সে একটু আয়ত্ত করেছে বৈ কি ইতিমধ্যেই। বলে : "প্রথম প্রথম এ-ঢঙের গান আমার

সত্যি তেমন ভালো লাগে নি অসিদা। কিন্তু ক্রমশ যতই গাইছি কী যে ভালো লাগছে!"

প্রবীর: আহা! তারকে! বীণাকে যদি দুদিন আগেও চিনতে বীণা ব'লে গো, তাহ'লে আজ বীণাপাণি ব'লে কে না হাত জোড় করত তোমায় দেখে?

সবাই হেসে ওঠে।

অসিত: ধরো ধরো—ঐখানটা এখনো হয় নি পুরোপুরি ঐ গমকটা—

জঁহা প্রে—মকি গঙ্গা প্রে থেকে ম যেতে হবে টুক্ ক'রে।

চঞ্চল: কী যে করো দাদা! উনি তোমার গানের ঢঙ ভালো না জানতে পারেন কিন্তু প্রে থেকে ম যে টুক্ ক'রেই যেতে হয়, যে পারে সে আপ্‌নি পারে—এটুকুও তুমি ওঁকে শেখাতে চাও? তোমার বুকের পাটা আছে মানতেই হবে।

দীপ্তি (হেসে): কিন্তু কী ক'রে জানলেন যে এবিষয়েও গুরুগিরি করবার এক্তিয়ার ওঁর নেই?

প্রবীর: যা বলেছ—**once a guru always a guru**—কি না, কলি বড় সাংঘাতিক অতিথি: গুরুগিরির ছিদ্র তিনি একবার পেলে আর রক্ষে আছে? মনের প্রাণের প্রতি ডিপার্টমেণ্টে এক এক গুরুকে ডিক্টেটর বসিয়ে দিয়ে তবে তাঁর জলগ্রহণ।

দীপ্তি: এরকম করলে কিন্তু হয়েছে আমার গান শেখা।

নন্দা: হ্যাঁ ঝটপট শিখে নিন দীপ্তিদি, এক্ষনি দাদার গাড়ি আসবে।

প্রবীর : গাড়ি ? ও—ছায়াদের ?

চঞ্চল : না, শেঠজির।

অসিত : ও হো। ভাগ্যিস মনে করিয়ে দিলি—কটা এখন ? দশটায় বুঝি তিনি গাড়ি পাঠাবেন ?

প্রবীর : শেঠজি ?

চঞ্চল : জয়মল শেঠ।

প্রবীর (অসিতের দিকে চেয়ে) : পর্বত মহম্মদের কাছে গিয়েছিল একথা অবিশ্বাস করার আর পথ রাখলে না অসিদা।

অসিত (আহত) : তুই কি মনে করেছিস ওর টাকা আছে ব'লে—

প্রবীর (জিভ কেটে) : ছি ছি অসিদা। এমন কথা মুখে আনতে পারলে ? কিছু মনে কোরো না ভাই—জানোই তো আমরা মুখ-আলগা লোক, দুম্‌দাম্ ক'রে কথা ক'য়ে থাকি। কিন্তু একথা কি তোমার অজানা যে, তোমার অতিবড় শত্রুও মনে করে না টাকার উপর তোমার নজর আছে ? তবে কি জানো ? আমি বহুদিন থেকে দেখে আসছি—তুমি গোঁড়ামির উপর হাড়ে-চটা। আর শেঠজি যে-রকম গোঁড়া—কিন্তু যেতে দাও ভাই এ-প্রসঙ্গ—এ আমাদের অনধিকার চর্চা বৈ কি।

চঞ্চল : কিন্তু এ তোমার অন্যায় প্রবীর। খুঁৎ মানুষের একরকম নয়। অসিদা পোলিটিশিয়ানদের বাড়ি গিয়ে গান করলে তোমরা আপত্তি করো না—যত আপত্তি আচারপন্থীর শুচিবাইয়ে ?

প্রবীর (একটু মুখ নিচু ক'রে থেকে) : অসিদা, আমার অন্যায় হয়েছে।

দীপ্তি : তাছাড়া অসিদা এসেছে গান ছড়াতে—কে কেমন লোক তদন্ত ক'রে সামাজিকতার ধামা ধরতে না। (ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) ধরুন অসিদা, ওর কথা কানে তুলবেন না—শেঠজির গাড়ি এলো ব'লে—আর আধ ঘন্টা মাত্র সময় মনে রাখবেন।

অসিত (বিমনা) : হ্যঁা ধরো।

দীপ্তি : ওখানটা বলুন না আর একবার—ঐ (প্রবীরকে) হেসো না, প্রে—মকি গঙ্গা—দেখুন তো অসিদা, কেবল হাসবে।

চঞ্চল : চোপরাও প্রবীর। প্রে—ম শুনছ তবু না কেঁদে হাসি? ধিক্।

ওরা হেসে ওঠে। অসিতের বিমনা ভাবটা কেটে যায় গানের সুরে—হাল্কা কথায়।

নদী ছুটে এসে বলে : "জ্যাঠামণি! প্রকাণ্ড মোটর—নীল—দীপ্তিদির চেয়েও মস্ত—আর এক তেমনি মস্ত দাড়িওয়ালা ড্রাইভার—মাগো মা! দাড়ির মাঝে আবার সিঁথি!

সবাই হেসে ওঠে। অসিত ইঙ্গিত করতেই চঞ্চল নিচে নেমে যায়। একটু বাদে এসে অসিতকে দিল একটি কার্ড—শেঠজির হাতে লেখা : গাড়ি পাঠালাম—দয়া ক'রে এলে খুব খুসি হব।

অসিত (চঞ্চলকে) বল্ বসতে। এখনো পঁচিশ মিনিট সময় আছে। শোনো দীপ্তি—ওখানে যে ঠুংরির খোঁচটুকু লাগিয়েছ বেশ সুন্দর হয়েছে। আর এই-ই আমি চাই। সুরের কাঠামো রেখে সৃষ্টি করতে হবে। আমি যা শেখালাম সে-সুর হ'ল শুধু প্রতিমা যাকে বলে। চালচিত্রও আঁকতে হবে তোমাকে, প্রাণ প্রতিষ্ঠাও করতে হবে তোমাকে।

এই রকম ক'রে ওদের কথাবার্তা ও গান বাজনা চলে আরও পাঁচ সাত মিনিট।

হঠাৎ চঞ্চল এসে বলল: "শেঠজির সারথি তাড়া দিচ্ছে, বলছে আর দেরি করলে না কি শেঠজির সঙ্গে তোমার দেখাও হবে না। আমি বললাম একটু বসতে, তা ও বলে ও অপেক্ষা করতে পারবে না—কারণ শেঠজির হুকুম—তোমাকে এক্ষুনি আসতে হবে।

অসিত (বিরক্ত): যা যাঃ। ব'লে দে ওকে গাড়ি নিয়ে যেতে, যাব না আমি। (প্রস্থানোদ্যত চঞ্চলকে চেঁচিয়ে) আর এটাও ব'লে দিস শেঠজিই চেয়েছিলেন আমার দেখা, আমি চাই নি তাঁর দেখা। বেশ স্পষ্ট ক'রে ব'লে দিস—বুঝলি?

বলতে বলতে অসিত যে কিরকম তেতে উঠেছিল ও খেয়ালই করে নি, চঞ্চল চোখ মিট মিট ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নামতেই দীপ্তি প্রবীর সুনন্দা তিনজনেই উঠল হেসে।

দীপ্তি (হাততালি দিয়ে): ও মা! অসিদা, জানেন, আমি সত্যি ভাবতাম আপনি দারুণ ভারিক্কি মানুষ! আপনি যে এরকম ছেলেমানুষ—

অসিত (লজ্জিত): না, দেখ না—কী রকম ক'রে কথা বলতে হয়—সবাইকে রোজ দেখে কি না হাতজোড় ক'রে থাকতে, তাই ভেবেছে—

প্রবীর (হো হো ক'রে হেসে): শুধু কি ও-ই দেখে এসেছে অসিদা? সবাইই কি দেখে নি?

অসিত : তা ব'লে হুকুম করবে?

প্রবীর (বাধা দিয়ে) : সবাই হুকুম তামিল করতে স্নুরু করলে হুকুম না ক'রে মানুষ কি হাতজোড় করে অসিদা? ওরা দেখে এসেছে বরাবর যে টাকার কাছে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করছে সবাই। ক্রোরপতিকে অগ্রাহ্য করবার মতন বুকের পাটা কজনের মধ্যে দেখা যায় বলো তো? তোমাকে ভালোবাসি কি আমরা সাধে?

চঞ্চল (এসে) : ওকে খুব ধম্‌কে দিয়েছি। ও প্রথমটা একটু তেতে উঠেছিল, কিন্তু যেই বললাম শেঠজিই তোমার সঙ্গে যেচে দেখা করতে চেয়েছিলেন তুমি তাঁর কোনো তোয়াক্কাই রাখো না, সেই ও স্রেফ বাসি মুড়ির মতন মিইয়ে গেল। বলল মাফ কীজিয়েগা হাম্‌ হাম্‌—আরে! এখন হাম হাম কি রে? বল্‌ রাম রাম!

ওরা সবাই একজোটে হেসে ওঠে।

অসিত শিখিয়েই চলে।

*　*　　　*　*

*　　　*

দীপ্তি : দশটা বেজে দশ মিনিট হ'য়ে গেল যে।

অসিত : হোক গে—আমার এখনো শেখানো শেষ হয় নি। ওরাই লোককে বসিয়ে রাখতে পারে? থাক্‌ ব'সে।

প্রবীর : না না সেটা কিন্তু ঠিক হবে না অসিদা। চাকরের দোষে মনিবের শাস্তি—**not fair**, তাছাড়া শেঠজি গোঁড়া হ'লে কি হয়—ধার্মিক মানুষ তো বটে।

অসিত (অপ্রতিভ): তা বটে। (দীপ্তিকে) কেবল এই-খানটা আর একবার করো তো আমার সঙ্গে। সত্যি, গান শেখানো ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করে না—আহা—ছায়াকে যখন শেখাতাম ঘন্টার পর ঘন্টা—

প্রবীর: ও কেমন? আজ?

অসিত: খুব ভালো নয় ভাই, কাল মূর্ছা গিয়েছিল—

প্রবীর: আচ্ছা অসিদা, একটা কথা যদি বলি—রাগ করবে?

অসিত: তোর উপরেও রাগ? আমি কি দুবাসা না মার্কণ্ডেয়?

প্রবীর: বলছিলাম কি, ছায়ার জন্যে আরো দুদিন থেকে যেতে পারো না কি?

অসিত: গুরুদেবের জন্মদিন এসে গেল কি না—

প্রবীর: হোক না ভাই, দুদিন দেরিতে গেলে যদি—

অসিত: (একটু চুপ ক'রে): একটা কথা যদি বলি তুইও রাগ করবি নে বল্?

প্রবীর: বলো না।

অসিত: থাক গে।

প্রবীর: না, প্রসঙ্গ তুলে চাপা দেওয়া—it is—মেয়েলি।

অসিত (অগত্যা): আমার বলবার কথা ছিল—আমি সংসারে মিশলেও যে সংসারী নই এই কথাটা তোরা ভুলে যাস ব'লেই—কিন্তু থাক্ তোদের মনে দুঃখ দেব না।

প্রবীর: একথা মানি অসিদা। কিন্তু তুমিও একটা কথা ভুলে যাও যদি বলি?

অসিত : যথা ?

প্রবীর : যে, "হাল্কা তুমি করো পাছে হাল্কা করি তাই আপন ব্যথাটাই।" না সত্যি অসিদা, কারণ একথা তুমি বিশ্বাস কোরো যে বাইরে হাল্কামি যারা করে তারাও মনে মনে এটুকু জানে যে তোমার মধ্যে যে-অভিমান সে ঠিক সংসারী জাতের অভিমান নয়।

অসিত : থাম্ থাম্—হয়েছে।

দীপ্তি : না হয় নি অসিদা। কারণ এটুকু অন্তত আপনারও বোঝা চাই যে আপনি সংসারী নন ব'লেই আমরা—সংসারী মানুষ—আপনাকে কাছে শুধু পেতে নয়, রাখতে চাই। কিন্তু শুনুন আর দেরি না—যান আপনি—কুড়ি মিনিট হ'য়ে গেল দশটা বেজে।

* * * *

* *

শেঠজির মোটরে চ'ড়ে বসতেই শ্মশ্রুল সারথি সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করে : "মাফ কীজিয়ে গা সাব্—সেঠজিনে বোলা থা উস্ লিয়ে ময়নে সোচা—"

অসিত কুণ্ঠিত হ'য়ে বলে : "কুছ্ হর্জা নহি, চলো।"

"জো হুকুম্।"

স্—স্—ক'রে গাড়িটির গদির মধ্যে মৃদু কম্পন ওঠে জেগে। রসা রোডে সারথি বেঁক নেয়।

অসিতের কী যে আত্মগ্লানি হয়। কেন এ-বেচারির উপর অকারণ রাগ ক'রে নিরপরাধ শেঠজিকে বসিয়ে রাখল? এরি

নাম কি নিরভিমান? তবে কেনই বা সে ভূমিনেত্র সাধকটির 'পরে বিরূপ হ'য়ে অত কথা বলেছিল ছায়াকে? খৃষ্টের কথা মনে পড়ে "কাঁচের ঘরে যে বাস করে তার সাজে না অপরের দিকে ঢিল ছোড়া।"

সত্যি কথা। আত্মাভিমানের এক সময়ে দরকার—খুবই দরকার: মানুষের বিকাশের প্রথম অবস্থায় অহংবুদ্ধি উচচাশা আত্মসম্ভ্রমজ্ঞান সবই আসে তার সহায় হ'য়ে। কিন্তু যোগের প্রধান কথা তো নিরভিমানিতা। কাজেই যে-অভিমান ছিল মিত্র তাকে অন্তরায় ব'লে চিনলে তাকে বিদায় তো দিতে হবে। কিন্তু অসিত কই তা পারল? কেন ওভাবে তেজ দেখাল যে শেঠজির কোনো তোয়াক্কাই সে রাখে না? গুরুদেব কি বলেছেন —ধনে অনাসক্তি জাহির করতে হবে ধনীদের প্রতি রাগ দেখিয়ে? কবে সে লাভ করবে ক্ষোভহীন শান্ত অবস্থা? মনে প্রাণে নিরভিমান হ'তে না শিখলে কেমন ক'রে পাবে ভগবানের দেখা?

কিন্তু কী আশ্চর্য—সে যে আজো নিরভিমান নয় একথা নিজের কাছে কবুল করতেও এত বাজে কেন? নিজেকে অত্যন্ত ভালোবাসি ব'লে? নৈলে কি আর আত্মগ্লানির মহূর্তেও সে এ-হেন অসার যুক্তিকে কোল দিত যে সে বৈরাগী—সংসারীর মুরুব্বিয়ানা মেনে নেবে কোন্ লজ্জায়? বৈরাগী? ধিক্। মনে প'ড়ে যায় ভাগবতে যথার্থ বৈরাগীর আদর্শ:—

নোদ্বিজেত জনাদ্ধীরো জনং চোদ্বিজয়েন্নতু।
অতিবাদ স্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন॥

মনে মনে ও কত—কত—কতদিন জপ করেছে এই আদর্শ—কারুরই উদ্বেগের কারণ হবে না, কোনো কিছুতেই বিচলিত হবে না, পরের দুর্বাক্য সহ্য করবে হাসিমুখে, আর সবচেয়ে বড় কথা—কাউকেই করবে না অবজ্ঞা—"নাবমন্যেত কঞ্চন"। কী নিখুঁৎ নিটোল আদর্শ! কিন্তু ওর কাছ থেকে কত দূরে! —দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ও গভীর মনস্তাপে। যথার্থ বৈরাগী হবে সে কবে? কবে লুপ্ত হবে তার সর্ববিধ আত্মসম্ভ্রম, তেজস্বিতার বেনামিতে পরকে আঘাত করবার ক্ষুধা?

আজ যেন এই ছোট্ট দৃষ্টান্তটির মধ্যে দিয়ে ওকে পরম দিশারি দেখিয়ে দেন চোখে আঙুল দিয়ে যে বৈরাগী হওয়া ভালো হ'লেও বৈরাগিয়ানা ভালো নয়। কারণ বৈরাগিয়ানার পিছনে একটি অনুক্ত অভিমান দৃষ্টিকে ঝাপসা ক'রে দেয় নিত্যনিয়ত, বলে: "আমি আর যাই হই সংসারী নই।" এই কথাই কি আজ ও প্রবীরদের বলে নি খানিক আগে? অথচ আসলে এও তো সেই একই অহঙ্কার—কেবল ভোল বদলেছে এই তফাৎ। না—ওকে নিজের কাছে খাঁটি হ'তেই হবে—তাই কঠোর হ'য়েই অঙ্গীকার করতে হবে—তাতে যতই ওকে ব্যথা বাজুক—যে সংসারীর চেয়ে ও কিছু কম ভালোবাসে না আত্মাভিমানকে। মানতেই হবে দীনতার অশ্রুজলে যে, শ্রেষ্ঠ সত্য পূর্ণ নিরভিমানের রেশ অতি-প্রস্বনে নেই—আছে নিরলংকারে, নেই কৃচ্ছ্রের কাঁটাবনে, আছে অনাসক্তির সাগর-সৈকতে।

কিন্তু তবু...অতি-প্রস্বন অত্যুক্তি কৃচ্ছ্র এসবেরও মধ্যে নেই কি একটা সাময়িক সার্থকতা? উচ্ছ্বাসও তো অত্যুক্তি—কিন্তু

তাই ব'লে কি সে সর্বত্রই অকৃতার্থ ? কে বলবে ? প্রাণ আমাদের স্বভাবকৃপণ—আত্মপর, সুখপ্রিয়, সাবধানী। অভিমান উচ্ছ্বাস কৃচ্ছ্র এসব তাকে দিয়ে বলিয়ে নেয় করিয়ে নেয় অনেক কিছু যার অঙ্গীকার কর্তব্য হ'লেও দুরায়ত্ত। যেমন আভিজাত্যের বেলায়: হীন কাজ করব আমি ? আমাদের বংশের মাথা হেঁট হবে না ? সত্যিকার কবিত্বের বেলায়ও: নোংরা সস্তামি করব আমি—হাল্কা চিত্তবৃত্তিকে দেব প্রশয় ? ধিক্। যথার্থ বৈরাগ্যের সার্থকতাও ঐখানে। তাই আধ্যাত্মিকতায় প্রায়ই দেখা যায় সুরুতে অভিমান তাদের আশ্রয় করে: কী ? বিলাসীরা যার কাঙাল আমিও তারই কাঙাল হব—আমি না বৈরাগী ? বলতে কি, মানুষ হয়ত যশ অর্থ মোহ কিছুরই মায়া কাটাতে পারত না যদি না এ-অসাধ্য-সাধনের তাগিদ প্রথম দিকে শক্তি আহরণ করত আধ্যাত্মিক গৌরববোধের পুঁজি থেকে। সুলভ করতালির লোভে আমি দোরে দোরে আমার কৃতিত্ব ফেরি ক'রে বেড়াব ? আমি কি সংসারী ? প্রিয়-বিয়োগে হাহাকার ? অর্থের জন্যে কাড়াকাড়ি ? ধিক্, আমি না সন্ন্যাসী, সাধক, ত্যাগী ?

মনে পড়ে ওর অর্থের কথা আজ আরো বেশি ক'রে। যৌবনে যদি ও বিশেষ ক'রে নিকটাত্মীয়দের মধ্যে অর্থলুব্ধতার বহুপরিচয় না পেত তবে কি অর্থমোহের 'পরে জাগত এমন ধিক্কার ? আর না জাগলে পারত কি অর্থ ছাড়তে এমন সাগ্রহে ?

কিন্তু তবু এতেও ভুলচুক হয় এই ধরণের ঝোঁকালোতায়। কেন না ধনাসক্তিটাই জঘন্য,—সদুপায়ে ধনার্জনের মধ্যে তো আর থাকতে পারে

না কোনই জঘন্যতা। অর্থ তো শুধু ভোগের একটা সামাজিক বিলি ব্যবস্থা, আর বিশ্ব যে ভোগেরই জন্যে এ কথা কে না মানবে? আমরা জানি না ভোগের প্রকৃত ছন্দ তাই না সে হ'য়ে ওঠে নিত্য দুর্ভোগ। তবে কিনা অর্থ যে সিদ্ধি নয় সিদ্ধির উপায় মাত্র—এইটি ভুলে ব'সে থাকি ব'লেই অর্থে ধিক্কার এত বড় সহায় হ'তে পারে পারমার্থিক চেতনার উন্মেষলগ্নে। সত্য—কিন্তু সেই জন্যেই চাই সজাগ থাকা—

ত্যাগ সর্বার্থ-সিদ্ধির পথে আলো ধরুক—কিন্তু অজান্তে নিঃসঞ্চয় অভিমানের দিকে ঠেলে না দেয়: স্থূল অভিমান সূক্ষ্মতর অভিমানের মুখোষ প'রে না ঠকায়।

অথচ—ভাবতে ওর মুখে আত্মসমালোচনার ব্যঙ্গহাসি (irony) ওঠে ফুটে—এই ধরণের জাহিরিপনাতেই সাধারণ মানুষ বেশি চম্‌কে যায়। কোটিপতির সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান—একটি মেয়েকে গান শেখানোর খাতিরে! অথচ ওর এ-ব্যাপারের মধ্যে সত্য গৌরবের যদি কিছু থাকে তবে সেটা এই গান-শেখানোর ঐকান্তিক আগ্রহ যার কাছে কোটিপতির নিমন্ত্রণও হ'য়ে ওঠে নীরস। একথা ভাবতে কিন্তু ওর সত্যি আনন্দ হয় যে এখানে ওর এতটুকু ভান ছিল না, না অত্যুক্তি। আশ্রম থেকে সম্প্রতি যখনই কলকাতায় এসেছে ওর মনেও হয় নি মান্যগণ্য বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মাখামাখি করবার কথা: মনে হয়েছে একে ওকে তাকে গান শেখাবারই কথা—অন্য কোনো সস্তা উপায়ে ও চায় নি অবসর-বিনোদন। কত বাড়িতে গিয়ে ব'সে সেধে গান শিখিয়ে এসেছে ছোট

ছোট ছেলেমেয়েদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা—যখন ওর বাড়িতে মোটরের পর মোটর এসে গেছে ফিরে। গৌরব করতে যদি সাধ যায়ই—বরং এই ধরণের অনুরাগ নিয়ে গৌরব করুক—একটা অহেতুক বিরাগ অরুচি নিয়ে জাঁক করবার কী আছে? অথচ এই জাঁকই ও তো আজ করেছে।

এই সব কথা নিয়ে ভাবতে ভাবতে যতই ও টের পায় নিজের দুর্বলতা ততই বেড়ে ওঠে আত্মগ্লানি—আসে লজ্জা। কাঞ্চন অপবিত্র নয়, কামিনী তো নয়ই। এদের প্রতি মানুষের আসক্তি দেখতে দেখতে ফেঁপে ওঠে ব'লেই সাধককে এত সতর্ক হ'তে বলা, কিন্তু এ-সতর্কতা বীর্যের রাজবেশ নয়—দুর্বলতারই রক্ষাকবচ: তবে মানুষ না কি স্বভাবে দুর্বল তাই বলসঞ্চয় করার জন্যে উল্টো চাপ দিতে হয়—আসক্তিকে জয় করতে হয় প্রথম দিকে বিতৃষ্ণা দিয়েই—আরো এই জন্যে যে, এ-দৌর্বল্য শুধু যে গহনসঞ্চারী তাই নয়—বহুরূপী: নানা মুখোষ প'রে এসে লওয়ায়, তাই সন্ন্যাস-দীক্ষায় কামিনী সম্বন্ধে তিরিক্ষিভাবের জয়জয়কার, বৈরাগ্যসাধনে কাঞ্চন সম্বন্ধে জুগুপ্সার ধুমধাম।

এ-ই, এ-ই, এ-ই। এই-ই হ'ল আসল হেতু—ইউরেকা! পেয়েছে ও—পেয়েছে। অমুক বলেছেন: "প্রক্ষালনাদ্ধি পংকস্য শ্রেয়ো ন স্পর্শনং নৃণাম্!"* অমুক বলেছেন: "কিমত্র দ্বারং নরকস্য?—নারী।" বলুন গে—ও মানলে তো। এ-ও কি একটা

* কাঞ্চনরূপ পাঁকছুঁয়ে হাতধুয়ে ফেলার চেয়ে পাঁকে হাত না দেওয়া আরো ভালো।

কথা হ'ল যে নরকের দ্বার নারী।—হ'তে পারে কখনো? যা নয় তা: মানুষ বাঁচবে অথচ মাতৃজাতিকে ছোঁবে না, অর্থকে ছোঁবে না—এ-হেন দুর্ধর্ষ মুস্কিল-আশানকে কি একটা সমাধান বলা চলে সত্যি সত্যি? দূর হোক গে এসব নজির। ওর যেমন খারাপ লাগে সংসারীদের আমার আমার করা—তেমনি খারাপ লাগে বৈরাগীদের এই কথায় কথায় নামের সল্‌তে জ্বালিয়ে নজিরের বোমা ফাটানো। না—না—না—অন্তত ওর স্বধর্ম এ নয়। শাস্ত্র? খুব ভালো কথা—তবে যতক্ষণ না শাস্ত্রের শ্লোক উপলব্ধির আলোয় মন্ত্র হ'য়ে উঠল ততক্ষণ সে-বাণী হাজার কল্লোলময়ী হ'লেও ওর কাছে বরণীয় নয়—নয়—নয়। ভগবানকে পেলে কী অবস্থা হয় ও জানে না, কিন্তু সে-লক্ষ্যে পৌঁছনর আগে উপলব্ধিতে পেয়েছে ও মোটামুটি দুটি সেরা আনন্দের স্বাদ: এক, দরদের স্নেহের প্রীতির আনন্দ—এখানে স্নেহ যতই নিঃস্বার্থ প্রত্যাশামুক্ত—মিলন ততই সার্থক সুন্দর; দুই, শিল্প চিন্তা ভাব—এখানে প্রেরণা যতই ঊর্ধ্বমুখী, নির্মল—সৃষ্টি ততই তৃপ্তিকর, দীর্ঘজীবী।

একটা কিন্তু তবু থাকেই। সেটা ছুঁতে পেলেও আঁকড়ে পায় না আজো। তবু ভাগ্যি—যে-আভাসটা পেয়েছে এরি মধ্যে সেটা অভ্রান্ত। তাই না ও বুঝেছে যে স্নেহ প্রেম প্রীতি যতই নিঃস্বার্থ হোক না কেন ওদের লেনদেন যতক্ষণ মানবিক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ মুক্তি নৈব নৈব চ—না প্রেমিকের, না প্রেমের। এ-আভাস আরো গাঢ় হয়েছে ছায়াকে চিনে—বিশেষ ক'রে ওর মৃত্যুযন্ত্রণা চাক্ষুষ ক'রে। তাই না ও এমন মর্মে মর্মে উপলব্ধি

করতে পেরেছে যে,ভালোবাসা নিয়ে কবিত্ব করা সহজ—কঠিন কেবল তার নিরঞ্জন রূপটি প্রত্যক্ষ করা। এ-রূপ একটু একটু ক'রে আসে অভিজ্ঞতার পরিধির মধ্যে, আর যতই আসে ততই হয় এই বিচিত্র উপলব্ধি আনন্দে-বেদনায় মিশিয়ে যে, ভালোবাসা যতক্ষণ একান্তভাবে পরস্পরমুখী থাকে ততক্ষণ সে কিছুতে পায় না তার স্বরাজ্যের সহজ সাম্রাজ্য। অবশ্য এ-ঐকান্তিকতাও সার্থক কিন্তু মাত্র খানিকদূর পর্যন্ত : তার পরে চোখে পড়েই ওর সীমা—কারণ তখন স্পষ্ট দেখা যায় যে, গভীরতম স্নেহপ্রীতি প্রেমও থেকে যায় অতৃপ্ত। থেকে যাবেই···কেন না—কিন্তু না। কেন তা কি ও সত্যি জানে ? না তো। ভাষ্য নজির শ্লোক অনেক শুনেছে এ-পর্যন্ত। কিন্তু এখন আর দরকার নেই এদেরকে : চাই ওর সেই উপলব্ধির আলো যার প্রসাদে সব অজ্ঞানতিমিরান্ধতা থেকে লাভ হয় পূর্ণ মুক্তি—

"আইয়ে সাধুজি।"

চম্‌কে ওঠে ও। কখন যে মোটর ঢুকেছে শেঠজির অট্টালিকার সামনের প্রশস্ত রক্তকঙ্করিত রাস্তায়—।···শেঠজি একেবারে সামনেই দাঁড়িয়ে। সারথি তটস্থ। সে-বেচারা ভাবে নি যে মুনিব একেবারে তোরণের সামনে এসে দাঁড়াবেন অতিথিকে এগিয়ে নিতে। সশব্যস্ত হ'য়ে মোটরের দরজা খুলে কুর্নিশের ওর সে কী ঘটা। অসিত হাসে। কিন্তু এবার সতর্ক ছিল ব'লে লজ্জাও পায়। সে-ই অভিমান : কোটিপতি সম্মান দেখাচ্ছে। হায় রে হৃদয়।···

* * * *

* *

জয়মল শেঠের সঙ্গে ওর প্রথম আলাপ এক হিন্দুমহাসভার অধিবেশনে—কলকাতায়ই। সেখানে ওর মুখে মীরার ভজন শুনে শেঠজি মুগ্ধ হয়েছিলেন। তারপরে ওকে নিয়ে আসেন নিজের অট্টালিকায়। কিন্তু সেখানে গান ভালো হ'লেও গান গেয়ে অসিত তৃপ্তি পায় নি। কী ক'রে পাবে? এ-আবহে ওর মন কেমন যেন আড়ষ্ট বোধ করে। শেঠজি সেটা বুঝেছিলেন। তাই হয়ত আজ পারিষদ বা সভাসদ জড়ো করেন নি ডেকে। তার অবশ্য কারণ ছিল—যদিও অসিত সেটা জানত না। আজ শেঠজি ওকে ডেকেছিলেন প্রধানত গান শুনতে নয়—অন্য উদ্দেশ্যে।

প্রকাণ্ড বৈঠকখানায় পুরু গদিওয়ালা ফরাসে ওঁকে বসিয়েই শেঠজি আলাপ সুরু করলেন অত্যন্ত স্নিগ্ধ সুরে,আসতে এত দেরি কেন জিজ্ঞাসাবাদ পর্যন্ত করলেন না।

এতে অসিত আরো কুণ্ঠিত বোধ করে—প্রায় অনুতাপের কাছাকাছি। ওর মন থেকে মুছে যায় শেঠজির রাজকোষের অপর্যাপ্তির কথা মনে হয় শুধু ওঁর নানা গুণের কথা—অমায়িকতার, ধর্মালুতার, সচ্চরিত্রতার, শ্রমশীলতার, সর্বোপরি—বদান্যতার। ভাবতে ভালো লাগে যে, ভারতে এত দান আর কোনো ক্রোরপতিই করে নি অদ্যাবধি। ভারতের কার্ণেগি—বটেই তো। মনে পড়ে যক্ষের কাছে যুধিষ্ঠিরের উক্তি: "দানং মিত্রং মরিষ্যত:"—"মুমূর্ষুর একটিমাত্র মিত্র—দান।"

* * * *

* *

শেঠজি সোজা মানুষ—দুএকটি ফালতো কথার পরেই এলেন ওঁর বক্তব্যে, জানতে চাইলেন হিন্দু সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর অতিথির ধারণা কী। এতে অতিথির বুকে একটু বল আসে। কারণ আশ্রমে কয়বৎসর নির্জনবাসের ফলে ওর আর কিছু না হোক অন্তত হিন্দু শাস্ত্রগুলো একটু নেড়ে চেড়ে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। ফলে ও বুঝতে পেরেছিল যে বিবেকানন্দ অত্যুক্তি করেন নি যখন তিনি বলেছিলেন যে, ভারতের অবনতির হেতু ধর্ম নয়—তামসিকতা। আরো বুঝেছিল একটা কথা: যে, যারা অধ্যাত্ম বলতে বোঝে আচার তারা আর যাই হোক না কেন—গূঢ়দর্শী নয়। আচারের নামডাক ধুমধাম জ'মে ওঠে তখনই যখন অধ্যাত্মবিদ্যার সাধনা জনশ্রুতি মতন হ'য়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, ভাগবত উপনিষৎ মহাভারত প্রভৃতির অজস্র উক্তি বিচার উপমা কথিকা প্রভৃতি পড়তে পড়তে ও অভিভূত হয়ে পড়ত সেই জ্ঞানগরিমার কথা ভেবে যার এমন শাশ্বত প্রকাশ হ'তে পারল হিন্দুর আপ্তবাক্যে। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে সত্যিই খেদ হ'ত—কেন এতদিন ক্যাণ্ট হেগেল কার্লমার্ক্সের ছেলেমানুষি গবেষণা নিয়ে এত সময় নষ্ট করেছে অকারণ। শেঠজিকে বলল ও এসব কথা যথোচিত উৎসাহের সঙ্গেই। সবশেষে বলল ওর গুরুদেবের কথা—শেঠজির কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তরে।

ওখানে ছিল শেঠজির এক বন্ধু। সে ধাঁ ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে বসল আশ্রমে ও কী ভাবে থাকে—ওঁর নিজের সম্পত্তি টম্পত্তি কিছু আছে কিনা। ওকে বলতে হ'ল—না, যদিও এসব

বলতে সংকোচ হয়। কিন্তু ওরা বাঙালি নয়—টাকাকড়ির কথা খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করতে ওদের বাধে না একটুও।

শেঠজি শুনেছিলেন লোকমুখে যে অসিত আজ নিঃস্ব। তবু বোধহয় এবিষয়ে ওঁর একটু সন্দেহ ছিল। তাই হয়ত তিনি টিপে দিয়ে ছিলেন তার বন্ধুকে এবিষয়ে নিশ্চিত হ'তে।

এর পরে তিনি সেদিনকার ভজনটি লিখে নিলেন: "হম ঐসে দেশকে বাসী হৈঁ।" শেষে বললেন: "একটি মীরার ভজন যদি শোনান।"

গাইল ও "প্যারে দরশন দীজো আয়—তুম বিন রহ্যো ন জায়।" শেঠজির শুকনো চোখ চিকিয়ে উঠল অশ্রু-আভাসে। অসিত আজ প্রাণ দিয়েই গেয়েছিল—বেদনার সুরে ওর হৃদয়ের তার আজ বাঁধা, তাই কণ্ঠে ওর সহজেই জেগে উঠল ব্যাকুলতা। বিশেষ যখন গাইল:

কোঁ্যা তরসাবো অন্তরযামী ?
আয় মিল্যো কিরপা কর স্বামী।
মীরা দাসী জনম জনমকী
পড়ী তুমারে পায়।
তুম বিন রহ্যো ন জায়॥

গানের মধ্যে দিয়ে মূর্ত হ'য়ে ওঠে ওর কতদিনের বেদনা, কত আঁধারে-ঘুরে-মরা, কত সোনামুঠির-ধুলামুঠি-হওয়া—বিরহ বেদনা স্বপ্নভঙ্গ—সে-ইতিহাস মুখে যায় না বলা—শুধু গানেই ফোটে সে-গভীর তৃষ্ণা যে যুগযুগান্তর ধ'রে জানিয়ে এসেছে তার

একটি মাত্র নিবেদন: আমাকে নাও, গ্রহণ ক'রে ধন্য করো, জন্ম জন্ম ধ'রে আমি পথ চেয়ে আছি শুধু তোমারি—আর কারো নয়, তুমি অন্তর্যামী, জানো তো সবই, তবু কেন প্রভু করো না কৃপা, দাও না দেখা? তুমি কি জানো না জল বিনা কমলের ব্যথা, চন্দ্র বিনা রজনীর:

"জল বিন কমল চন্দ বিন রজনী"

জানো না কি দিনে থাকে না অন্নে রুচি—রাত্রে আসে না শয়নে নিদ্রা?—

"দিবস ন ভূখ নীদ নহি রয়েন"

তবু কেন তুমি আশাপথ চাওয়াও প্রিয়তম? তুমি যদি না আসো তবে কী নিয়ে থাকবে মানুষ এই তুচ্ছতার জগতে? গাইতে গাইতে যখন মনে হয় ছায়ার খেদ: "বাঁচতে ইচ্ছে করে না এ-জগতে"—তখন মনে হয়: কত সত্যি কথা: কিসের জন্যে বাঁচবে মানুষ যদি বাঁচার কোনো অর্থ না থাকে, চলবে মানুষ কিসের তাগিদে যদি পথের শেষে অমৃত না থাকে তার সব শ্রান্তি হরণ করতে, সব দুঃখ সার্থক করতে? গাইতে গাইতে ওর মনে ছিল না গানের কথা, পদের কথা, সুরের কথা: শুধু হৃদয়ের অন্ধকার উঠল বেজে আলোর স্পন্দনে, ক্ষুধা রূপ নিল সুধার—সুর ও কথার মিলনে: শুধু ব্যাকুলতা—ঠাঁই দাও পায়— আর দেরি সয় না যে। মনে পড়ে, গাইতে গাইতে, কালই সন্ধ্যায় ছায়ার অপরূপ কণ্ঠের সেই প্রাণকাড়া ডাক:

"এখন বড় শ্রান্ত আমি ও মা, কোলে তুলে নে না।"

শেঠজি অনেকক্ষণ কথা কইতে পারলেন না। পরে বললেন: "আপনি কবে বাংলা দেশে ফিরে আসবেন বলুন।"

"কেন এ প্রশ্ন—হঠাৎ?"

"আপনাকে আমরা চাই। এ-রকম ভজন গাইবে আর কে—আপনি ছাড়া?"

হায় রে অভিমান! এত বুঝে এত দেখে এত ঠেকে তবু প্রশংসায় উৎফুল্লতা—দশ বৎসর যোগসাধনার পরেও? মনে পড়ে গুরুদেবের তিরস্কার: "শিল্পীর পক্ষে চলতে পারে প্রশংসায় পুলকিত হওয়া—কিন্তু যোগীর মানায় না করতালিপ্রীতি, নটভঙ্গিমা। সে গাইবে শুধু আত্মনিবেদনের তৃষ্ণায়—কারুর স্তবস্তুতির নৈবেদ্য পেতে নয়—সব নৈবেদ্য শুধু তাঁর প্রাপ্য যাঁর পদধ্বনিতে গানের জয়ধ্বনি। গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে।"

শেঠজি ওকে নিরুত্তর দেখে বললেন: "চুপ ক'রে যে? কবে আসছেন ফিরে আমাদের মধ্যে?"

অসিত বলল: "আমার সময় হয় নি ফিরে আসার।"

"কেন?"

"অভিমান—অহঙ্কার প্রবল। চিত্তশুদ্ধির দেরি আছে।"

"অভিমান কি যায় নির্জনে বাস করলেই? সবার মাঝে থাকাই তো সব চেয়ে বড় সাধনা নিরভিমান হবার—চিত্তশুদ্ধির বেলায়ও ঐ কথা নয় কি?"

এ-ধরণের কথা ও কতবারই যে শুনল আশ্রম থেকে এসে! প্রথম প্রথম একটু অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠত এ সব শুনে কিন্তু আজকাল

আর মনে দাগও কাটে না এ ধরণের তিরস্কারে। তবে কিছু একটা না বললেও নয়, তাই বলল নিরুত্তাপ সুরে: "লক্ষ্য সবারই এক—কিন্তু তাই ব'লে সাধনা এক নয়। পরমহংসদেবের উপমা আশা করি জানেন: মা কোনো ছেলেকে পরিবেষণ করেন পোলাও কালিয়া, কাউকে ডালভাত, কাউকে সাগুবার্লি—যার পেটে যা সয়।"

"জানি। কিন্তু আপনার—"

"আমার আশ্রমে থেকে সাধনা ভিন্ন পথ নেই।"

"কে বলল?"

"গুরু।"

"ও।" একটু পরে শেঠজি বললেন: "কিছু মনে করবেন না —কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব এখনো পাই নি: আশ্রমে নির্জন-সাধনা বিনা কি আত্মপরিচয় হয় না—জনসমাজে থেকে কর্ম সাধনার মধ্যে দিয়েই নির্মল নিরভিমান হওয়া যায় না কি?"

"ঐ তো বললাম শেঠজি, কারুর কারুর পক্ষে হয়ত এ সম্ভব যদিও কর্মের মধ্যে দিয়ে পূর্ণজ্ঞান লাভ হয় কি না সে-সম্বন্ধে আমার এখনো সংশয় আছে। তবে এটা জানি যে ভগবানে পূর্ণ আত্মসমর্পণ বড় কঠিন হ'য়ে ওঠে যদি নির্জন সাধনা ছেড়ে জনতার মাঝেই অষ্টপ্রহর কাটাতে হয়।"

"আপনার মতন আধার যদি কঠিন কাজ দেখে পেছোন তবে সে কাজে এগুবেন কাঁরা?"

প্রবর্ধমান আত্মপ্রসাদকে জোর ক'রে দাবিয়ে রেখে অসিত বলে: "দেখুন শেঠজি, আমাকে এই যে বললেন আমি বড় আধার

এতেও আমার অভিমান আত্মপ্রসাদ খোরাক জোটায়। তাতে আমার ক্ষতি হয়। তাই তো বলছিলাম যে নিষ্কাম কর্মযোগের অধিকার আমার নেই—অন্তত এখন পর্যন্ত হয় নি।"

শেঠজি কী বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। অসিতই ফের কথা কইল: "দেখুন, আমাকে মামুলি দীনতাপন্থী ভেবে ভুল করবেন না। আমার পক্ষে কর্মযোগ বর্জনীয় হ'য়েছে তো আরো এই জন্যেই।"

"কী?"

"আমি অত্যধিক আত্মাভিমানী ব'লে। আমি নিজেকে কবি ব'লে জানি, গুণী ব'লে জানি—আরও কত কী। এ ভাবে যে 'আমি আমি' করে সে কী ক'রে কর্মসাধনায় ব্রতী হবে বলুন তো? তবু কবি গুণী শিল্পী ব'লে যে-অভিমান তার এই একটা বাঁচোয়া যে এ-অভিমানের কাটান্ আছে সাধনায়। কিন্তু আমি বড় সাধক এ-অভিমানের সে-কাটান্ও নেই। তাই আমি বলছিলাম আমাকে বড় আধার বা বড় সাধক বলবেন না। কারণ আমি জানি যে বড় গুণী বড় কবি বড় শিল্পী হওয়া আর বড় সাধক বড় যোগী বড় সন্ন্যাসী হওয়া এ দুই এক বস্তু নয়। যোগি-ঋষির লক্ষ্য যে-আকাশে তার দিশাও পায় কবি-শিল্পীর দল।"

শেঠজি একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন: "কিন্তু যখন ধরুন এ-অভিমান দূর হবে তখন? আমাদের মধ্যে ফিরে আসবেন তো?"

"যদি গুরু বলেন।"

"তিনি কি চান কর্ম?"

"নিশ্চয়ই। তিনি বারবারই বলেছেন যে আধ্যাত্মিকতা পূর্ণাঙ্গ হ'তে পারে না যদি না কর্মকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা যায়। অবশ্য আত্মকর্ম ব'লে না, এমন কি পরার্থে কর্ম ব'লেও না—তাঁর কর্ম ব'লেই। আপনি তো নিষ্ঠাবান হিন্দু—জানেনই গীতার বিধান:

যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে।

কর্মযোগী হ'ল সে-ই যে কর্ম করে আসঙ্গ ত্যাগ ক'রে—শুধু আত্মশুদ্ধির জন্যেই।"

শেঠজি হঠাৎ কথার মোড় ফিরিয়ে দিলেন:

"একটা প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে কিছু যদি মনে না করেন। আপনি একসময়ে আমেরিকা যেতে চাইতেন—এখন চান কি? মানে, যুদ্ধের পরে অবশ্য।"

"হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?"

"কারণ আছে। যদি চান যেতে কখনো, আমাকে স্মরণ করবেন?"

অসিত হাসল একটু, বলল: "তা বলতে পারি নে। কারণ যে-অসিত এক সময়ে আমেরিকা যেতে চাইত আর যে-অসিত আজ আপনার সঙ্গে আলাপ করছে তারা এক লোক নয়।"

"মানে?"

"মানে, আপনাকে স্মরণ করার ভারও এখন আমার নয়। তবে যদি গুরুদেব করেন—অর্থাৎ আমাকে আদেশ দেন যেতে—তাহ'লে যেতে পারি, নচেৎ নয়।"

শেঠজি যেন একটু ক্ষুণ্ণ হলেন, বললেন: "হিন্দুধর্মের ওদেশে প্রচার, এটা কি একটা করণীয় কাজ ব'লে আপনার মনে হয় না?"

"আমি ওধরণের কোনো ইঙ্গিত করি নি শেঠজি। তবে—"

"থামলেন কেন ? "

"বললে পাছে আপনি ভুল বোঝেন। "

শেঠজি হাসলেন : "এই মাত্র গীতার কথা বললেন, তাতে বলে নি কি—কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ?"

অসিত একটু অপ্রতিভ হেসে বলল : "নিয়েছেন আমাকে এক-হাত—মানছি। তবে এটা মনে রাখবেন যে ওটা হ'ল আদর্শ, অর্থাৎ যোগস্থ পুরুষের কর্মভঙ্গি। কিন্তু আমি তো যোগসিদ্ধি লাভ করি নি।"

"তাতে কী ? আমার জিজ্ঞাস্য ছিল ওদেশে হিন্দুধর্মের প্রচার কি একটা ভালো কাজ নয় ?"

"ঐ তো। ভালো মন্দ বিচার করতে পারে কে ? যে জ্ঞানী সে। কিন্তু আমার যে সে-জ্ঞানই হয় নি শেঠজি—আমি অর্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু—কিন্তু জ্ঞানপ্রতিষ্ঠ তো নই।"

শেঠজির মুখের মেঘ কেটে গেল, বললেন হেসে : "আপনি যতই নম্রতা করুন অসিতবাবু, আপনি যে ঠিক অজ্ঞানের মতন কথা বলেন না এ নিশ্চয় আপনার নিজের কাছেও অগোচর নেই। অন্তত কথাগুলি অপনার বেশ বিচক্ষণের ম'ত—গোছালো।"

অসিতও হাসল : "ঐ তো হয়েছে ফ্যাসাদ শেঠজি। ছেলেবেলা থেকে সবচেয়ে বেশি চর্চা করেছি ধ্বনির—বাক্যে, কাব্যে, সুরে। কিন্তু বিশ্বাস করবেন গুছিয়ে কথা বলাটা একটু অভ্যাস হ'য়ে গেলেও—যা বলি সরলভাবেই বলার চেষ্টা করি, ঘুরিয়ে না।"

শেঠজি একটু হেসেই গম্ভীর হ'য়ে গেলেন, বললেন : "আপনার নামে অনেক নিন্দাই আমার কানে পৌঁছেছে অসিতবাবু, কিন্তু আপনি 'অসরল' এমন অপবাদ শুনি নি কোথাও। আর আপনার গতিবিধির আমি একটু খবর রাখি—আজ থেকে নয়, অনেকদিন থেকে।"

অসিত একটু আশ্চর্য হ'ল শুনে. বলল : "কিন্তু আরো একটু খবর নিলে হয়ত আরো অনেক কিছু কানাঘুঁষো পৌঁছবে আপনার কানে, কে বলতে পারে ?"

শেঠজির সুরে স্নিগ্ধতা দেখা দিল : "তা পৌঁছতে পারে—কিন্তু তাতে কিছু আসবে যাবে না।"

"কী জন্যে—জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?"

"আমি একটু মানুষ চিনি—" শেঠজি হাসলেন—"তাছাড়া আপনাকে চেনা খুব শক্ত নয়।"

"একথার একটু ভাষ্য চাই।"

শেঠজি হাসিমুখেই বললেন : "এইবার আপনি একটু ভুল করলেন জ্ঞানী হ'য়েও। সরলতা আপনার স্বধর্ম ব'লেই যে মন্ত্রগুপ্তি আর কারুর স্বধর্ম হ'তে পারে না একথা ধ'রে নিলেন আগে থেকেই।"

অসিত ওঁর হাসিতে যোগ দেয়।

হাসি থামলে শেঠজি মুখ নিচু ক'রে একটু ভাবলেন তারপর অসিতের পানে চেয়ে বললেন : "আপনার আর দেরি ক'রে দেব না—আপনার ছাত্রীর কাছে তো বিদায় নিতে হবে। আমার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল ব'লেই আপনার উপর একটু জুলুম করলাম—কিছু মনে করবেন না।"

অসিত কুণ্ঠিত হ'য়ে উঠল, বলল: "অমন কথা বলছেন কেন শেঠজি? আপনার মতন ধার্মিক মানুষের সঙ্গ কি আমার কাছে অরুচিকর হ'তে পারে মনে করেন?"

এবার শেঠজির সংকুচিত হবার পালা, বললেন: "ধার্মিক এত বড় পদবী আমি পেতে পারি না। তবে হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি যে জগতের আজ বড় দুর্দিন—আর এ-দুর্দিনে একমাত্র হিন্দুধর্মের মহাবাণী পারে দিশা দিতে।—কিন্তু এ বিষয়ে পরে কোনোদিন আলোচনা করা যাবে—হয়ত আপনি ঠিকই বলছেন—হয়ত প্রচারের সময় এখনো আসে নি।"

অসিত উঠবার উপক্রম করতেই শেঠজি বললেন: "কেবল একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, যদি কিছু মনে না করেন।"

"বলুন না—" বলল অসিত স্নিগ্ধ কণ্ঠে—মানুষটিকে এত ভালো ওর কোনোদিন লাগে নি—কোথায় যেন হয়েছিল একটা ছোঁয়াছুয়ি···

"আমাকে আপনার বন্ধু মনে করবেন। আর—মনে করবেন না কিছু—আপনি তো আজ নিঃস্ব। যাতায়াতের পাথেয় আছে তো?"

"আছে শেঠজি?"

"অন্য কোনো দরকার?"

"আমার দরকার সামান্যই। সহজেই যোগাড় হ'য়ে যায়।"

"কিছু উপহার দেবার ইচ্ছা। ভূষণ না হোক অন্তত বসন?"

"দেখছেন তো পীতবাস—এতে ক'রে ধোপার খরচটা পর্যন্ত বেঁচে যায়। সুতরাং।"

শেঠজি একটু যেন ক্ষুণ্ণ হলেন: "সব তাতেই 'না' করলেন আজ। আচ্ছা ধরুন আপনার গুরুদেবকে যদি কিছু প্রণামী দিতে চাই ?"

অসিত হেসে বলল: "তাহ'লে কিন্তু 'না' বলব না—সাবধান !"

"ধন্যবাদ। তাহ'লে দেখছেন টাকার আপনাদেরও দরকার।"

"একটা আশ্রম যখন স্থাপন করা হয়েছে তখন আশ্রমবাসীদের জন্যে টাকার দরকার হবে না—এ কোন্ দিশি কথা শেঠজি ? যোগার্থী ব'লে কি আমরা বায়ুভুক ঠাউরে ব'সে আছেন ?"

"না, অতটা ধার্মিক এখনো হই নি। তবে কি জানেন ? আপনার গুরুদেব বা তাঁর আশ্রমের যোগার্থীদের সম্বন্ধে বেশি কিছু তো জানি না।"

"কিছু মনে করবেন না শেঠজি, যদি বলি যে এজন্যে অপরাধটা হয়ত গুরুদেবের নয়।"

"একেবারেই নয় কি ? তিনি কিছু তো জানাতে পারেন—মানে বাইরের জগতকে।"

"ঐখানে ফের মুস্কিলে ফেললেন। গুরুদেবের কাছে শুনেছি—পরমহংসদেবও বলতেন—ফুলের কাজ নয় বাইরের জগতকে খবর পাঠানো যে সে ফুটেছে।"

"হুঁ"—শেঠজি একটু চুপ ক'রে রইলেন তার পরে বললেন: "কিছু মনে করবেন না—তর্ক করতে আমি ভালোও বাসি না, সেজন্যে আপনাকে ডাকিও নি আজ। তবে আমার মনে হয় ধর্মের উপলব্ধিকে একটু বাইরে চিনিয়ে দেওয়া দরকার। হিন্দু-

মুনি ঋষিরা যে জ্ঞানের মণি কুড়িয়ে গেছেন তার আলো চিরকাল কি গা-ঢাকা হ'য়েই থাকবে?"

"কিন্তু তাঁরা নিজেরাই কি বলেন নি যে ধর্মের গভীর তত্ত্ব সব গুহাবাসী?"

"একসময়ে হয়ত তা-ই ছিল—কিন্তু এখনো কি সে-গুহার মুখের পাথর খুলবার সময় হয় নি?"

"একথা আপনার হয়ত সত্যি—কেন না গুরুদেবের মুখে শুনেছি যে যা এক সময়ে ঢাকা ছিল এখন ক্রমশ প্রকাশ হবে কেন না যুগধর্মের এ একটা দাবি। কিন্তু আমার একটা কথা মনে হয় প্রায়ই। আপনারা, মানে যাঁরা কর্মবীর তাঁরা, প্রায়ই ভাবেন সত্যের প্রকাশ বুঝি কেবল একটিমাত্র পথে—আত্মবিজ্ঞপ্তির। কিন্তু এই কথাই কি সত্য শেঠজি? কোনো মহৎ উপলব্ধির আগুনকে কি ছাই চাপা দিয়ে রাখা যায়?—গুহার মুখের পাথর খুলবার কথা বলছিলেন, কিন্তু বিবেকানন্দ কি বলেন নি গুহায় ব'সে একটি মহৎ চিন্তা করলেও সে বিশ্বে ব্যাপক হবেই জয়ঢাক না পিটলেও?"

"জানি। কিন্তু আমার তবু মনে হয় যে শুধু গুহায় ব'সে চিন্তা ক'রে জগতের যেটুকু হিতসাধন করা যায় এযুগে তার চেয়ে বেশি শক্তির আবাহন চাই—প্রকাশ্য জগতে। মানে, বড় উপলব্ধি-দের আর পর্দানসীন ক'রে রাখলে চলবে না—তাদের শক্তি ও সত্য দুইই বিশ্বজগৎকে বিলোবার সময় এসেছে। নৈলে ধর্ম বাঁচবে না।"

অসিত বলল: "শুনুন শেঠজি—তর্ক করতে আমিও ভালোবাসি না আজকাল—যদিও এক সময়ে বাসতাম। কারণ এখন আমার কী মনে হয় জানেন?"

"বলুন।"

"আমার মনে হয়—" বলে অসিত থেমে থেমে—"যে ধর্ম যদি সত্যপ্রতিষ্ঠ হয় তবে তাকে কেউ মারতে পারে না। আমাদের মহাভারতে একটি গভীর রূপক মনে পড়ল। পুরাকালে বৃত্রাসুর যখন গতাসু হলেন তখন তার কালকেয় দৈত্যসামন্তরা লুকোলো সমুদ্রে। সেখানে তারা পরামর্শ আঁটতে লাগল কী ক'রে জগৎ ধ্বংস করা যায়। অনেক দেখে ও ঠেকে তারা টের পেল একটি গভীর সত্য যার হদিশ আমরা আজ হারিয়েছি। সে সত্যটি এই যে জগৎ টিঁকে আছে অজ্ঞাত তপস্বীদের অদৃশ্য তপোবলেই। কাজেই—বলল তারা—জগতের উচ্ছেদ করতে হ'লে আগে নির্মূল করতে হবে—এই যত-নষ্টের-মূল তপস্বীদেরকে। তাই শেষটায় তারা রেজলুশন পাশ করল যে দিনের বেলায় তারা থাকবে সমুদ্রে লুকিয়ে—আর রাতের বেলা উঠে এসে মটকাবে মুনিঋষিদের ঘাড়।"

শেঠজি মৃদু হেসে বললেন: "জানি—তাই না অগস্ত্য মুনি চাল চাললেন এক গণ্ডূষে সাগর শুষে নিয়ে—যার ফলে নির্মূল হ'ল ওরাই।"

অসিতও হাসল, বলল: "হ্যাঁ। কিন্তু কথাটা তুললাম—শুধু আপনাকে এই গভীর সত্যটির কথা মনে করিয়ে দিতে যে,

ভারত আজও বেঁচে আছে শুধু এই প্রচ্ছন্ন তপস্বীদের অদৃশ্য তপোবলে। একথা গুরুদেবের মুখেও বহুবার শুনেছি যে চেতনার বিকাশে বুদ্ধির সাধনাও একটা মস্ত তপস্—সত্য, কিন্তু তাই ব'লে বিকাশ কিছু এখানে এসেই থেমে যায় নি। তবে হয়েছে কি, বুদ্ধির চৌহদ্দির মধ্যে থেকে থেকে বুদ্ধির চেয়ে আরো বড় যেসব চেতনা তাদের বিরাট খাসতালুকের খবর আমরা বিশেষ কিছু জানতে পারি না—বড় জোর একটু আধটু আভাস পাই—তাও ক্বচিৎ। কিন্তু তপস্বীরা জানতে পারেন এ-নেপথ্যতত্ত্ব তাই তাঁরা যে জগতের হিতসাধন করেন সে শুধু বুদ্ধির স্বভাব-সঙ্কীর্ণ বাঁধা শড়কে নয়। বুদ্ধিমন্তরা এইটেই বোঝেন না—তাঁদের বাণী হ'ল nothing like leather আর কি, বুঝলেন না? এগিয়ে যেতে চান না তাঁরা—তাই একসময়ে যা তাঁদের সহায় হয়েছিল—কিনা বিচার বুদ্ধি ওরফে লৌকিক জ্ঞান—সে-ই হ'ল তাঁদের বন্ধন যখন সে বলল আমার ইশারা মেনে না চললে মানুষ ডুববে। বিধাতা বোধহয় সে-সময়ে অলক্ষ্যে হেসেছিলেন—কারণ দেখছেন তো আজ রণতাণ্ডবে বুদ্ধির দিশেহারা অবস্থা। এ সময়ে—বলেন গুরুদেব প্রায়ই—একদল সাধক অন্তত থাকা দরকার যারা বুদ্ধির বেড়াজাল কাটিয়ে চাইবে ওর চেয়ে বড় শক্তি—যাকে তপস্ ব'লে চিনেছিল ঐ কালকেয় দৈত্যেরা। তাই তারা একবাক্যে বলেছিল 'লোকা হি সর্বে তপসা ধ্রিয়ন্তে তস্মাৎ তরধবং তপসঃ ক্ষয়ায়' —ত্রিভুবনকে ধারণ ক'রে আছে তপস কাজেই সব আগে চাই তপসের ক্ষয়। বেশ কথা—কিন্তু কী উপায়ে? না,

'যে সন্তি কেচিচ্চ বসুন্ধরায়াং তপস্বিনো ধর্মবিদশ্চ তজ্ঞাঃ
তেষাং বধঃ ক্রিয়তাং ক্ষিপ্রমেব তেষু প্রনষ্টেষু জগৎ প্রনষ্টম্—
পৃথিবীতে যেখানে দেখবে তপস্বী ধার্মিক তত্ত্বজ্ঞ তৎক্ষণাৎ বধ করবে—কেন না তারা ধ্বংস হ'লে জগৎও ধ্বংস হবেই হবে।"

"কেবল," বলে অসিত থেমে, "যুগে যুগে আসুরিক মায়া ভোল বদ্‌লায়। কখনো এরা মারে হাতে, কখনো ভাতে। শুধু তাই নয়, অনেক সময়েই এরা শক্তির মদ খাইয়ে ঘটায় মানুষের মতিভ্রম—যেমন আজ ঘটাচেছ্ বিজ্ঞানের সর্বনাশা জয়ঢাক বাজিয়ে। তাই না মানুষ ধ্বংস নিশ্চিত বুঝেও তবু ঐ বিজ্ঞানের দোরেই মাথা খুঁড়ে দীক্ষা চাইছে আত্মঘাতের! বুদ্ধির ঘটেছে অপঘাত, তাই সে আজ লোভের ভূত হ'য়ে চেপেছে মানুষের ঘাড়ে—অথচ অদৃশ্য ভাবে। কাজেই মানুষের ভুতুড়ে রাক্ষুসে প্রবৃত্তির না মিলছে নিদান, না চিকিৎসা। এইজন্যেই—বলেন গুরুদেব—বুদ্ধির চেয়ে বড় যেসব ভাগবত শক্তি তাদেরকে দিতে হবে চিকিৎসকের পদ, দিশারির পদ, নৈলে সভ্যতা বাঁচবে না। কিন্তু বললে হবে কি, ঐ যে বললাম, যখন বুদ্ধিরই ঘটে ভুতুড়ে মতিভ্রম তখন জ্ঞানের কথায় কান দেয় কে? নৈলে একবারটি ভেবে দেখুন শেঠজি", বলতে বলতে ও উৎসাহিত হ'য়ে উঠে ব'লে চলে: "আপনার মতন খাঁটি ধার্মিক মানুষের মুখ দিয়েও কখনো বেরুত এমনতর অদ্ভুত কথা যে এই চলতি লৌকিক বুদ্ধির জানাশোনা পথ ছাড়া অন্য পথে মানুষের হিতসাধন করা যায় না—অতএব সকলেই

মাথা মুড়োক এক গোয়ালে? কিম্বা ধরুন, খানিক আগেই বলছিলেন না যে, গুরুদেবের বা আশ্রমের সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না—এটাই কি কম আশ্চর্য, বলুন দেখি? অবশ্য আশ্চর্য হতাম না যদি আপনি তাঁকে মহাপুরুষ ব'লে স্বীকার না করতেন—কিন্তু মহাপুরুষ মহাযোগী ব'লে তাঁকে সনাক্ত করতে পারা সত্বেও আপনি বলছেন যে তাঁর যোগলব্ধ জ্ঞানকে কাজ করতে হবে আপনাদের আংশিক ঝাপসা-দৃষ্টিরই নির্দেশপথে—একবার শান্ত হ'য়ে ভেবে দেখুন তো—এও কি ঐ আসুরিক মায়ারই খেলা নয়? দুঃখের কথা বলব কি শেঠজি; আমার যে-স্নেহের পাত্রীটির জন্যে আমার এখানে আসা সে-ও জ্ঞানের তত্ত্ব কিচ্ছু না জেনে তবু বলে ভগবানের করুণা কই? কী ক'রে তাকে আপনি বোঝাবেন বলুন যে, যাকে বলি আমরা ঘরোয়া বুদ্ধি তার আলোয় দেখা যায় না সেই বিরাট জ্ঞানকে করুণাকে যে তার অতিকায় কলকাঠি দিয়ে চালাচেছ কোটি কোটি জগৎকে? অথচ ভেবে দেখুন অমন চমৎকার মেয়েকে এত ভালোবেসেও যদি বিশ্বাস করাতে না পারা যায় এই কথাটি যে ভগবান আছেন ও তার আদেশ মেনে চলাই জীবনের সব চেয়ে বড় সাধনা—তাহলে কী ক'রে বোঝাবেন আপনি দাম্ভিক বিচক্ষণদের সভায় শুধু দুচারটে প্রচারক পাঠিয়ে—যে, নাস্তিকতার পথে মানুষের সর্বনাশ নিশ্চিত?"

বলতে বলতে অসিত উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠেছিল, হঠাৎ থেমে লজ্জিত হ'য়ে বলল: "কিছু মনে করবেন না—ঝোঁকের মাথায় যেন একটা লেকচার মতনই দিয়ে ফেললাম মনে হচেছ। এরকম

কুকর্ম আমি কৃচিৎ করি বিশ্বাস করবেন—তবে হয়ত মনটা আজ একটু খারাপ আছে ব'লেই—"

শেঠজি বাধা দিয়ে বললেন হেসে : "আমিও বলি—বিশ্বাস করবেন—আমার খুব ভালো লাগছিল আপনার উৎসাহে-ভরা কথা শুনতে, কারণ এই দিনদুনিয়াকে আমি আপনার চেয়ে একটু বেশি দেখেছি এটুকু হয়ত বলতে পারি—তাই জানি নাস্তিক্যবুদ্ধি আমাদের কী সর্বনাশ করছে—যাকে আপনি বলছেন আসুরিক মায়া। কিন্তু একথাও বোঝাতে পারেন কেবল তাঁরাই যাঁরা মনেপ্রাণে আস্তরিক, আচরণে ত্যাগী, স্বভাবে শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু এযুগে এরকম মানুষ খুব সুলভ নয় অসিত বাবু," একটু হেসে : "হ'লে আপনার মতন লোকের চাহিদা হয়ত একটু ক'মে যেত—কিন্তু হিন্দুর দুঃখের রাত পোহাতে এত দেরি হ'ত না"।

ব'লে শেঠজি দাঁড়ালেন উঠে অসিতের সঙ্গে সঙ্গে। তারপর বললেন পাশের একটি লোককে—বোধহয় সেক্রেটারিই হবে—"এঁর ঠিকানাটা লিখে নাও—ইনি আজ রাতের গাড়িতেই চ'লে যাচ্ছেন—তাই ভুল না হয়—বিকেলের মধ্যেই ওঁর হাতে পৌঁছে দেবে দুহাজার টাকা—বুঝলে তো ?"

"জো হুকুম"।

* * * *

* *

মোটরে ফিরবার পথে ওর কানে কেবলই বাজে শেঠজির শেষ কাতরোক্তিটি : "এযুগে মনেপ্রাণে আন্তরিক, আচরণে ত্যাগী ও স্বভাবে শ্রদ্ধাশীল মানুষ বড় খুব সুলভ নয়, অসিত বাবু।"

ভালো লাগে—কিন্তু সেই সঙ্গে অভিমানও কের মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে কেন? কেন মনে আত্মপ্রসাদ জাগে যে, ওর যে-চরিত্রপ্রভাব সেটা শুধু তরুণ-তরুণীরা নয়—বণিক জাতীয় বিচক্ষণরাও অনুভব করে? এ-ধরণের তৃপ্তিস্বাদ আগে মেলে নি ব'লেই কি? হবে। অভিমানের ফন্দি ফিকির কত—সে খোরাক চায় নানা ছদ্মবেশে, নানা পথে। সোজা শড়কে না পেলে খুঁজবে চোরাগলিতে, শিখরে না পেলে—গহ্বরে, জ্ঞানের গরিমায় না পেলে কর্মের কৌশলে, প্রকাশের নৈপুণ্যে না পেলে অপ্রকাশের গৌরবে। ও দেখেছে এ কয়বছরে স্বচক্ষে মানুষের প্রকৃতির চাতুরী কত রকম মুখোষ-প'রে তপোভঙ্গ করে—কত অচিহ্নিত পথ বেয়ে আনে অভিমানের রসদ। ওর ঠোঁটে ধারালো হাসির ঝিলিক খেলে যায়—সাধকদের মধ্যে এ-অভিমান আরো বেশি দৃষ্টিকটু ঠেকে ব'লে, অথচ তাঁরা তো কই বুঝতে পারেন না? কেউ কেউ হয়ত কারুর সঙ্গে মেশেন না, শুধু তাইতেই মনে করেন নিজেকে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সম্বন্ধী। কেউ বা বেশিক্ষণ এক আসনে ব'সে থাকতে পারেন—তাইতেই বঙ্কিমগ্রীব। কেউ অপর কারুর সঙ্গে এক আসনে বসেন না—তাইতেই ধরাকে জ্ঞান করেন সরা। কেউ হয়ত কোনোদিকেই কৃতী নন—তবু অভিমান ছাড়ে না—তাঁরা না সর্বদা সব কথাই গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা ক'রে তবে করেন—সোজা কথা না কি? কিন্তু আজ ওর এদের ব্যঙ্গ করতে ইচ্ছে হয় না—নিজের অভিমানের কীর্তি দেখে। নিষ্কাম কর্ম ও করবে কী? শেঠজি সেধে দুহাজার টাকা দিচ্ছেন এতেও অভিমান—সেই একই অশুদ্ধি কেবল একটা নতুন মুখোষ প'রে। তবে কেন আর সতীর্থ সাধকদের কটাক্ষ করা? মনে পড়ে ওর হঠাৎ

আনন্দের একটি চিঠির কথা যেটি কালই ও পেয়েছে। এই তো রয়েছে পকেটেই—বের ক'রে পড়ে ফের—এত ভালো লাগে ওর আনন্দের চিঠি—কতবারই পড়ে—

" Let us not look with judging eyes at the shells of men but, having seen our own hearts look just with eyes of pity and understanding on the pathethic struggles of those timid children, the egos of men, with phantom forms of their own ignorance and then, if we can, see (deeper still) the blissfull self beneath of whom these egos are but untaught children. All these pathetic struggles are taking place within the arms of a peace that is present in us now and at all times ".

কিন্তু যতই মনকে বোঝায় মন বোঝে কই? বিষণ্ণতা আসে শ্রাবণের মেঘের মত ছেয়ে।

কেন এমন হয়? অভিমানকে দাবিয়ে রাখা সহজ, কঠিন তাকে চিনতে পারা। মনে পড়ে যখন যক্ষ প্রশ্ন করেছিলেন কিসে সব আচ্ছন্ন, আর কী প্রকাশের অন্তরায় তখন যুধিষ্ঠির বলেছিলেন: "অজ্ঞানেনাবৃতো লোকস্তমসা ন প্রকাশতে"—অজ্ঞানই আচ্ছন্ন ক'রে রাখে—সে যে তমস। বটেই তো, তাই না মায়ার খেলায় অভিমান নিত্য খোঁজে প্রশ্রয়ের ছায়া—যাকে আনন্দ বলছে **phantom forms of ignorance**! কিন্তু কিসের প্রশ্রয়ে গ'ড়ে ওঠে এই সব

ছায়ামূর্তি—কিসের ঠেলায় করে তারা দাপাদাপি? কেন তারা শিখেও শেখে না—দেখেও দেখে না? না: শেঠজিকে ও ঠিকই বলেছে—সত্যিই তো কর্মযোগী হবার ওর সময় হয় নি। সব আগে অভিমান জয় করতে হবে না? মনে মনে জপ করে—আর না, এবার ফেরাই চাই আশ্রমে। সাধনা চাই নিরভিমান হবার। কোনো অজুহাতেই আর দেরি করা নয়—খবর্দার!

হাজরা রোড দিয়ে সবে হরিশ মুখুজ্যের রোডের মোড়ে গাড়ি মোড় নিয়েছে—প্রায় দুপুর বাজে—এমন সময়ে হঠাৎ মনে পড়ল শ্যামলীর ওখানে খাওয়ার নিমন্ত্রণ। তাই তো! ও ভুলেই গিয়েছিল একেবারে। সারথিকে বলল—না হরিশমুখুজ্যের রোড নয়—যোগেশ মিত্রের রোড। "জো হুকুম সাধুজি" ব'লে অতিভক্তি দেখিয়ে শমশ্রুল সারথি চলল ছায়াদের বাড়ি ছাড়িয়ে। চক্রধরের বাড়ির সামনে দোর খুলে সে কী সেলামের বহর! অসিত হেসে ওর হাতে দুটি রৌপ্যমুদ্রা দিতে একগাল হেসে চোস্ত উর্দুতে জিজ্ঞাসা করল অপেক্ষা করবে কি না। অসিত স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল: "না—তুমি খেতে যাও, এখান থেকে হরিশ মুখুজ্যের রোড কাছেই।"

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হাসিও আসে রাগও ধরে। কী ছেলেমানুষিই না ক'রে ফেলল সকালে—তার পরে আবার কী লেকচারই না ঝাড়ল শেঠজির সামনে! একই অভিমানের এ কী ভোল-বদল—নাবালক ও সাবালক মূর্তি!

* * * *

* *

চক্রধর ও শ্যামলী এসে ওকে প্রণাম করে যুগলে। ও কুণ্ঠিত বোধ করে ফের—এত প্রণামের ঘটা কেন রোজ রোজ—আসতে যেতে? কিন্তু কে শোনে?

"বাঃ! এত বেলফুল কোত্থেকে পেলে চক্রধর?"

শ্যামলী হেসে বলে: "জগুবাবুর বাজারে আজ হঠাৎ পাওয়া গেল মামা! আমাদের অদৃষ্ট আর আপনার হাতযশ আর কি।"

চক্রধর: হাতযশ ব'লে হাতযশ, মামা? সুধীবাবু আবার এই দেখুন না—কী সুন্দর দুটি গোলাপের মালা পাঠিয়ে দিয়েছেন। একটি আপনার—একটি ছায়ার। আর এই কার্ড নিন। সুরমাদি নিজে হাতে গেঁথেছেন—মিহিজাম থেকে গোলাপ আনিয়ে।

"কার্ড?" ব'লে নিয়েই অসিত দেখে সুধীর নাম—ওপিঠে লেখা: "যদি আজই যান সত্যি সত্যি—তবে ষ্টেশনে যাব। কেবল একটু ভেবে দেখবেন মামা, আরও দুটো দিন এখানে থাকা সম্ভব কিনা। কেন বলছি একথা—জানেনই তো।"

প'ড়েই ওর মনের মধ্যে ফের জেগে ওঠে চিরকেলে দ্বিধা—দোটানার আসক্তি। থাকবে? কিন্তু এইমাত্র মনে মনে কী প্রতিজ্ঞা করেছে শেঠজির মোটরে? এম্‌নিই হয়। শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি।

শুধু কার্ডের জন্য নয়। এই গোলাপের মালা। কী ক'রে দেবে ও ছায়াকে নিজের হাতে? একে তো সহজ অবস্থাতেই বিদায় নেওয়া কঠিন। তার উপরে মালা! ব্যাপারটা যে ধীরে ধীরে কঠিন থেকে সঙিনের কোঠায় উঠছে! অথচ সুধী যে অভিমানী! এত আদর ক'রে যে-মালা গাঁথিয়েছে সুরমাকে দিয়ে—সে-মালা

ছায়াকে না দিয়েও তো উপায় নেই। এক যদি আজ না যায় তাহ'লে হয়। কিন্তু···এইমাত্র যে সে এত ক'রে পণ নিল—

চক্রধর : এত আথাল-পাথাল কী ভাবেন বলুন তো মামা ? মুখ হাত ধুয়ে নিন—খাবার যে জুড়িয়ে জল হ'য়ে গেল।

"ভাবছিলাম কী জানিস—শেষটা কি না একটা মালার জন্যে আজ আমার ফেরা হবে না ?" ব'লে ও সংক্ষেপে জানালো চক্রধরকে ওর দোটানার কথা।

চক্রধর : তাই তো মামা। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও সত্যিই তো।

শ্যামলী (হেসে) : মামা সাধনায় বাধা যে কখন কোন্ পথ দিয়ে আসে।

চক্রধর : তোমাদের ঐ আবার লম্বা লম্বা কথা। অমন একটা মেয়ের সঙিন অসুখ—না, সাধনার বাধা। এসব শুনলে মনে হয় না কি মামা, যে ঠাকুর ওঁৎ পেতে থাকেন শুধু মানুষকে সাধনার আসন থেকে ধাক্কা দিয়ে ডিগবাজি খাওয়াতে ?

অসিত শুধু একটু হাসে—অন্যমনস্ক হয়ে।

*   *   *   *

*   *

চক্রধর খেতে খেতে বলে : "মামার মন আজ কোথায় যে ! ও মামা ! আপনার মালক্ষ্মীর হাতের এঁচড়ের ডালনাটা আজ কেমন হয়েছে বললেন না তো একটিবারও। জানেন বেচারি কত কষ্ট ক'রে এঁচড় জোগাড় করেছে আপনি ভালো-বাসেন ব'লে ?"

শ্যামলী : কী যে করো ? আজ কি মামার তরিতরকারি রান্নার তারিফ করবার মতন মনের অবস্থা ?

চক্রধর (সুধামাখা হাসি হেসে) : জানি—তবু কি জানো ?—এত কষ্ট ক'রে রাঁধলে তুমি—

শ্যামলী : থামবে তুমি ? রেঁধে-খাওয়ানোর কষ্টকে মেয়েরা যে কী নামে ডাকে সে-খবর পুরুষ মানুষ রাখবে কেমন ক'রে ?

অসিত (হেসে) : উঃ, মালক্ষ্মীর যে দেখি গুমরে আর মাটিতে পা পড়ে না।

শ্যামলী (সকুণ্ঠে) : গুমর নয় মামা, তবে মেয়েদের স্বভাব যে একটু মেয়েলি এটা সময়ে সময়ে আপনাদের একটু মনে করিয়ে না দিলে চলে কি ?

অসিত (চক্রধরকে) : আশা করি এখন থেকে মনে থাকবে ?

চক্রধর : শোনেন কেন ওদের কথা মামা ?—সব ভাঁওতা। মানি, সুধার ভাণ্ডারী ওঁরাই বটেন, কিন্তু তাব'লে কি শুধু দেবতাদের তারিফেই তুষ্ট, নাকি ? হুঁ: !—দৈত্যদের স্তবস্তুতি না পেলেও ওঁদের রাতে অনিদ্রা—দিনে ছটফটানি ! শুধু রেঁধে খাইয়েই তৃপ্তি—বটে ! মরি কী ফুলঝুরি কথা রে ! দেখেন নি তো চেয়ে শ্রীমুখের দিকে একবার—আপনি প্রতি গ্রাস মুখে তুলছেন আর ওর নীরব দৃষ্টি বলছে কাতর হ'য়ে : "কেমন রান্না করেছি বলবেন আর কবে মামা, —বেলা যে যায় !"

শ্যামলী (কাতর সুরে) : মামা !

অসিত (ধমকে ওঠে) : কী যে সব সময়ে মালক্ষ্মীকে বাণ হানিস্ !

মালক্ষ্মী আমার অমন না কি?—স্তব পাওয়ার চেয়ে যে বর দেওয়ার দিকেই তাঁর ঝোঁক না মানে কে?

শ্যামলী (মুখ টিপে হেসে): বলুন তো মামা! তবে কীই বা হবে ব'লে বলুন? গেঁয়ো যুগী ভিখ পায় না তো আর গাঁয়ে!

চক্রধর: ভুল। মামার এই গাঁয়েই জন্ম, তবু স্বয়ং শেঠজি পাঠিয়ে দেন রোল্‌স্‌ রয়েস। তবে কি না যুগীর মতন যুগী হওয়া চাই তো! বলে না—

কণ্ঠি যে পরে সে-ই বৈষ্ণব নয়:
শক্তি কি শুধু পঞ্চমকারে হয়?

অসিত: দেখ্‌ চক্রধর, অমন ক'রে বাড়াস নি আমাকে, ওতে আমার সত্যি ক্ষতি হয়—কতবার বলেছি তোদের—অথচ কিছুতেই তোরা কানে তুলবি না।

চক্রধর (উদ্দীপ্ত): সে কী মামা? সাধুকে সাধু বলব না? নইলে কি শেঠজি যে শেঠজি—

শ্যামলী: আহা যেতে দাও না গো! কিন্তু মামা, ঐ দেখুন, আসল কথাটাই হ'ল না শোনা। কী বললেন শেঠজি?

অসিত খেতে খেতে সংক্ষেপে বলল সব কাহিনী। চক্রধরের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল শুনতে শুনতে, শেষটা পারল না আর থাকতে—দুহাজার টাকার প্রণামী শুনেই চেঁচিয়ে উঠল শ্যামলীর দিকে চেয়ে: "কী? বলি নি আমি? (অসিতকে) জিজ্ঞেস করুন না ওকে মামা, আজই সকালে সুধীবাবুর সঙ্গে কথায় কথায় কী বলছিলাম। আরে বেল্লিক যোদো মোধো কেলো ভুতোর

দল। তোরা মামার নামে কলঙ্ক রটিয়ে করবি কী? জহুরি যে সে জহর চিনে নেবেই এক আঁচড়ে—

শ্যামলী: ফে—র ঐ সব কথা?

চক্রধর (কানে না তুলে): বলব না? একশোবার বলব। নিন্দুকদের ঢঙ কী আমার জানা নেই না কি? মুরদের বেলায় যাদের ভাঁড়ে মা ভবানী—তারা হিংসে ছাড়া আর কী করবে শুনি? জ্ব'লে পুড়ে খাক হ'য়ে গেল ঐ হিংসুকগুলো মামা, জানেন? স্রেফ খাক্। নৈলে কি না বলে আপনার চরিত্রের সম্বন্ধে এমন কথা যে—

শ্যামলী: কী যে হয়েছে তোমার মতিচ্ছন্ন। মামাকে ডেকে খেতে পর্যন্ত দেবে না। ও আমার কপালখানা! দেখ দেখি, যে-চাটনিটা মামা সব চেয়ে বেশি ভালোবাসেন সেই কৎবেলের চাটনিটা ছুঁলেনও না।

অসিত: ও হো! সত্যি আজ বড্ড ভুল হ'য়ে যাচ্ছে মালক্ষ্মী! (পাতে ঢেলে নেয় চাটনিটুকু)

চক্রধর: আর একটু দাও না মামাকে—তাহ'লে ভুলে যাওয়ার একটু প্রায়শ্চিত্ত হবে মামার। (শ্যামলী তাড়াতাড়ি উঠে গেল চাটনি আনতে পাশের রান্না ঘরে)

চক্রধর: যাই বলুন মামা—ওরা এবার খুব জ্বলবে।

অসিত (অন্যমনস্ক): ওরা?—কারা? (শ্যামলী এসে আর একটু চাটনি ঢেলে দেয়)

চক্রধর: কারা আবার? ঐ আপনার নিন্দে না করলে যাদের মুখে অন্ন রোচে না। আরে, এও কি কখনো হয়েছে

কস্মিন্ কালে, না কোনোদিন হ'তে পারে! তোরা কেচ্ছা ক'রে দাবিয়ে রাখবি মামাকে? যে এক কথায় পারে সব ছাড়তে—

শ্যামলী: আচ্ছা, তুমি কেবল কেবল অমন করো কেন বলো দেখি? মামাকে দাবিয়ে রাখবেন কিনি? আগুন কি ছাই চাপা থাকে, না টিটকিরিতে ঝর্না শুকোয়? শুনলে তো শেঠজি কী বললেন? শুধু বলা নয়—বাড়িতে ডেকে এনে টাকা দিতে সাধাসাধি? তাছাড়া মুখে যে যা-ই বলুক না কেন, এ তুমি নিশ্চয় জেনো যে মনে মনে বোঝে সবাই। যাকগে মামা—আপনি আবার যে-রাগ করেন—এসব বলব না আপনার মুখের সামনে—কেবল একটা কথা। সুধীবাবু আমাকে বিশেষ ক'রে ধরেছেন আজ আপনাকে বলতে আরো কিছুদিন থাকতে। বলছিলেন আপনার প্রভাব কতখানি আপনি হয়ত খবর রাখেন না—ও কী দইটা?—

অসিত: হ্যাঁ হ্যাঁ—(দুইয়ে মিষ্টি মাখতে মাখতে) একটু জল, মালক্ষ্মী! (শ্যামলী হেসে জল দিল)

চক্রধর (অসিতের দিকে উৎসুকনেত্রে তাকিয়ে): কী? তাহ'লে থাকাই সাব্যস্ত তো? আমি পাশের বাড়ি থেকে ফোন ক'রে দিয়ে আসি ছায়াদের যে আপনি আরো একমাস থাকবেন—ওরা যা খুসিটা হবে—

অসিত (জোর ক'রে): না না চক্রধর, পাগলামি করিস নে। এ-যাত্রা আমাকে যেতেই হবে। দরকার হ'লে না হয় ফের আসা যাবে।

চক্রধর : কেন মামা ? এখন—

শ্যামলী : আহা, অমন ক'রে পীড়াপীড়ি করতে নেই। মামার কি ইচ্ছে করছে না থাকতে ? বোঝো না কেন ?

চক্রধর : তোমরাও যদি গা না করো তবে মামা থাকবেন কেন শুনি ?

শ্যামলী : মামা, কী বোঝাব বলুন দেখি এমন অবুঝকে ? আপনি থাকুন এ কি আমরা চাই না ?

অসিত (হেসে) চাও ?

শ্যামলী (নতনেত্রে) : চাই, কিন্তু আমাদের সংসারের জন্যে নয়। (একটু চুপ ক'রে থেকে) এ আমার মুখের কথা নয় মামা, বিশ্বাস করবেন।

চক্রধর : কেন ? সংসার কি এতই খারাপ জায়গা না কি ?

শ্যামলী : তা কে বলছে ? কিন্তু এটুকুও কি তুমি বুঝতে পারো না যে মামাকে আমরা যেজন্যে কাছে পেতে চাই সেটাই আমরা হারাব যদি তাঁকে অষ্টপ্রহর সংসারের টাল সাম্‌লাতে হয় ? ঠাকুর সবাইকে তো শোনান না তাঁর ঘরছাড়া বাঁশি।

(হঠাৎ বাইরে হর্ণ)

চক্রধর : ও কি ! ছায়াদের মোটর না ?

শ্যামলী : বসুন বসুন—উঠবেন না—আর একটু পায়েস—মামা, লক্ষ্মীটি ! আপনাকে নিজে হাতে রেঁধে খাওয়ানোর ভাগ্যি তো খুব বেশি হয় না !

* * * *

* *

ছায়াদের মোটরে চ'ড়ে যখন অসিত রওনা হ'ল তখন ওর মনের আকাশে একটা অদ্ভুত রঙ ধরেছে। সে-রঙে শুধু আনন্দ নয় ব্যথাও উঠেছে বেজে, চমক উঠেছে জেগে।

শুধু মালক্ষ্মীর ঐ একটা কথায় "সবাইকে তো ঠাকুর শোনান না তাঁর ঘরছাড়া বাঁশি!"

বুকের মধ্যে ওর একেবারে অশ্রুসাগর উঠেছে দুলে! গর্বও হয় বৈ কি! এমন কথা এমন সুরে ফুটতে পারে এক হিন্দু মেয়ের মুখে। শুনতে ঘরোয়া, কিন্তু আসলে? ধ্বনির মূলধন বেজেই থেমে গেলে কী হবে—চলেছে যে তার রেশের সুদ অফুরন্ত। মুহূর্তের কাঁপন, কিন্তু পাষাণভাঙা নির্ঝরিণী উঠল হঠাৎ জেগে! কত কথাই যে জেগে ওঠে কল্লোলে···কত আশা নিরাশার মালা-গাঁথা, আনন্দ বেদনার আলো-ছায়া!

মন ওর ভ'রে ওঠে এক নিমেষে···অথচ সঙ্গে সঙ্গে এ কী শূন্যতার আকুলি-বিকুলি! বিচিত্র নয়? কত বড় সৌভাগ্য! সঙ্গে সঙ্গে মনে ওর গ্লানি আসে ভাবতে যে একেই ও ভাঙিয়ে খাচ্ছে! এরই নাম কি সাধনা—যার জন্যে ও ঘর ছেড়েছিল ঐ ঘরছাড়া বাঁশির ডাকে? এ-বাঁশির ডাক ওর মতন শুনতে পায় কজন? কারণ ও ঘর ছেড়েছিল তো কোনো আশাভঙ্গ স্বপ্নভঙ্গ শোকতাপের জন্যে নয়, বৈরাগী হয়েছিল শুধু সেই পরশমাণিক পেতে যার ছোঁওয়া বিনা এ জড় জীবন হয় না চিন্ময়···আর্ত আঁধার ওঠে না হেসে অশোক আলোয়। বৈরাগ্যের দুয়ারে হাত পেতে ও যে পায় নি কিছু তা-ও নয়। কত শান্তির আভাস, ভক্তির প্লাবন,

কত প্রেমের আবেগ সেই অচিনের জন্যে…কত আলোকিত উচ্ছ্বাস…অভয়ের আশ্বাস! না…ভগবানের দেখা ও পায় নি সত্য…কিন্তু স্পর্শ পেয়েছে কত ভাবে কত রূপে কত রঙে কত গন্ধে! সবার উপরে মনে পড়ে গুরুদেবের সমুদ্রগভীর প্রশান্তি অতল নয়ন…অরুণ-করুণা।

অথচ—আর এইখানেই না ওর মনস্তাপ—এ-হেন করুণার কী মূল্য দিয়েছে ও সম্প্রতি? অমৃতনিধান নিরবলম্বতা ছেড়ে বার বার ফিরে এসে আনন্দের মুষ্টিভিক্ষার জন্যে হাত পেতেছে অমৃত-হীন গৃহজীবীদের দুয়ারে—উপলব্ধির চিরসাম্রাজ্য ছেড়ে নিরুপলব্ধি পান্থশালায় এসে চেয়েছে বৈচিত্র্যবিলাস। বংশীধর যখন তাকে ঘরছাড়া বাঁশি শুনিয়েছিলেন তখন কি চেয়েছিলেন এই জাতীয় কোনো সাড়া? শুধু তাই নয়—গুরুদেবকে ও কী ব'লে এসেছিল এবার? শুধু ছায়ার শিয়রে প্রার্থনা করতেই আসছে এই কথাই নয় কি? কিন্তু তা-ই কি সে করেছে? প্রথম কিছুদিন সংকল্প বজায় ছিল বটে, কিন্তু তার পরে? কুড়োয় নি কি শুধু এর ওর তার আদর যত্ন নিজের আত্মপ্রসাদের খোরাক জোগাতে?

যদি ওর অপরাধের এখানেই সমাপ্তি হ'ত তাহ'লেও বা কথা ছিল। কিন্তু আরো কিছু হারিয়েছে ও। কত কষ্টে কত নিষ্ঠায় তবে সাধনায় মন বসে একটুখানি। আটবৎসরের নিষ্ঠায় ওর যে ঐকান্তিকতা গাঢ় হ'তে আরম্ভ করেছিল সে আজ কোথায়? কোথায় সে-নিষ্ঠা যা ওর ছিল প্রথম দিকের একাগ্রতায়? আজ ওর পাথেয় কী? ও সংসারী নয় এই বন্ধ্যা আত্মপ্রত্যয়? কিন্তু

যথার্থ বৈরাগীর যে-পাথেয়—সেই আলোকতৃষ্ণার নিবিড়তা ওর আজ কোথায়? শুধু এর ওর তার সস্তা সাধুবাদে ও কি ভুলে যেতে বসে নি যে খাঁটি সাধু যাকে বলে তা হ'তে ওর অনেক বাকি? কেবল কথা কথা কথা—সুন্দর কথা, জাঁকালো বচন, শাস্ত্রের নজির। এরই নাম কি ঐকান্তিক সাধনা যার প্রসাদে কামনার জমিতে ফলে ভক্তির ফসল, মমতার ব্যথাবনে ফোটে দয়ার আকাশ-পারিজাত?

অথচ সাধনা যে ও করে নি তাও তো নয়। লোকে যে যা-ই বলুক না কেন (মালশ্রীর কথা মনে পড়ে আজ: "কী যায় আসে?") ও তো জানে কত সংযমে, কত সতর্কতায়, কত অশ্রুজলে, নিরাশায়, বেদনায়, চিত্তদাহে তবে একটু একটু ক'রে সাধনার মরু পার হ'তে হয়। চিত্তশুদ্ধি, বাসনা-বিসর্জন, ভগবানে ভক্তি কি চারটিখানি কথা? অথচ এদিকে কোনো আন্তর সম্বলই যার নেই সে কী ব'লে লোকের দুটো শ্রুতিমধুর কথায় ভুলে ভাবতে সুরু করেছে আজ যে ছায়া সেরে যাবে শুধু সে থাকলেই? কতটুকু মানুষের শক্তি? কে কাকে বাঁচায়, কে কাকে মারে? "কথমন্যাংস্তু গোপায়েৎ সর্পগ্রস্তো যথাপরম্?" যে নিজে সাপের কুণ্ডলীতে বন্দী সে মুক্তি দেবে কোন্ দুঃস্থকে? এতদিন এত দুঃখ পেয়েও কি ও বোঝে নি মানুষ কী বিড়ম্বিত, মুগ্ধ, আর্ত? অথচ তবু এই তো খানিক আগেই ও দুলে উঠেছিল সুধীর আর্জি শুনে। কী? না ওর প্রভাব যে কত তা ও নিজেই জানে না! হায় অভিমানী! ভগবৎ-নির্ভরের বুড়ি-ছোঁওয়া পর্যন্ত যার হয় নি আজ পর্যন্ত সে

হবে অপরের খুঁটি—অবলম্বন—আশ্রয়দাতা ? মনে পড়ে ওর চণ্ডীর—
"ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রযান্তি—"

তোমার আশ্রিত যারা বিপদে তাদের নাই ভয় :
তোমার আশ্রয় লভি' হয় তারা সবার আশ্রয়।

ভাবতে ভাবতে ওর মন অন্ধকার হ'য়ে আসে বিষাদে, বেদনায়, বিক্লবে। মনে পড়ে আরো বেশি ক'রে ছেলেবেলার কথা···সে কত অশ্রুচ্ছ্বাস, আরাধনা, প্রার্থনা। বিশেষ কৃষ্ণকাহিনী পড়তে পড়তে। মনে পড়ে ধ্রুব প্রহ্লাদ বিল্বমঙ্গল চৈতন্য আরো কত কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণ প্রেমের কথা পড়তে পড়তে ওর বুকের রক্তে তুফান উঠত জেগে মনে হ'ত বার বার—আর যা-ই হোক সংসারে সে বাঁধা পড়বে না। পণ নিত 'আমার আমার' অভিমান ছাড়বে। দুরাশা জাগত সব ছাড়তে হবে, হ'তে হবে নিঃস্ব রিক্ত নিরভিমান। চাইতে হবে শুধু প্রশ্নহীন শরণাগতি। বাঁশি শোনে নি কি ? নিশ্চয় শুনেছে।

কিন্তু তবু এ কী মোহ আজ ওকে পেয়ে বসছে ? ভগবানের জন্যে সে-ব্যাকুলতার সে-আবেগের স্থান অধিকার করতে চাইছে আজ কে ? সংসারে বৈরাগ্য ওর লুপ্ত হয় নি—সত্য, কিন্তু ভগবানে সে-অনুরাগ আজ ওর কোথায় ? ভগবৎকরুণার আভাসেও যে-শান্তি ও পাচ্ছিল সে-শান্তির কতটুকু ধ্বংসশেষ আজো আছে মাথা উঁচু ক'রে ?

জেগে ওঠে ওর মনের মন্দিরে গুরুদেবের দৃষ্টি···উপদেশ : শান্তি পাবে কী ক'রে ঐকান্তিক সাধনা বিনা ? নিরভিমান না হ'তে পারলে কেমন ক'রে মিলবে করুণার পূর্ণ বরদান ? ভাবতে

ওর শিহরণ জাগে হঠাৎ···কিন্তু সেই সঙ্গে অবসাদও ফের আসে ছেয়ে: তাঁকে তো ভুলেই থাকে ও বেশির ভাগ সময়। এখানে এসে দিনে ক-বার ওর মনে পড়েছে তাঁর কথা—তাঁর ক্ষমার, স্নেহের, তপস্যার, ঐকান্তিকতার, অনাসক্তির, জ্ঞানের, চরিত্র-প্রভাবের ছবি কতটুকু বা ফুটে উঠেছে ওর অন্যমনস্কতার পটে? সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে পড়ে যায় আশ্রমের কথা—যেখানে কত নির্মলচরিত্র সাধক সাধিকা চলেছে এ-দুর্দিনেও ঊর্ধ্বমুখী হ'য়ে ধ্রুবলক্ষ্যের দূরভিসারে। ওর ঠাঁই তাদেরই মাঝে—তাদেরই ও চিরাত্মীয়—তাদের যতই কেন না দোষ ত্রুটি থাকুক। তাছাড়া মালক্ষ্মী তো মিথ্যা বলে নি—এখানে বাঁধা পড়লে ওর কাছ থেকে কে কী পাবে? শুধু একটু সস্তা আমোদ আহলাদ, হাল্কা গাল-গল্পের মনোরঞ্জন—বড় জোর একটু আধটু সাঙ্গীতিক ভাববিলসন। মালক্ষ্মী বড় সময়েই মনে করিয়ে দিয়েছে বটে যে হাজার চেষ্টা করো না কেন সংসারে থেকে বড় জোর নিখুঁৎ সংসারী হওয়া যায়—তার বেশি না। যারা এর বেশি চায় না সংসার তাদেরই জন্যে। বেশ তো তারা থাক না—কিন্তু ও কী ব'লে তাদের কাঁধে কাঁধ-মেলাতে আসে—যোগ দেয় তাদের হালকামিতে? ওর যত দোষ ত্রুটিই থাক না কেন এ তো অনস্বীকার্য যে স্বভাবে ও উদাসীই বটে—ওর শত্রুরাও মানে যে সংসারী বলতে যা বোঝায় ও তা নয়। কিন্তু তবু ও স্বধর্মভ্রষ্ট হ'তে চলেছে আজ কোন্ উঞ্ছবৃত্তির উদগ্র লোভে?

"না"—হঠাৎ ব'লে ওঠে ওর মন মাথা ঝাঁকিয়ে। "যতই বলো, এ তোমার অত্যুক্তি—তোমার স্বধর্ম নয় একেবারে চোখ

বুঁজে বীজমন্ত্র জপ ক'রে নিখুঁৎ সাধক হওয়া, বা বিবিক্তদেশসেবী হ'য়ে নাসাগ্রে দৃষ্টি রেখে ব্রহ্মনির্বাণ। কী ক'রে তুমি এমন কথা বলো শুনি যে, যে-অনাবিল স্নেহ তুমি এখানে এসে পাও সে সব তোমাকে টানে শুধু সংসারী হ'তে? তুমি না নজির পাড়ার পক্ষপাতী নও? তবে অমুক তমুক সাধক সাধিকার দৃষ্টান্ত নেও কেন—তাঁরা যত ঐকান্তিক ও ঐকান্তিকাই হোন না কেন? তুমি কি সত্যি মনে করো যে, এ-সংসারে তুমি না-আসার পণ নেওয়া সত্ত্বেও-যে বার বার ফিরে আসছ তার কোনোই তাৎপর্য নেই? বলতে চাও কি তোমার সঙ্গে পাঁচজনের যে গানের স্নেহের ভাবের আদান প্রদান হয় সে সবই অকৃতার্থ? তা-ই যদি হ'ত তাহ'লে তোমার গুরুদেব তোমাকে অনুমতি দিতেন কি এ নিষ্ফলতার নৈরাজ্যে ফিরে ফিরে আসতে? একথা সত্য যে নির্জন সাধনা তোমার চাই, কিন্তু একথা সত্য নয় যে তোমার পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন অজ্ঞাতবাসই হ'ল স্বধর্ম, আর মাঝে মধ্যে ফিরে আসাটা অধর্ম। সাধনার পান থেকে চুন খসলে যাদের মন হাহুতাশী হ'য়ে ওঠে তুমি কি সত্যি তাদেরি সমধর্মী বলতে চাও?"

মনে ওর খটকা লাগে। কারণ কথাটা তো একেবারে অসত্য নয়। গুরুদেবও ওকে বলতেন যে প্রাণশক্তির উদার আদান প্রদান ওর স্বধর্মই বটে। তবে? এ আর এক সমস্যা বৈ কি। মন ওর অশান্ত হ'য়ে ওঠে। জীবনকে ঠিক ভঙ্গিতে দেখা কী যে কঠিন! হয় সাড়ে পনর আনা আসক্তির দৃষ্টি, না হয় ষোলো আনা বিতৃষ্ণার। অথচ এ দুই-ই অত্যুক্তি নয় তো কী? সত্যিই

কি এই কথাই মেনে নিতে হবে যে থেকে থেকে সংসার পরিধির সংস্পর্শে এসে এই যে সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা ওর হয় সে সব একেবারে নিরর্থক, অন্তঃসারশূন্য? যে-চেতনার বিকাশ হয় যোগের একাগ্রতায় তার বিকাশপথে কি একটুও আলো ধরে না হাজারো সাংসারিক পরীক্ষার সংযম, ত্যাগ, দুঃখ-শোক, হাসি-অশ্রু, বিরহ-মিলনের অভিজ্ঞতা? ভাবতে ভাবতে ওর চোখে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে ছায়ার পাণ্ডুর কোমল মুখখানি। আহা! কী ক'রে ও মেনে নেবে যে এমন অপরূপ ফুলটিকে যিনি গড়েছেন তিনি অসিতের প্রতি বিমুখ হচ্ছেন ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করার জন্যে, ওর জন্যে দিনের পর দিন প্রার্থনা করার অপরাধে?

না। অন্তত গুরুদেবের শিষ্য হ'য়ে ও সংকীর্ণ একপেশো বৈরাগী হ'তে পারে না আর। একথা ঠিক মুক্তি ওকে পেতেই হবে, কিন্তু তাই ব'লে একথা ঠিক নয় যে জীবনকে ক্রমাগত এড়িয়ে না চললে এ-মুক্তির ছন্দ ওর ফস্কে যাবেই যাবে। গুরুদেবের একটি প্রধান বাণী হ'ল সুষমা—হার্মনি। বহু সুর বেসুর নিয়ে তবে সিম্‌ফনি। সুরূপ কুরূপ যে এতদিন হাত ধরাধরি ক'রে চ'লে এসেছে তার একটা নিহিতার্থ আছে নিশ্চয়ই, আনন্দ বেদনার বসতি পাশাপাশি—এরও কোন গূঢ় কারণ না থেকেই পারে না। ও আজো জানে না কী সে-কারণ: জানে না—কেন অমঙ্গলের প্রভাব এত ব্যাপক মঙ্গলময়ের সৃষ্টিতে: কিন্তু এটুকু জেনেছে এরি মধ্যে যে এসবের মধ্যে দিয়েই একটা বিপুল রহস্যের আভাস আমাদের দৃষ্টিগম্য, সাধনালভ্য। সে-রহস্যের মহিমা সম্প্রতি

যেন আরো গভীর ক'রে উপলব্ধি করে দিনে দিনে গাঢ় বেদনায়, যন্ত্রণায়, শোকে তাপে, নিরাশায়, অশান্তিতে—এমন কি মৃত্যুর করাল ছায়াতেও। মৃত্যু কথাটা আজ ও উচ্চারণ করে জোর ক'রেই। এত ভয় কিসের? মরণে দুঃখ আছে ব'লে? থাকুক না দুঃখ। জীবনের সমাপ্তি যখন দেহান্তে নয়—তখন কী যায় আসে?

শিহরণ জাগে ওর ভাবতে। এ কী। আত্মগ্লানি গেছে মুছে। কেমন ক'রে হঠাৎ এল এ-মানসিক স্নানশুদ্ধির প্রসন্নতা, গভীর-দৃষ্টির পথনির্দেশ?

গভীর কৃতজ্ঞতায় ওর অন্তর ছেয়ে আসে। ছায়ার স্নেহ শ্রদ্ধা ভক্তি যে ও এভাবে না-চাইতেই পেয়েছে তাকে কেমন ক'রে বিধাতার বর ছাড়া অন্য কোনো নামে ডাকবে? এহেন আশ্চর্য পবিত্রতার অভিজ্ঞতা কি ওর পরবর্তী জীবনের মণিকোঠায় একটি উজ্বল স্মৃতিমণি হ'য়ে আলো ধরবে না আঁধার-লগ্নে? ওর সঙ্গে এই যে গভীর দুঃখবেদনার মধ্যে দিয়ে নিবিড় হৃদয়বিনিময় একে কি বলবে না বিধাতার একটি শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ? করুণা কি শুধুই একটুখানি শান্তির হিল্লোল—আবেগের শিহরণ? বিধাতা বজ্রমণি-দিয়ে-গাঁথা কণ্ঠমালা যাকে পরাতে চান সে যদি বজ্রের ভয়ে পিছিয়ে যায় তাহ'লে মণিকেও হারায় না কি?

মনে ভেসে ওঠে ওর ছায়ার কাতর চাহনি কাল রাতে। সে মুখে কিছু বলার মেয়ে নয়, কিন্তু চাহনিতে কি প্রকাশ করে নি ওর অনুরোধ—যখন বলেছিল যে শুধু অসিতের দুঃখ কল্পনা ক'রেই ওর সময়ে সময়ে বাঁচতে সাধ হয়। এই একটি কথা শোনার জন্যে

কি তার কলকাতা আসার সব দুঃখ সাথক হয় নি? এর বেশি ও বলে নি—কিন্তু এর বেশি কে কবে বলেছে কোথায়? বলতে কি, যেখানে গভীরে মিল থাকে বলা তো সেখানে হ'য়ে ওঠে অবান্তর—এত অবান্তর যে অনেক সময়ে প্রকাশটা পূর্ণতার ছন্দ না এনে বহন করে ব্যথতার অতৃপ্তি।

তাই কি ভগবানের ভালোবাসা ভাষার সভায় এত প্রকাশকুণ্ঠ? জানে না সে। তবে এটুকু জানে—কারণ অনুভব করেছে বহুবারই—যে সব গভীর ভালোবাসারই একটা আবরু আছে, জাহির করতে তার সংকোচ কি একটা? অবশ্য সুন্দর প্রকাশ সত্য অঙ্গীকার বাঞ্ছনীয় বৈ কি; কিন্তু গভীর ভালোবাসা চায় না তো আত্মবিজ্ঞপ্তি। তার প্রকাশের যে-সুর, মুখরতার ছন্দে তার তাল কাটে না কি? মনে পড়ে সেদিন ছায়াই বলেছিল কি-কথায়—ম্লান হেসে: "খুলে না বললে যদি কেউ না বোঝে তবে খুলে বলতে কি লজ্জায় মাথা কাটা যায় না অসিদা?"

অসিত জানত একথার লক্ষ্য কে। "কেউ" কথাটা ও প্রয়োগ করত প্রায়ই—কিন্তু এমনভাবে যাতে একজন অন্তত বুঝত যে "যে-কেউ" এ-কথাটির লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য—তাদের মধ্যে একজন "বিশেষ-কেউ"। অথচ তবু অসিত ওকে কত সময়েই ভুল বুঝেছে ওর এই খুলে না বলার জন্য। অসিত হ'তে চেয়েছিল ওর ব্যথার ব্যথী—কিন্তু হায়রে, হ'তে-চাওয়া ও হ'তে পারার মধ্যে তফাৎ যে কতখানি ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ কি জানে? এসব ও আজ যতই ভাবে ততই ফের মেঘ ছেয়ে আসে ওর

মনে। ঠিক এখনই যাবে ফিরে? না গেলেই কি নয়—যখন এত লোকে বলছে এত ক'রে? মনে পড়ে আজ যেন আরো বেশি ক'রে মৃত্যুশয্যায় দেবদার সেই শেষ কথা: "ওকে দেখো ভাই।" না হয় থাকলই আর দুদিন। গুরুদেব তো অন্তত অসন্তুষ্ট হবেন না।

হঠাৎ খেদ আসে ফের মন ছেয়ে। কাকে ও বোঝাচেছ? এর নাম কি বোঝানো, না ভোলানো? গুরুদেব অসন্তুষ্ট না-হবার যুক্তি ওঠে কোত্থেকে তা কি ও জানে না? কোনোদিন কি কাউকে তিনি বলেছেন কিছু করতে সন্তুষ্টির লোভ দেখিয়ে অসন্তুষ্টির বেত উঁচিয়ে? বারবারই কি বলেন নি যে ভগবানের প্রেম ডাকে কিন্তু টানে না, সাধে কিন্তু বাঁধে না? সে বোঝায়, লওয়ায়—কিন্তু জোর করে না তো—যা বলে প্রেমের তাগিদেই বলে: "ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্"—বলেন নি কি পার্থসারথি তাঁর প্রিয়ভক্তকে সেই ঘোর কুরুক্ষেত্রে? কী অপরূপ কথা—কী ধৈর্য—তিতিক্ষা! "তোমাকে হিতবাক্য বলছি কেন? না তুমি আমার প্রিয়—তাই।" আহা, প্রেম তো এরি নাম। মঙ্গলের অজুহাতে যে হয় রক্তচক্ষু ডিক্টেটর সে আর যাই হোক প্রেমিক নয়, প্রেমিক হ'লে বলত ঐ চিরদিশারীর ম'ত: "বিমৃশ্যৈত-দশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু"—"যা বলবার সব বললাম এখন গভীর ভাবে ভেবে চিন্তে বুঝে সুঝে তোমার যা ইচ্ছা তাই করো।"

গুরুদেব যে জীবন্মুক্ত, সব জীবন্মুক্ত গুরুই তো শিষ্যের কাছে পার্থসারথি। সে কথা আর বলতে? "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি।" ব্রহ্ম কী বস্তু সে জানে না, কিন্তু কিছু অন্তত জেনেছে গুরুদেবকে।

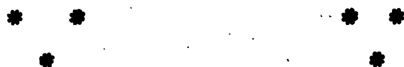
ভাবতেও তার গায়ে কাঁটা দেয়—যত অযোগ্যই সে হোক না কেন—তাঁর অহেতুক প্রেমের কিছু স্বাদ তো সে পেয়েছে। তাই টের পেয়েছে প্রেমের সাধনা কত কঠিন। ভালোবাসি বললেই কি ভালোবাসা যায়? ছায়ারই কথা মনে পড়ে: "ভালো কি অমনি বাসলেই হ'ল?"

অথচ এই প্রেমের সাধনায় যে অসিতের সিদ্ধি হয় নি একথা ওর চেয়ে বেশি কে জানে? তবে? কেন সে চায় ভাণ্ডারী হবার আগেই দাতা হ'তে—যখন দেখছে পদে পদে অভিমান কী ভাবে ওর ভালোবাসার মন্ত্রসিদ্ধির পথ আগলে দাঁড়াচ্ছে? প্রতি প্রাপ্তি থেকে ও কি সংগ্রহ করছে না ওর আত্মপ্রসাদের খোরাক? শেঠজি বললেন তিনি মানুষ চেনেন, দীপ্তি বলল ও অসংসারী ব'লেই সবাই ওকে চায়, শ্যামলী বলল ঠাকুর ওকে ঘরছাড়া বাঁশি শুনিয়েছেন, সুধী বলল ওর প্রভাব অসামান্য—আরো কত কী। এসবকে ও দুভাবে শুনতে পারে: হয়, সংসারী অভিমানের কি না আসক্তির কানে—নয়, বৈরাগী নিরভিমানের অর্থাৎ মুক্তির শ্রুতি-লোকে। মন বলে: যেপথে চলার জন্যে ও আজ খানিকটা অন্তত সুন্দর ও বাঞ্ছনীয় হ'য়ে উঠেছে সে-পথে আরো এগিয়ে যেতে চাওয়াই তো মুক্তির পথ—অনাসক্তিভঙ্গিম। অপরটি হ'ল আত্মাদরের পথ—বাসনাভঙ্গিম। সাধনার পথে প্রতি পদে যেন দুটি ক'রে রাস্তা খুলে খুলে যেতে থাকে—এ ও বারবারই দেখেছে। তাই তো সাধনায় সংকল্পের মূল্য এত বেশি। কেন না প্রতি পদেই তাকে পরীক্ষা দিতে হয়, অঙ্গীকার করতে হয় সর্বান্তঃ-

করণে: "আমি নেব পূজার পথ—ভোগের না, শুদ্ধির পথ—প্যাচমিশেলির না, দৃষ্টির পথ—অন্ধতার না।" এ-পথকে দুর্গম বলা হ'লও তো এইজন্যেই যে এ-পথ কর্তব্যের নয়—প্রেমের। শুধু বাইরের বিধান মেনে চললে এ-পথে বেশিদূর এগুনো যায় না—কেন না সে-বিধানের পাথেয় স্বল্পসম্বল: অন্তরের নির্দেশে না চললে এ-পথে মন্ত্রসিদ্ধি অসম্ভব কেন না সাধনার পথে কেবল এই আন্তর আলোই অফুরন্ত। তাই না এ-পথে এত সাবধানতা প্রতি পদে। হবে না সাবধান হ'তে? যে-অমৃত আত্মশুদ্ধির জন্যে দেওয়া তাকে আত্মতৃপ্তির কাজে লাগানোর নামই তো ভ্রষ্টাচার। অথচ সংসারিয়ানার হাজারো ফন্দিফিকির রফানিষ্পত্তি সাধককে ঠেলে এই দেয় তো এই ভ্রষ্টাচারেরই দিকে। ওর মনে পড়ে একটি সুফী শের:

> "ফিকর সবকো খা গঈ ফিকর সবকা পীর,
> ফিকরকে ফাঁকী করে সাঁচচা বো ফকীর।"

"যুক্তির হাজারো ফিকির শেখায় ফাঁকি—কাজেই তাকেই বলে সবাই গুরু। এহেন আত্মপ্রবঞ্চনাকে যে গণ্ডূষে নিঃশেষ করতে পারে তারই নাম ফকীর—সাঁচচা বৈরাগী।"



হঠাৎ দেখা কমলার সঙ্গে। সে তার মোটর থেকে হাত তুলে ওকে রুখতে বলল। অসিত একটু ভয় পেয়ে গেল। কমলা যে ওকে ডাকতেই আসছিল মোটরে ছুটে এ বুঝতে ওর

বাকি রইল না। কিন্তু কেন? ছায়ার কি হঠাৎ আবার মূর্ছা গোছের কিছু হ'ল না কি?—বুকের মধ্যে ছাঁৎ করে ওঠে।

সর্বরক্ষে। ও তাড়াতাড়ি মোটর থেকে নেমে কমলার মোটরের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সে বলল: "এসো," ব'লেই ছায়ার মোটরের সারথিকে: "আপনি গাড়ি নিয়ে যান—প্রতিমাকে বলবেন অসিত-বাবুকে নিয়ে আমি আসছি আধঘন্টার মধ্যেই আনন্দময়ী মাকে দর্শন ক'রে।"

অসিতের কী যে আনন্দ হয় শুনে: "আনন্দময়ী!"

"হ্যাঁ। তাঁর কাছ থেকেই আমি আসছি। তিনি তোমারি কথা জিজ্ঞাসা করলেন—তাই ছুটে এলাম।"

"তিনি কবে কলকাতায় এলেন?" বলল ও কমলার গাড়িতে উঠে।

"কাল বিকেলে।" কমলা সারথিকে ইঙ্গিত করল। চলল গাড়ি হুহু ক'রে।

"কোথায় আছেন?"

"বা:! সেই শিবমন্দিরে! কলকাতায় এলে আর কোথাও তিনি ওঠেন নাকি?"

"বটে বটে—আমি ভুলে গিয়েছিলাম।" এমন নিরুদ্বেগ আনন্দ ও কলকাতায় এসে অবধি একবারও বোধ করে নি এবার। মনে পড়ে ওর আনন্দময়ী মা-র কথা। সেই প্রথম দর্শনের অভিজ্ঞতা। অনেকদিনই তাঁর খবর পেয়েছিল ও নানা লোকের মুখে। কিন্তু সব চেয়ে মুগ্ধ হয়েছিল বিখ্যাত কীর্তনী ভক্ত

শ্রীরেবতীমোহন সেন মহাশয়ের একটি পত্রে আনন্দময়ীর বর্ণনায়। রেবতীমোহনের কাছে ও কীর্তন শিখেছিল এক সময়ে—অমন কীর্তন সে জীবনে কখনো শোনে নি। হবে না? একে কোকিল-কণ্ঠ, তার উপর প্রভুপাদ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পরম প্রিয় শিষ্য—চিরকুমার—ব্রহ্মচারী। আনন্দময়ী সম্পর্কে তিনি ওকে লিখেছিলেন তাঁর পত্রে যে ভাগবত উপলব্ধির এহেন উচ্চ ভূমিতে সমস্তক্ষণ ভাবমুখে স্থিতি কলিতে বিরল। সেই থেকেই ওর মন উৎসুক হ'য়ে ছিল। দ্বিতীয়বার যখন কলকাতায় আসে হঠাৎ একদিন খবর পায় আনন্দময়ী দেরাদুন থেকে সকালে এসে পৌঁছবেন হাওড়ায়—তারপর ঐখান থেকেই রওনা হবেন কাশী না কোথায় আর একটা ট্রেনে—ঘন্টাখানেক পরে। ও ছুটল হাওড়া স্টেশনে ওর এক বন্ধুর গাড়িতে। বন্ধুটি ছিলেন আনন্দময়ীর ভক্ত—অর্থাৎ সংসারে থেকে সাধুসন্তদের যে-ধরণের ভক্ত সচরাচর গ'ড়ে ওঠে সেই ধরণেরই ভক্ত—তার বেশিও নয়, কমও না। একে ঘোর বিষয়ী তার উপর সর্বাঙ্গে মাদুলিধারী এর চেয়ে বেশি তাঁর কাছে আশা করলেই বা চলবে কেন—ভগবানকে এঁরা চান তো আসলে চিকিৎসক রূপে—শরণ চান তখনই যখন দেহমনের রথ গড়গড় ক'রে চলতে চায় না আর।

হাওড়া ষ্টেশনে লোকে…লোকাকীর্ণ।…আনন্দময়ী মা-র কত ভক্তের সঙ্গে যে আলাপ হ'ল! ও কি কোনো দিনে ভুলবে সে-দৃশ্য? আহা, কী স্নিগ্ধ মুখখানি পবিত্রতায় দীপ্ত, কোমল, সুন্দর! কী উজ্জল চোখদুটি ভাবে ভরা, গভীর অতলস্পর্শী—যারি দিকে তাকাবেন তারই মনে হবে যেন তিনি কতদিনের আত্মীয়!

প্রত্যেকেই ভেবে বসবে—মা তার দিকে যেমন ক'রে তাকান তেমন বুঝি আর কারুর দিকে নয়: যেমন ব্রজগোপীরা ভাবত প্রত্যেকেই কৃষ্ণ তাকে যেমন ভালোবাসেন এমন আর কাউকে না। সবচেয়ে মুগ্ধ হ'ল তাঁর হাসি দেখে। সে-হাসিতে যেন মার অন্তরের অনিরুদ্ধ নির্মলতা উছলে উঠেছে। মন উঠল গান গেয়ে। "ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ-ই" বটে। সে-পবিত্র উদ্ভাসিত মুখ, সে-ভাবগভীর চাহনি, সে-আশ্চর্য হাসি দেখলে কি আর সংশয়ের লেশও লুকিয়ে থাকতে পারে বিচারবুদ্ধির নামাবলী মুড়ি দিয়ে?

যেটুকু বাকি ছিল হ'য়ে গেল তাঁর কথা শুনে। আহা কী কথা! কথা তো নয় যেন বেদের সেই "মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ"—বাতাস থেকেও ঝরে মধু, নদীর জলেও উচ্ছল মধু!...

মোটরে কমলা চুপ ক'রে থাকে, কথা কয় না। অসিত বড় কৃতজ্ঞ বোধ করে। ওর আছে একটি দুর্লভ বোধ—জানে কখন কথা কইতে নেই...অসিত ভাবে...মনে পড়ে আনন্দময়ীর সেই সম্ভাষণ: "কী বাবা?" আহা! কী ডাক সে। যেন কতদিনের—পরিচয়!...আর এমন মধুময় সম্বোধন কিনা প্রথম আলাপেই! এত মুগ্ধ হবে ও সত্যি ভাবে নি। মা জিজ্ঞাসা করেছিলেন গুরুদেবের কথা। বলেছিলেন তাঁকে "মহাদেব"। বেশ মনে আছে। তবে একটা কথার অর্থ ও আজও বুঝতে পারেনি, জিজ্ঞাসা করেছিল পরে—কিন্তু আনন্দময়ী শুধু মৃদু হেসেছিলেন, স্পষ্ট ক'রে কিছু বলেন নি। শুধু একবার এইটুকু "বাবা! তুমি আমার অজানা নও—তোমার গানও আমি শুনেছি।"

ও খোঁজ নিয়ে জেনেছিল তাঁর ভক্তদের কাছে যে, অসিতের কোন গানের সভায়ই আনন্দময়ী কখনো আসেন নি। তবে কোথায় শুনলেন ওর গান? কেমন ক'রে শুনলেন? দূর থেকে-শোনা—তৃতীয় শ্রবণে? বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যার নাম "ক্লেয়ার-ভয়েন্স?" মরুক গে—যত সব তিরিক্ষি শবদভেদী বাণ। যেন এসব বাচনিক ব্যাখ্যায় ঝাপসা তত্ত্ব প্রাঞ্জল তথ্য হয়েছে কোনোদিন!

সেদিন বেশি কথা হয় নি। চারদিকে ভক্ত—হবে কোত্থেকে?

তার পরে আরো অনেকবারই দেখা হয়েছে—এখানে ওখানে। তবে বেশির ভাগ সময়ে ঐ শিবমন্দিরে—বালিগঞ্জে, যেখানে আজ চলেছে মোটর দ্রুতবেগে—এখানেই আনন্দময়ী উঠতেন সচরাচর। সংসারীর ওখানে কিছুতে না।

মনে পড়ে কত লোকের কত প্রশ্ন। অসিত একবার ছায়া ও প্রীতিকে নিয়ে গিয়েছিল। ছায়ার গান শুনে আনন্দময়ী বড়ই খুশি হ'য়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। মনে পড়ে প্রীতি কি একটা প্রশ্ন করেছিল সংসার সম্বন্ধে তাতে আনন্দময়ী বলেছিলেন: "মা! সংসার মানে কী শুনবে? সঙ সার অর্থাৎ যেখানে সঙের দল সার বেঁধে চলেছে।"

মনে পড়েছিল ওর পরমহংসদেবের উপমা: "সংসার হ'ল আমড়া, আঁটি আর চামড়া।"

আজ একথা যেন আরো সত্য মনে হয়—যদিও আগে মনে হ'ত ওঁরা একটু বাড়িয়ে বলছেন। না তো। সত্যি, যে-সংসারের গুণগানে সংসারীরা আবহমানকাল উচ্ছ্বসিত হ'য়ে এসেছে সেখানে

কতটুকু স্থায়ী রস মেলে? যথার্থ সুখী দেখেছে ও কজনকে? বহু মরুপারের পরে একটুখানি সুখ তার .পরই যে অশান্তি সেই অশান্তি। একটুখানি বাসনাতৃপ্তির ঝিকিমিকি তার পরই যে তিমিরে সে তিমিরে।

কেবল আনন্দময়ীকে দেখে ওর মনে হয়েছিল যে ইনি শান্তি-প্রতিষ্ঠিত। না, কম বলা হ'ল। মনে হয়েছিল অমৃতের গঙ্গা তীরে বাসা বাঁধবার অনুমতি পেয়েছেন গঙ্গাধরের কাছ থেকে, নৈলে কি এমন শিশুভাব এমন সরল উচছলতা বজায় রাখতে পারে কেউ চল্লিশ পেরিয়েও? মনে পড়ে একদিনের কথা। ওকে আনন্দময়ী ডেকেছিলেন গান শোনাতে। ও চেয়েছিল তাঁকে একটু নিরালায়। বলেছিলেন: "তাই তো বাবা! নিরালায় আমাকে পাওয়া মুস্কিল—মা যে আমাকে ভিড়ের মধ্যেই রেখেছে—কী করি বলো তো? তবে এক কাজ করতে পারো বাবা। ভোরের দিকে এসো—একটু কম লোক থাকে তখন। ও গিয়েছিল শিবমন্দিরে ভোর সাড়ে পাচটায়। গিয়ে দেখে কেউ কোথাও নেই, কেবল দুএকটি ভক্ত ও ভক্তিমতী এখানে ওখানে ছড়িয়ে। প্রশ্ন করল তাদের—আনন্দময়ী মা কোথায়? তারা শুধু একটু হাসল মুখটিপে। কী ব্যাপার ও ভাবছে অবাক হ'য়ে—এমন সময়ে হঠাৎ ঠিক একটি সাত আট বছরের মেয়ের মতন খিল খিল ক'রে হেসে উঠলেন আনন্দময়ী। ও চমকে তাকাতেই দেখে এককোনে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে যে একটি মূর্তি ছিল শয়ান সে হঠাৎ উঠে ফেটে পড়ছে হাসিতে। দেখে যারা ছিল তারাও হেসে কুটি কুটি। একেবারে অনাবিল নির্ভেজাল ছেলেমানুষি দুষ্টুমির হাসি। ভাবতেও হাসি পায়।

আজ বুঝতে পারে কেন এ-খেলা তিনি খেলেছিলেন সে-সময়ে। সে-সময়ে ওর মনে মাঝে মাঝে প্রশ্ন উঠত ভগবানকে যারা পায় তারা কেন গম্ভীর হ'য়ে যায় সবাই। গাম্ভীর্যের ও ভক্ত ছিল না কোনোদিনই—অনেক চেষ্টা ক'রেও হ'তে পারে নি, অথচ আশ্রমে দেখত অনেকেই হাসির ছায়া মাড়াতেও ওঠেন ডরিয়ে। অন্যত্র হ'লে তাদের এড়িয়ে চলতে পারত কিন্তু আশ্রম-জীবনের এই একটি মস্ত অসুবিধা যে যাদের দেখতে নারি তাদের বাঁকা চরণেরও পিছু নিতে হয় অনেক সময়েই—যাদের সঙ্গে দরদের লেশও খুঁজে পাওয়া যায় না তাদেরো ঘেঁষ লাগতে বাধ্য—ছোট পরিধির মধ্যে অনেক বাসিন্দা থাকলে ছোঁয়াচ কাটানো অসম্ভব। এই জন্যে মনঃক্লেশে সময়ে সময়ে ও হ'য়ে উঠত অতিষ্ঠ।

আনন্দময়ী ওর জীবনে এসেছিলেন এইরকম একটি সংকট সময়ে, যখন গম্ভীর নির্জন সাধনা করবার ও যোগ্য কি না এই দারুণ অনৈশ্চিত্যে ও দোদুল্যমান, কেবলি মনে প্রশ্ন উঠছে ঠেলে—ভগবানকে পেতে হ'লে কঠোর গম্ভীর হ'তে হবে কেন? কেন সহজ খুসি, সরল হাসি, উচ্ছল প্রসন্নতার আলোয় আলোয় ভালোয় ভালোয় লক্ষ্যে পৌঁছনো যাবে না সাধনার পথে? আনন্দময়ী তাই ওর কাছে প্রথম দেখা দিয়েছিলেন প্রায় মুস্কিল-আশানের মূর্তিতে। মুগ্ধ হবে না সে?

সেই চিরপরিচিত শিবমন্দির—খোলামাঠের মাঝখানে। ঢুকতেই শুনল ঘণ্টাধ্বনি—শিবের ভোগ দেওয়া হচ্ছে। মার্বেল পাথরের মেজেয় ব'সে কত-যে দর্শনার্থী—আর তাদের কেন্দ্রে ব'সে হাসিভরা আনন্দময়ী—অন্ধকারের বুকে বিনিষ্কম্প অগ্নিশিখা!

সাধুদর্শনের কথা তো কতই পড়া যায়। কিন্তু এ-দর্শন মানুষকে যে কী পাথেয় এনে দেয়—বিশেষ ক'রে সংসারের নিঃসম্বলতার মাঝখানে—যেন ও প্রতিবারই নতুন ক'রে উপলব্ধি করে। বিশেষ ক'রেই মনে পড়ে ভগবানের সেই সুন্দর শ্লোকটি:

মেঘাগমোৎসবা হৃষ্টাঃ প্রত্যনন্দন্ শিখণ্ডিনঃ।
গৃহেষু তপ্তা নির্বিন্না যথাচ্যুতসমাগমে।

গুন্ গুন্ ক'রে গায় নিজেরই মনে:

তোমার আবির্ভাবে ওগো মেঘ-নিদাঘ-শ্রান্ত ময়ূর ছোটে
মেলি' তার পাখা তেমনি উচ্ছ্বসিয়া
কামনা-ক্লান্ত জীবনপান্থ যেমন পুলকে উছসি' ওঠে
কমলাকান্ত-প্রেমিকেরে নিরখিয়া।

জীবনের বাসনা-জগতে যখন জীব নিজেকে পরবাসী মনে ক'রে শোকেতাপে ক্লান্ত অবসন্ন হ'য়ে পড়ে—তখন ভগবৎ-প্রেমিকেরা তার কাছে আনেন যেন সেই স্বদেশের বাণী বহন ক'রে—যেখানে আঁধার নেই, শুধুই আলো—দুঃখ নেই শুধুই আনন্দ—অতৃপ্তি নেই শুধুই শান্তি।

একথা বইয়ে পড়া এক, প্রত্যক্ষ করা আর। এ-সত্যটিকে যেন ও নতুন ক'রে উপলব্ধি করে আজ—যখন নানা প্রশ্নের দোলায় ও ক্লিষ্ট, উদ্‌ভ্রান্ত কারণ আনন্দময়ীকে প্রণাম ক'রে তাঁর কাছে বসতে না বসতে বুকের মধ্যে থেকে একটা গুরুভার যেন ওর যায় স'রে—তাঁর অপরূপ শান্তিভরা চোখের স্নিগ্ধ চাহনিতে সব অনামী শূন্যতার ভিড় নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে যায়। কৃতজ্ঞতার

ওর চিত্তে জাগে এক অপরূপ আবেশ। পথে ও মনে করেছিল আনন্দময়ীকে করবে কত কী প্রশ্ন। কিন্তু আশ্চর্য, তাঁর আশীর্বাদ পেতে না পেতে মনে হয়—কথার বা প্রশ্নের যেন প্রয়োজনই নেই এ-জগতে। অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখে, সেখানেও আনন্দময়ীর নির্মল আনন্দের ধারাবর্ষণে সব কলোচ্ছলতার ফাঁক গেছে বুঁজে। ফুল্লরা অথচ কী অপ্রগল্‌ভা, হাসিভরা অথচ কী শান্তিময়ী! আবিষ্টচিত্তে ও শুধু শোনে এর ওর তার কথা, নিজে কিছু বলে না, থেকে থেকে কেবল আনন্দময়ী একবার ক'রে তাকান ওর দিকে। বোঝে ও—তিনি বুঝেছেন, আর দিচেছন যা দেবার। মনে পড়ে খানিক আগে শেঠজিকে ও বলেছিল যে তপস্বীদের তপঃশক্তি যে শুধু জানা পথেই মানুষের হিতসাধন করে তা তো নয়—তাদের মধ্যে এমন অনেক আবির্ভাব হয় যার ভাষা নেই অথচ ক্রিয়া আছে, ধারা নেই অথচ সিঞ্চন আছে, আংটিবদল নেই অথচ মিলন আছে। কত সত্যি কথা। চারদিকের চঞ্চলতার মধ্যেও এ অচঞ্চলাকে দেখে ওর আরো মনে হয় একথা। মনে পড়ে গুরুদেবের একটি কথা যে আনন্দময়ী সচ্চিদানন্দ চেতনায় সুপ্রতিষ্ঠিতা। এ-চেতনা কী তা ও জানে না অবশ্য —কিন্তু এর শক্তি যে নিজেকে অচিন পথে জানান দেয় এ-অনুভব ওর কাছে বেদনার চরম সাক্ষ্যের চেয়েও গ্রহণীয় মনে হয়—মুহূর্তে।

* * * *

* *

হঠাৎ আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করলেন: "একটি নাম শোনাবে না বাবা?

ছায়ার আলো

হঠাৎ ওর চোখোচোখি এক বন্ধুর সঙ্গে। বন্ধুটি বিদ্বান্ অথচ ভক্ত, বৈজ্ঞানিক অথচ সংস্কৃতকোবিদ, বড় বংশের ছেলে অথচ অনুদ্ধত। দশাসহি চেহারা। অধ্যাপক। পণ্ডিত। কবি। ভক্ত তার কয়েকটি গানে ও সুর দিয়েছিল—গ্রামোফোনেও গেয়েছিল। একটি গান ছায়াকে দিয়েও গাইয়েছিল। সে-রেকর্ডটি বড় সুন্দর উৎরেছিল। হঠাৎ চিত্ত ব্যথিয়ে ওঠে যদি ছায়া আজ থাকত তাকে দিয়েই গাওয়াত এগানটি। বন্ধুও উল্লসিত হ'ত।

অসিত বন্ধুটিকে ডাকল কাছে। বলল: "তোমার গানটিই গাইছি ভাই।"

আনন্দে তার মুখ উচ্ছুসিত হ'য়ে উঠল: "কোন্‌টি?"

"যেটি ছায়া গেয়েছে গ্রামোফোনে।"

"আহা! কী সুন্দর গেয়েছে সে! কেমন আছে ও দাদা?"

ভালো নয় ভাই। তবে—"

আনন্দময়ী হেসে তাকালেন, বন্ধুটি বলল: "ধরুন দাদা, কথা পরে হবে।"

অসিত গাইল:

"রাঙা জবায় কাজ কী মা তোর অরুণরাঙা চরণতলে?
লক্ষ কোটি উষারবির আঁধারভাঙা আলোক ঝলে।
সাজাতে তোর ঐ রাঙা পায়
রত্নপতি হার মেনে যায়,
পাগলভোলা বুক পেতে দেয় চরণরেণু পাবার ছলে:
লক্ষ কোটি উষা রবির আঁধারভাঙা আলোক ঝলে।

ঐ পায়ে তোর দেবার ম'ত কী ধন আছে আমার ঘরে?
জবা—সে তো তোরই জবা—তোরে দেব কেমন ক'রে!
তবু মা তোর চরণ মূলে
করব পূজা জবা ফুলে,
ভক্ত যেমন জাহ্নবীতে অঞ্জলি দেয় গঙ্গাজলে—
ভক্ত যেমন গঙ্গাপূজা করে মাগো গঙ্গাজলে।

গাইতে গাইতে মন ওর আনন্দে ব্যথায় ভ'রে গেল···বিচিত্র সে-অনুভূতি। স্বভাব পৌত্তলিক ও, নরপূজার সংস্কার ওর অস্থি-মজ্জায়—গান গাইবার সময়ে সমস্ত স্তবটি আনন্দময়ীকেই নিবেদন করতে বাধবে কেন—মানুষই যে ভগবান হয় কেবল মূঢ়রাই যে "মানুষীং তনুমাশ্রিতং" তাঁকে চিনতে পারে না এ-ভাব মনে ওর ভাস্বর হ'য়ে ওঠে আরো। আনন্দময়ীকে সত্যিই মনে হয় সেই চিরানন্দময়ী যাঁর পায়ে রাঙা জবা দিতে সাধও হয় অথচ লজ্জাও হয় কী ক'রে দেবে ব'লে?

গান শেষ হ'লে তাকালেন ভাবময়ী ওর দিকে। অসিত বিনম্র সুরে বলল: "একটি প্রশ্ন করব মা?"

আনন্দময়ী বললেন: "আমি কি কিছু জানি বাবা?"

"অমন করবেন না মা! বলতেই হবে।"

"আমি কি কিছু বলি বাবা? সত্যি বলছি তিনি যদি বলেন তবেই বলব—না বললে উপায় কি? তা বলো তো তোমার প্রশ্ন—তারপর যা হয় হবে।"

অসিত হেসে বলল: "সেই ভালো। আমার প্রশ্নটি এই যে করুণা ও কর্মফল এ দুয়ের সামঞ্জস্য হয় কী ক'রে?"

"আর একটু খুলে বলো বাবা।"

"আমি বলতে চাচ্ছি যে—কর্মফল যদি সত্য হয় তবে করুণার প্রশ্ন ওঠে কেমন করে? সাধনা করব সিদ্ধিলাভ হবে, বীজ বুনব গাছ হবে, কষ্ট করব কেষ্ট মিলবে—এ বোঝা যায়। কিন্তু তাহ'লে করুণার স্থান কোথায়? রোজগার না ক'রে যা পাই তারই তো নাম করুণা। সাধনা ক'রে রোজগেরে ছেলে হ'লে তবে মিলবে মা-র করুণার পুরস্কার নৈলে নয়—এ কোন্ দিশি কথা?"

(প্রশ্নটা ওর নয়—একদিন ছায়াই করেছিল যদিও সে বলেছিল একটু অন্যভাবে—ওর ছেলেমানুষি ঢঙে: "তুমি প্রায়ই বলো অসিদা তোমার গানে উন্নতি হয়েছে ভগবানের করুণায়। আমার শুনে অবাক লাগে। তুমি করলে আপ্রাণ সাধনা তবে না উন্নতি হ'ল। এ সাধনা না ক'রে যদি উন্নতি হ'ত তাহ'লে বলতে পারতে বটে করুণা।")

আনন্দময়ী শুনে একটু চুপ ক'রে রইলেন পরে বললেন: "বাবা কী বলেন—তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে না কেন?"

"করেছি মা। তিনি উত্তরও দিয়েছেন। কিন্তু কী বলেছেন বলব না এখন। আমি চাই আজ আপনার মুখের উত্তর—আপনার নিজের উপলব্ধি থেকে।"

আনন্দময়ী হাসলেন, বললেন: "আমি কী বলব বলো দেখি বাবা? আমি কি কিছু বলতে পারি? দুটো কথা বলতে না বলতে

খেই ফেলি হারিয়ে। তা কী বলছিলে যেন? করুণা কী বস্তু, এই না? সোজা প্রশ্ন। কিন্তু জবাবও সোজা। বাঁকা কোথাও নেই। যদি পাও সে করুণা তবে বুঝবে এক মুহূর্তে; বুঝবে তখন যে সাধনা ক'রে সে অবস্থা লাভ করা অসম্ভব। সাধনা? আমরা কি সাধনা করি বাবা? সাধ্যি কি আমাদের যে সাধনা করব? তিনি সাধিয়ে নেন তাই না সাধি।"

"তবে এটুকু করিয়ে নেনই বা তিনি কেন?"

"ও তাঁর খেলা—লীলাই নাম দাও বা ইচ্ছাই নাম দাও। কেন করেন তিনি জানেন। তবে যা বলছিলাম, করুণা কী বস্তু সেটা যদি কখনো টের পাও তেমন ক'রে তো দেখবে সাধনার প্রশ্নই আর উঠবেনা বাবা, মিলিয়ে নিও। কারণ তখন যা পাবে তার আলো ধ'রে রাখতে পারবে না, মনে হবে—কী এমন সাধনা করতে পারি আমরা যার ফলে এ-অবস্থা লাভ হয়! যেন কতকগুলো কানাকড়ির বিনিময়ে কোহিনুর পাওয়া। বুঝলে বাবা?"

মন ওর ছেয়ে যায় এক অননুভূতপূর্ব শান্তিতে।...

মোটরে উঠে ওর প্রথম মনে হ'ল পার্শ্ববর্তিনীর কথা। সম্প্রতি ও এত দুঃখ দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে চলেছিল যে ওর সময়ে সময়ে সত্যিই গ্লানি আসত নিজের আত্মকেন্দ্রতার কথা ভেবে। এরি নাম কি আত্মপর—egotist—নয়? সমস্তক্ষণ কেবল নিজের কথা নিয়েই গবেষণা—দারুণ দুর্লক্ষণ নয়? তাই থেকে থেকে ওর মন আরো আর্ত হ'য়ে উঠত শুভার্থী ও শুভার্থিনীদের কথা ভেবে। সত্যি, যখন নিজের মনের অন্ধকারের বিরুদ্ধে অনুযোগ

করে তখন যেন ওর খেই যায় হারিয়ে, স্রেফ মনেই থাকে না আশেপাশের বন্ধুবান্ধবীদের কাছেও কতখানি আলো পাচেছ নিজের অজান্তে—এদের স্নেহ দরদ শ্রদ্ধা প্রীতি সেবা ওকে কী ভাবে ঘিরে আছে। মোটরে উঠে যখন ও হৃদয়ের মধ্যে গভীর শান্তির স্বাদ পায় নতুন ক'রে, তখন হঠাৎ মনে হয় এ-শান্তি ওর লাভ হ'ত না যদি না কমলা ওকে এত চেষ্টা ক'রে আনন্দময়ীর কাছে নিয়ে যেত। ও ভারি কৃতজ্ঞ বোধ করে ওর এ-অকৃত্রিম শুভার্থিনীর প্রতি যার কথা ও হয়ত সব চেয়ে কম ভেবেছে কলকাতায়। অথচ সে তো তাই ব'লে ভোলে নি ওর কথা। মনটা ওর ভ'রে ওঠে, ও বলে গাঢ় কণ্ঠে: "ভাই তোমার কাছে কী যে কৃতজ্ঞ আমি—তুমি এমন ক'রে ছুটে এসে আমাকে না নিয়ে গেলে এযাত্রা ওঁ'র আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিতই থেকে যেতে হ'ত।"

কমলা বলে "কেউ না কেউ নিয়ে যেতই ভাই—আমরা শুধু উপলক্ষ্য বই তো নই। কেবল—" ব'লেই কব্জি ঘড়ির দিকে তাকায় ও। চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে সর্বগুণাধার কমলার এই একটি-মাত্র ত্রুটি এই কথায় কথায় কব্জিঘড়ি দেখা—সময় যে চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায় এজন্যে ওর দুশ্চিন্তার তল খুঁজে পাওয়া ভার। কথাটা ওর শেষ হ'ল না—প্রায় চল্লিশ মিনিট সময়ের স্রোত অতীতের "মরুপথে হয়েছে হারা"—কথা কইতে কি আর ইচ্ছা হয় এ-হেন শোচনীয় দুর্ঘটনার পরে?

"কী? সাড়ে বত্রিশ মিনিট না পৌনে তেতাল্লিশ?"

কমলা হাসে: "তুমি কেবল কেবল এই নিয়ে—"

অসিতও হাসে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে। যে-শান্তি আজ ওর শিরায় শিরায় স্নিগ্ধতার এক অপূর্ব অনুভূতি বহন ক'রে আনল তার পরে কথা কওয়া কঠিন। কমলা বোঝে··· বলে না আর কোনো কথা। গাড়ি চলে নিঃশব্দে।

ওর মনে জেগে ওঠে এক নব শিহরণ। আনন্দময়ীর শেষ কথা কয়টি ওর মনের তারে কেবলই বেজে ওঠে···রকমারি রেশে। করুণা এম্‌নিই বটে। অথচ ঠিক এভাবে ও ভেবে দেখে নি কখনো যে করুণা কোনো কিছুর পুরস্কার নয়—সাধনা বা তপস্যা বা শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের ফলশ্রুতি না। করুণা হ'ল মনের একটা আলোর অবস্থা—অমৃতের অনুভূতি—যার স্বাদ আনে ধারণার ওলটপালট, দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে জাগায় বিপ্লব। ওর মনে পড়ে গুরুদেবও এই কথাই বলেছিলেন ওকে একাধিকবার। লিখেছিলেনও একটি চিঠিতে যে সাধনার পথে তপস্যা একটা মস্ত সহায়, তার চেয়েও বড় সহায় আন্তরিকতা, তার চেয়েও বড় সহায় ভাগবত করুণা—কেন না করুণা হ'ল স্বধর্মে অঘটনঘটনপটীয়সী। কী ভাবে জিজ্ঞাসা করায় গুরুদেব একটি জানিত দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন করুণার মনোভাব বোঝাতে। সেই বিখ্যাত গল্প:

কহে তপস্বী: "হে নারদ, কবে দিবে হরি মোরে কৃপাবর?
কত বিলম্ব? শুধায়ো তাঁহারে গোলোকে,
যুগ যুগ ধ'রে এত যে করিনু তাঁরি তরে তপ দুশ্চর—"
বলিতে বলিতে ধারা বহে তার দুচোখে।

ফিরিবার পথে কহে ঋষি: "হরি বলিলেন—আরো একবার
জন্মিতে হবে সাধনার তরে যোগিরাজ!"
"আরো একবার! কী বলিছ মুনি!! অকরুণ বলি কারে আর?
এত জপ তপ!—ছায় অবসাদ হৃদিমাঝ।"

"হে ঋষি," শুধায় বৈষ্ণব, "তাঁরে পুছিও—বিরহী মরমে
করুণায় কবে মিলিবেন প্রাণবল্লভ?"
ফিরিবার পথে কহে ঋষি: "হরি বলিলেন—কোটিজনমে।"
"ধন্য ধন্য" বলি' নাচে প্রেমে বৈষ্ণব,
"দুর্লভতম যে-চিরকরুণা—দেববাঞ্ছিত সুধাসার
পাবো স্বাদ তার শুধু এক কোটি জনমেই?
উদিয়া শ্রীহরি কহে হাসি': "প্রিয়বন্ধু, আমার করুণার
পেয়েছ পরশ না জানিতে তুমি আজিকেই।"

আনন্দময়ী মার উত্তরের সঙ্গে গুরুদেবের উত্তর মিলে গিয়েছিল··· অক্ষরে অক্ষরে। ভাবতে ওর গায়ে কাঁটা দেয়!

* *　　* *

*　　*

এক একটা স্মৃতি আছে যা দূরত্বের ব্যবধানে একটুও ঝাপসা হয় না—যদিও পরিসরে হয়ত একটু ক'মে যেতে পারে। চিত্তা-কাশে এ-ধরণের স্মৃতিদীপ জলে তারার ম'ত। আজ সুদূর তানমাগে অসিতের একথাটা যেন বেশি ক'রেই মনে হয়। আনন্দময়ীর সে-অপরূপ ভাবেভোলা মুখশ্রী সে যেন চোখের সামনে দেখতে

পায়—ঠিক যেমনটি দেখেছিল সেদিন বিকেলে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় একটা কথা যেটা ছায়ার দেহান্তের আগে ও ঠিক এমন গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে পারে নি। কথাটা এই যে আনন্দময়ী যে-সময়ে ওকে দর্শন দিয়েছিলেন ঠিক সেই সময়েই ওর সবচেয়ে দরকার ছিল তাঁর পথনির্দেশের। ও সেদিন রাতে কিছুতেই ছায়ার কাছ থেকে বিদায় নিতে পারত না যদি না আনন্দময়ীর উদাস মূর্তি ওকে সচকিত ক'রে তুলত। মমতার টান যখন মানুষকে খুব ক'ষে বাঁধে বুঝি তখনই তাঁরা দেখা দেন যাঁরা চিনেছেন মমতার স্বরূপ। মমতাকে কাটানো মনে হ'ত অমানুষিক নির্মম, যদি না তাঁরা দেখাতেন যে মমতা না কাটালে কেউ অনুকম্পার হদিশ পায় না। 'আমার আমার' যে করে না সে-ই বলতে পারে 'সবাই আমার।' আনন্দময়ীকে দেখে সেদিন ওর মনে এই জানা-কথাটি যেন আবার এক নব নৈশ্চিত্যের দিশা দিল। সে-নৈশ্চিত্যের নাম 'চিরন্তনী'—অথচ এ ক্ষণবুদ্বুদের মেলায় তাকেই সচরাচর আমাদের মনে হয় ভঙ্গুর—অবাস্তব। আনন্দময়ী সে-সময়ে দেখা না দিলে ওর হয়ত মনে হ'ত যাকে বলি কর্তব্য তার দাবি চিরন্তনের দাবির চেয়েও বেশি। একথা ও আজ যত বেশি অনুভব করে তত ওর হাসি পায় ভাবতে যে বুদ্ধিবাদী মানুষ বলে অম্লানবদনে—সাধু মহাত্মাদের ভাগবত-জীবন লাভ হ'ল না হ'ল তাতে অসাধুদের কী এল গেল?—কী এল গেল? মানুষ যার এক বিন্দুর জন্যে হাহাকার ক'রে মরে—একটুখানি শান্তির, একটুখানি অভয়ের, একটুখানি আনন্দের—তার আলোকস্তম্ভ

হ'য়ে যাঁদের আবির্ভাব; যাঁদের প্রতি ভঙ্গি প্রতিভূ হ'য়ে আসে সেই পরম সত্যের যাকে চর্মচক্ষে দেখা যায় না; যাঁদের প্রতি চাহনি ঝল্‌কে তোলে সেই অটুট করুণা-কিরণ যাকে মানুষ পেতে না পেতে খুইয়ে বসে লক্ষ বাসনার আবর্তে; যাঁদের জীবন প্রতিদিনের লক্ষ আঁধারতুফানের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে অচল-প্রত্যয়ের আলোকস্তম্ভ রূপে;—তাঁদের পরম বিকাশ কি এ-রূপদীন ধূলিম্লান মর্ত্যলোকে একটা অপরূপ ছবি নয়? লক্ষ লক্ষ মানুষ দুঃখ শোক আর্তির সময়ে ছুটে গেছে তো এঁদেরই কাছে, বৈজ্ঞানিকের কাছে নয়, এঞ্জিনিয়রের কাছে নয়, রাজনীতিকের কাছে নয়। একবার মানুষ কল্পনা করতে চেষ্টা করুক তো—এই সব সাধু মহাত্মা মহিমময়ীরা যদি না জন্মাতেন কী অবস্থা হ'ত মর্তভূমির! জগতের আজ দুর্দিন সত্য, কিন্তু নির্ভরসার এ-মহানিশায় উষার অভয়মন্ত্র উচ্চারণ করার অধিকার কি এঁদের ছাড়া আর কারুর আছে? নিরাশায় বেদনায় শোকে সংশয়ে যে-সব স্ফুলিঙ্গ আমাদের হৃদয়ের অতলতলে না জ্বলতে নিভে যায়—তাদের জ্বালিয়ে রাখে কে এঁদের জীবনের অম্লান চিন্ময়তা ছাড়া? একথা সত্য যে সবাই ধরতে পারে না এঁদের মহিমা: দুঃখ ক'রে লাভ নেই—অধিকারভেদ বৈষম্য জীবনের মূলে অনুস্যূত। কিন্তু তবু এ-ও সত্য যে, এঁদের প্রভাব সক্রিয় হয়, ব্যাপক হয়—গুহ্যভাবে। উচ্চচেতনার লীলা নিম্ন চেতনার প্রশ্নলোকে আত্মপ্রকাশ করে না বটে—কিন্তু কাজ করে। গুরুদেবের কাছে ও শোনে নি কি অগুন্তিবারই যে বড় যোগী ঋষি মহাপুরুষরা অলক্ষ্যে থেকেই জগতের গভীর হিতসাধন করেন? একথা সত্য যে

জগতের আধি-ব্যাধি জটিল—এ-ও সত্য যে, অধ্যাত্ম চেতনা এ-অন্ধকারের এলাকায় তার স্বকীয় ছন্দে সক্রিয় হ'তে পারে না, অশ্রদ্ধার বিদ্রোহের লোকমোহের তুফানে পূণরাগে বিলোতে পারে না তার আলো—কোনো সাধু সন্ত মহাত্মাই সর্বশক্তিমান নন। তাছাড়া ভাগবত শক্তির স্ফুরণের একটা ধারা আছে—সে ডিক্টেটর নয় যে চলবে খামখেয়ালির পথে। ভাগবত জ্ঞান আনে সেই আলো যে-আলোয় দেখা যায় কেমন করে এ-শক্তি সক্রিয় হয়—কত সন্তর্পণে করুণা ধারণ ক'রে থাকে আমাদের সদাবিপন্ন দেহমনপ্রাণকে।

মনে পড়ে ফের আনন্দময়ীর সেই ভবিষ্যদ্বাণী—করুণা যদি কখনো পাও বাবা—বুঝবে যে, হাজার কৃচ্ছ্র সাধনায়ই সে-অবস্থা লাভ করা যায় না: সে-অবস্থা হ'ল কোহিনুর যাকে সাধনার লক্ষ কানাকড়ি দিয়েও যায় না কেনা। কী সুন্দর কথা। আর মনে পড়ে একথা সে বুঝেছিল কয়েকমাস পরেই—যখন ছায়ার মৃত্যুসংবাদ এসেছিল।

মনে পড়ে আজও সে-অপূর্ব অনুভব। সে-সময়ে ও মাদ্রাজে। খবর পেল ওর এক অসমিয়া বান্ধবীর পত্রে যে জন্মদিনে ছায়ার মৃত্যু হয়েছে—দুদিন আগেও যে ছিল এত প্রাণময়ী আজ আর তার চিহ্নও নেই এ-জগতে। মনে আছে একথা একসময়ে ও কল্পনাও করতে পারত না। শেষ পর্যন্ত ওর মনে আশার শিখা নেভে নি, ভেবেছিল বেঁচে যাবেই। নৈলে ও সইবে কী ক'রে?

কিন্তু সইল তো। মনে আছে যেদিন সকালে খবর পেল সেদিনই সন্ধ্যায় ওর এক বন্ধুর ওখানে গানের আসর। বহু লোক নিমন্ত্রিত—মাদ্রাজের কত গণ্যমান্য লোক যে এসেছিল উৎসুক হ'য়ে। ও

তাদের কাউকে ফেরায় নি। কাউকে বলে নি ছায়ার কথা—এমনকি যে-বন্ধুর ওখানে ছিল তাকেও না। না, শোককে নিয়ে বিলাস ওর ভালো লাগত না—বিশেষ বহিরঙ্গদের সভায়। এ-ও ও শিখেছিল ছায়ারই কাছে। ওর জীবনে যে-ফাঁক সে রেখে গেল সে-ফাঁক আর. কেউ ভরাতে পারবে না এ-ও অসিত জানত। জানত ব'লেই না চুপ হ'য়ে গিয়েছিল। কেবল সেদিন বহুক্ষণ প্রার্থনা করেছিল যেন এই শূন্যতার সময়েই পায় সেই করুণা যার কথা আনন্দময়ী বলেছিলেন—যে-করুণা বার বার বিদ্যুতের মতনই ঝিলিক দিয়ে মিলিয়ে গেছে ওর তৃষিত চিত্তাকাশে।

উদ্ভাসিত হ'য়ে দেখা দিল সে-করুণা—যখন ও সবচেয়ে আর্ত ঠিক সেই সময়েই—যখন গান গাইতে সংকল্প ক'রেও শেষটায় ও অভিভূত হ'য়ে পড়বার মতন হয়।

মনে পড়ে সবাই যখন এসেছে, হাসিমুখে ওর বন্ধু বললেন: "আজ কী লোক হয়েছে অসিত। ঘর এরি মধ্যে ভ'রে গেছে।—বাইরে মোটরের দিকে একবার চেয়ে দেখ।"

বন্ধুকে অতিথিদের আপ্যায়ন করতে পাঠিয়ে দিয়ে অসিত ঢুকল স্নানের ঘরে। নৈলে একলা হবার উপায় নেই—যে-কোনো মুহূর্তে যে-কেউ এসে পড়তে পারে। অথচ ওর বুকের মধ্যে এত খালি খালি লাগছে যে মনে হচ্ছে কোথাও পালিয়ে যায়। আজ গাইবে কী ক'রে—এই ভিড়ে? পারবে না, পারবে না—কিছুতে পারবে না।

অনেকক্ষণ প্রার্থনা করল স্নানের ঘরে: "প্রভু অহঙ্কার আমার চূর্ণ হয়েছে—আর লাঞ্ছনা কেন? হৃদয়দৌর্বল্য জয় করাও তুমিই

—নৈলে আমি যে অক্ষম—অসহায়! তোমার করুণাশক্তি না পেলে আজ গলা দিয়ে স্বর পর্যন্ত বেরুবে না—বেরুতে পারে না: সুর-দাসের প্রার্থনার সুরেও নিজের সুর মেলায়:

জো হম ভলে বুরে তো তেরে।

তুম্হেঁ হমারী লাজ বড়াঈ বিনতি সুনো প্রভু মেরে॥

আজও মনে পড়ে: প্রভু মিনতি তো শুনলেন। এলো তো বল!—আর সে কী আশ্চর্য বল!—কাউকেই তো ও বলেনি—বলার প্রশ্নও ওঠে না: এ তো এমন দুঃখ নয় যেখানে বাইরের সান্ত্বনা কোনো কাজে আসতে পারে। অন্তরে যে বুভুক্ষু সে কি পারে কখনো বাইরের উপকরণ দিয়ে সে-ক্ষুধার গহ্বর ভরাট করতে? ওর মনে পড়ে পরমহংসদেবের একটি কথা—যার কেউ নেই তারই ভগবান আছেন। মনে পড়ে ভাগবতে কৃষ্ণের ভরসা: "নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বন্ নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ" ভগবান্ অকিঞ্চনেরই প্রিয় পালক তথা তারক। তাই বুঝি তাঁর করুণার আলো নামে যখন চারদিকে অন্ধকার নীরন্ধ্র—অপরিমেয়? জীবনে নানা দুর্যোগেই ও পেয়েছে এ-কথার প্রমাণ—কিন্তু আজ ওর চাই প্রমাণের চেয়ে অনেক বেশি কিছু—চাই প্রত্যক্ষ সহায়—আজ চাক্ষুষ না করলেই নয় যে, করুণা নিঃস্বধাত্রী। তাই ও গভীর আর্তির মাঝে দাঁড়িয়েছিল সর্বহারার ম'ত: করুণারই দুয়ারে চেয়েছিল অন্তর্যামীর কাছে গুরুভারেও দাঁড়াবার বল—মেরুদণ্ড।

আর পেল তো বল। এ-পাওয়া কল্পনাও নয়—চোখে দেখার চেয়েও প্রত্যক্ষ। কী ভাবে পেল সে-ও ভুলবার নয়। বেশ মনে

পড়ে—কে যেন ওকে স্মরণ করিয়ে দিল ঘুমন্ত ছায়ার শিয়রে ওর সেই আশ্চর্য দর্শনের কথা। বুকের মধ্যে কে যেন ব'লে উঠল—যাকে তিনি ধারণ ক'রে আছেন তার জন্যে কেন এত শত ভয় ভাবনা, দুঃখ শোক? তাই না সেদিন ও যখন গাইল "বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম সবই পড়ে মনে আজ পড়ে যে কেবলই মনে—" তখন অতলস্পর্শী শোকের মধ্যেই শুনতে পেয়েছিল সেই করুণার ঝংকৃত সান্ত্বনা যার বর্ণনা হয় না, শুধু যে শুনেছে সে-ই জানে। তাই তো সেদিন ওর মনে জুগিয়েছিল অপরূপ আঁখর...আঁখরের পরে আঁখর...যেমন আঁখর আর কখনো জোগায় নি। গুন গুন ক'রে গায় ও আজ: (সে আঁখর কি ভুলবার?)

ওরা হাসে আজ, বলে: "হায় রে মধুর স্বপন।"
বলে: "কৃষ্ণকাহিনী কল্পনা, কবি-কথন"—
ওরা জানে না তাই মানে না,
তুমি এসেছিলে ভালো বেসেছিলে বঁধু জানে না,
তব করুণার তরে পাতে নি যে কান তাই তো জেনেও জানে না,
বঁধু করুণা তোমার যে জেনেছে তার আকাশ অশনি হানে না,
দেখে বিজলী-দীপনে তোমারি কেতন অশনিরে সে তো মানে না,
শুধু আলোর আলাপ মানে, জ্বালাতাপ সে তো আর বঁধু মানে না।
তার আঁখিজলে ঝরে শান্তির ধারা—অধীর বেদনা নয় সে,
গাঢ় শোকের আঁধারে উজলে অশোক—ক্ষুধা-ছলে সুধা বয় সে,
দেখে যুগে যুগে তুমি আসো করুণায়—গায় তারি জয় জয় সে,
কৃপা বাহিরে গোপন রাখে বাণী তার—অন্তরে কথা কয় সে।

যাকে একটু ব্যথা দিয়েও ও অনেক সময়ে গভীর ব্যথায় সারা রাত ঘুমতে পারে নি, যার শিয়রে নিরন্তরই মনে হ'য়েছে—তার চির-অবসান হ'লে সে-অভাবের সান্ত্বনা কোথাও মিলতে পারে না—না শাস্ত্রের বচনে, না অভয় কীর্তনে, না এপারের ভাষায়, না ওপারের আশায়—এহেন নয়নতারার চির-প্রয়াণের দিনেই ও তো পারল গানের আড়ালে ব্যথা গোপন রাখতে। এর পরেও আর কেমন ক'রে বলবে মহাকালীর মূর্তি আলো দিয়ে গড়া নয়? সবচেয়ে অকরুণ অন্ধকারের মুহূর্তে যে দেখেছে করুণার অচলা চপলা, তার চেতনা কি আর পারে "না"-কেই বড় ক'রে দেখতে? সত্য কথা—এর পরেও ওর চিত্তাকাশে ফের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, ফের গাঢ় হ'য়ে এসেছে নিরাশার শূন্যতা, অশান্তির জ্বালা, অনুতাপের বেদনা—নানা সময়ে নানা ছন্দে। না, মিথ্যা কথা ও বলবে না। করুণার আবির্ভাবের পরেই তীর্থপথ যে ওর সরাসর কুসুমাস্তৃত হ'য়ে উঠেছিল—এমন কথা বললে সে হবে শুধু উচ্ছ্বাস নয়—মিথ্যাভাষণ। কিন্তু একথা ও নির্ভয়েই অঙ্গীকার করতে পারে যে এ-আশ্চর্য আবির্ভাবের পরে একটা মস্ত বদল হয় অন্তরগহনে। কারণ তখন ভরসার স্বাদ নিরুদ্দেশ হ'লেও স্মৃতি হ'য়ে ওঠে মৃত্যুঞ্জয়—তাই তো যখন বাস্তব হ'য়ে দাঁড়ায় ক্রন্দন-মরু তখনো অন্তর জপ করে নন্দন-তরুর হারানো আশ্বাস—তখন পথ দেখা না গেলেও লক্ষ্য ঢেকে যায় না আর।

* * * *

* *

মোটরের দুয়ার খুলল অজয়, পাশে সুনীল।

"এত দেরি? আনন্দময়ী মা গান না শুনে ছাড়লেন না বুঝি?"

অসিত ঘাড় নাড়ল। কমলা কব্জিঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল ক্লিষ্ট কণ্ঠে: "তাই তো! আধঘন্টার জায়গায় প্রায় পঞ্চান্ন মিনিট হ'য়ে গেছে।"

অসিত বলল: "তবে একটা সুখবর আছে: এমাস থেকে আমার এই ট্রেনটার সময় পেছিয়ে গেছে দুঘন্টা।"

সুনীল আশ্বস্ত হ'য়ে বলল: "বাঁচলাম—যাই ছায়াকে গিয়ে খবরটা দিই আগে।" ব'লেই দৌড়ে উপরে উঠে গেল।

অসিত অজয়ের কাঁধ ধ'রে সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে উঠতে উঠতে জিজ্ঞাসা করে: "ছায়া কি আমার দেরি দেখে কিছু বলছিল না কি?"

অজয় বলে: "না, ওর জন্যে বলি নি। তবে শেঠজি তাঁর সেক্রেটারিকে দিয়ে হঠাৎ দুহাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি আপনার ফিরবার দেরি দেখে বললেন একটু পরে ফের আসবেন রসিদ নিয়ে যেতে।—কিন্তু ব্যাপার কী অসিদা? শেঠজির সেক্রেটারি এভাবে দু দুটি হাজার মুদ্রা দিয়ে গেলেন কেন?"

অসিত বলল হেসে: "Thereby hangs a tale—চলো বলছি। কিন্তু ছায়া কেমন আছে এখন?"

অজয় দাঁড়াল হঠাৎ মাঝপথে, ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল: "আচ্ছা অসিদা। একটা কথা যদি বলি—রাগ করবেন?"

অসিত শান্তকণ্ঠে বলল: "না। কিন্তু আমি জানি তুমি কী বলবে।"

অজয় চোখ নামিয়ে নিল, বলল: "সেটা শক্ত নয়—আরো অনেকেই বলেছে নিশ্চয়?"

"বলেছে।"

অজয় তাকায় ফের ওর পানে: "হয় না?"

আনন্দময়ীর মূর্তি স্মরণ ক'রে অসিত প্রাণপণ চেষ্টা করল সোজা "না" বলে—কিন্তু পারল না, বলল: "ছায়াও কি বলে থাকতে?"

অজয় হাসে বিষণ্ণ হাসি: "ও কি সেই মেয়ে অসিদা! ওকে কি চেনেন না?"

অসিত কিছু বলল না, মুখ নিচু ক'রে ভাবতে থাকে। অজয় বলে: "কিন্তু এক্ষেত্রে ওর মুখ ফুটে না-বলার মানে কি 'না'? ওর মনের ভাব তো আপনার অজানা নেই।"

অসিত উত্তর দেয় না, ওরা ফের সিঁড়ি বেয়ে ওঠে ধীরে ধীরে। দোরের কাছে পৌঁছিয়েই দেখে প্রীতি। এত ম্লান মুখ।

অসিত উদ্বিগ্ন হ'য়ে ওঠে, বলে: "কী হয়েছে প্রীতি? কেমন আছো?"

প্রীতি চোখ মুছে বলে: "বুঝতেই তো পারো ভাই।"

অসিত বুকের মধ্যে দুর্বল মনে করে ফের। স্মরণ করবার চেষ্টা করে আনন্দময়ীর মূর্তি। সঙ্গে সঙ্গে বল পায়। না, ওকে যেতেই হবে, হবে, হবে, হবে।

* * * *
* *

অসিত স্পষ্ট দেখতে পায় ছবিটি—সেই শেষ দিন--সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে তখন। ছায়ার ঘরে শুধু একটি ম্লান নীল বাতি জলছে প্রতিমা ওর রুক্ষ চুলের গোছাকে দুটি ভাগ ক'রে আঁচড়ে যুগল বিনুনি ক'রে দিচেছ। এ শুধু ও-ই পারত। আর কেউ অমন নিপুণ হাতে পারত না ছায়ার চুলের জট ছাড়াতে। কমলা খাটের মাঝামাঝি ব'সে ওকে হাওয়া করছে একটি খসখসের পাখা দিয়ে। শিয়রে একটি তেপায়া টেবিলে একটি সুন্দর ধূপ-দানিতে অনেকগুলি ধূপ। অসিত ঘরে ঢুকতেই ছায়া নিজের হাতে ধূপ কটি জেলে দিল। কমলা জ্বালাতে যেতে বলল: "না কমলাদি, আগে আগে অসিদার কত কাজ করতাম—শেষদিনে এই একটি কাজই করতে দাও—আর কোনো কাজ তো পারি না এ-শরীরে।"

প্রীতি চোখের জল ফেলতে গিয়ে কষ্টে সামলে নেয়। হঠাৎ ছায়া বলে: "সেই চেয়ারটা কোথায় গেল ফের মাসিমা?"

"কোন্‌টা?"

"যেটাতে অসিদা প্রথম বসেছিল আমাদের বাড়ি এসে সেই প্রথম দিন। কতবার বলি ও-চেয়ারটা এঘর থেকে নিয়ে যেও না—তবু তোমরা কেবলই যাবে ভুলে।"

আনন্দময়ীর স্মৃতি ফের ঝাপসা হ'য়ে আসে। কেমন ক'রে ও ছেড়ে যাবে এ-শিশুকে এমন সময়ে?





অসিতকে দেখে কমলা ওর স্থান ছেড়ে দিল। কমলার এমনিই ধারা—সব কাজেই নিজেকে ও রাখবে পিছনে: আশ্রমেও রাখত—এখানেও সেই একই ভাব। ছায়া সামনে থাকলে অসিত সচরাচর কাউকেই দেখতে পেত না স্পষ্ট ক'রে, কিন্তু আজ হঠাৎ কমলাকে ওর চোখে পড়ল। কী সেবাটাই না ও করতে পারে অম্লানবদনে—অথচ নিজেকে এতটুকু জাহির না ক'রে!

অসিতের মায়া করে, হঠাৎ বলে কমলাকে: "আহা, বোসো না ভাই।"

কমলা বলে: "তুমিই বোসো ভাই যার বসলে কাজ হবে। আমরা হসন্ত বৈ তো নই।"

অসিত সহজ হবার জন্যেই ধরে ঠাট্টার সুর: "ছায়ার কাছে হসন্ত নয় কেই বা কমলা? তাই আমি ওর পায়ের কাছেই বসব, তুমি নোড়ো না।"

ছায়া (রুষ্টসুরে): এ-ধরণের কথা ঠাট্টা ক'রেও যে বলে তার সঙ্গে আড়ি আড়ি আড়ি।

অসিত: তাহ'লে কিন্তু এ- 'অকস্মার ধাড়ি' যাবে না আর বাড়ি'—এখনো সাবধান, নইলে আরো মিল ঝাড়ব—'লেট যে রেলের গাড়ি—এ সুযোগ কি আর ছাড়ি?'

ছায়া খুশি হ'য়ে ওঠে, হঠাৎ বলে: "কিন্তু যদি বলি 'তুমি যে আনাড়ি'?—তাহ'লে?

অসিত চকিতে চেয়ে নিয়েই বলে: "বলব 'আহা নেই তো তাড়াতাড়ি—একটু দেখিয়ে দিলেই পারি' মানে, 'যদি মুখ না করো হাঁড়ি' কিম্বা 'ডেকে না আনো জ্বর জাড়ি।'

ছায়া সব ভুলে আগেকার সেই শিশুর হাসি হেসে ওঠে "আচ্ছা অসিদা, এত যোগ করলে—তবু কি এতটুকু গম্ভীর হ'তে পারলে—বিশেষ ঐ গুরুগম্ভীর আশ্রমে থেকে? যোগ করলে স্বভাব বদলায় কে বলে? সব ভু-ও। সেই প্রথম দিন তুমি যেমন দুষ্টু ছিলে আজও ঠিক তেমনিটিই আছ।" বলতে না বলতে ওর সুরে নেমে আসে বিষাদের মিড়: "মনে পড়ে অসিদা, সেই প্রথমদিন—না প্রথম দিন তো ঠিক আলাপ হয় নি—দ্বিতীয় দিন—সে—ই? যেদিন বাপী আমি আর মাসিমা গেলাম তোমার ওখানে? মনে আছে?"

অসিত ওর কপালে গালে হাত বুলোতে বুলোতে বলে: "নয়নের যিনি তারা—তাঁর সঙ্গে সেই প্রথম সই পাতানো—সে কি, কেউ চেষ্টা করলেও ভুলতে পারে রে?"

ছায়া হঠাৎ চোখ বুঁজে চুপ ক'রে থাকে···শুধু একটি ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে···প্রতিমা আঁচল দিয়ে মুছে নেয়।··· প্রীতি চোখে আঁচল দেয় চকিতে।

ছায়া চোখ মেলে তাকায় অসিতের পানে, তারপরে বলে: "চোখ বুঁজে কী দেখতে চেষ্টা করছিলাম জানো?"

"কী"

"তোমার আগেকার চেহারা—সেই প্রথম দিনের। জানো? চোখ বুঁজলে আজকাল আমি প্রায়ই তোমার সে-চেহারা পষ্টো দেখতে পাই—সেই চার বছর আগেকার।"···একটু চুপ ক'রে থেকে: "সত্যি অসিদা, সে-চেহারা আমার প—ষ্টো মনে পড়ে

—মনে হয় যেন চোখের সামনে দেখছি—তখন আমার জন্যে তো এত দুঃখু পাও নি ভাই, বাঁদিকের চুল অত সাদা ছিল না—হ্যাঁ, আরো, তখন তোমার পরণে ছিল গেরুয়া—খুব লাল রঙের—তখনতো তুমি পীতাম্বর ছিলে না—মনে আছে? ভারি হাসি পায় কিন্তু একটা কথা ভাবতে—সেকথাটা তোমাকে বোধহয় কখনো খুলে বলি নি।"

"কেন?"

"শুনলে যদি তুমি কষ্ট পাও—"

"এখনো?"

"অভিমানী যে—"

"সে এখন সেরে গেছে—তুই বল্।"

ছায়া একটু ভাবে তারপর বলে: "কি জানো? ছেলেবেলা থেকে আমার মনে হ'ত—যে গেরুয়া পরা মানেই ভড়ং—দেখো গো, আমি তোমাদের থেকে আলাদা। তোমাকে দেখে আমার প্রথম বিশ্বাস হয়—বেশ মনে পড়ে—যে গেরুয়াধারী মাত্রেই বাজে মার্কা নয়। মাসিমাকে বলেছিলাম একথা মোটরে, মাসিমা যে-দুষ্টু—হয়ত তোমাকে চুপি চুপি ব'লে দিয়েছে তার পর দিনই, কে জানে? কী মাসিমা, ব'লে দিয়েছিলে তো? জা—নি।"

"না মাণিক, এটা ব'লে দিই নি, সত্যি বলছি," ব'লে প্রীতি অসিতের দিকে তাকায়: "কী অসিদা? বলো একটা হ্যাঁ, নৈলে মেয়ে যে-শেয়ানা হয়েছে আজকাল, হয়ত ভাববে—"

ঠিক এই সময়েই অজয় ওঘর থেকে এসে বলল: "শেঠজির সেক্রেটারি—"ব'লেই এক তাড়া নোট ওর হাতে দিয়ে বলে: "রসিদটার জন্যে তিনি দাঁড়িয়ে।"

অসিত তাড়াতাড়ি রসিদ লিখে দিল। ছায়া কৌতূহলী হ'য়ে ওঠে: "কিসের রসিদ অসিদা? অত নোট—ও মা! ব্যাপার কী?'

অসিত হেসে বলে: "এমন কিছু নয়। শেঠজি দুহাজার টাকা পাঠিয়েছেন—গুরুদেবকে প্রণামী।"

ছায়া চোখ আরো ডাগর ক'রে বলে: "দু—হা—জা—র। না, ক্ষমা ভাই ক্ষমা। যে-অভিমানী তুমি হয়ত ঠোঁট ফুলোবে ভেবে যে ছায়া বলতে চাইছে তোমার কোনো ভজনের দাম দু-হাজারের কম।"

ওরা সবাই হেসে ওঠে।

অসিত বোঝে যে দুর্বল শরীরেও ছায়া যে এত কথা বলছে সে শুধু স্নায়ুর উত্তেজনায়। এটা ভালো না এ-ও সবাই বোঝে—বিশেষ ক'রে কালকের মূর্চ্ছার কথা ভেবে। কিন্তু ওকে কথা বলতে না দিলেও যে নয়। উভয়সংকট যাকে বলে। ওর অলক্ষিতে অসিত, প্রতিমা ও প্রীতি মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করে।

ছায়া যেন অন্তর্যামীর মতনই টের পায়: "ওতে কিচ্ছু হবে না। তাছাড়া শেষদিন তো—একটু বকতে দিলেই বা।"

প্রীতি ওর কপালে ঠোঁট ঠেকিয়ে বলে: "দূর পাগলি। সেদিন ডাক্তার নিজে এসে ব'লে গেলেন তোর অসুখ অনেকটা ভালো—"

ছায়া হাসে: "তোমাদের মনভোলানো কথা তো আছেই মাসিমা, আজ একটু অসিদার কথাই শুনি। বলো না ভাই, শেঠজি কী বললেন তোমার গান শুনে। না, ছোট ক'রে না—নিজের কথা বড় ক'রে যেমন বলতে তুমি আগে আগে—'আমি-কি-একটা-কেওকেটা' ভাব—ঠিক তেমনি ক'রে—আমার মাথার দিব্যি রইল নম্রতা ক'রে একটি কথাও বাদ দিতে পাবে না।" ব'লে কিন্তু আপন মনেই সমানে ব'কে চলে অসিতকে কিছু বলবার ফুর্সৎ না দিয়ে: "মনে আছে ভাই? সে—ই? যখন তোমাতে আমাতে যেতাম বাংলা গানের শত্রুদের দুর্গে তাদের জয় করতে—কী বলতে তুমি যেন? হ্যাঁ মনে পড়েছে—bearding the lions in their own dens—না? কিন্তু কী বলছিলাম যেন মাসিমা! ও মাসিমা, কোথায় গেলে ফের?"

প্রীতি ওদিকে পানের বাটা খুলে কি খুঁজছিল—ছায়ার ডাক শুনে তাড়াতাড়ি এসে বলে: "এই যে মাণিক।—তুমি বলছিলে যে বাংলা গান গেয়ে যখন তোমরা নানা সভায় যেতে দিগ্বিজয় করতে—"

ছায়া খুসি হ'য়ে বলে: "ঐ কথাটিই আমি খুঁজছিলাম মাসিমা। হ্যাঁ অসিদা, সে—ই, যখন তোমাতে আমাতে যেতাম দিগ্বিজয় করতে তখন প্রতি আসরে বহু লোককে মজিয়ে ফিরে এসে তুমি কী রকম ফেনিয়ে বলতে তোমার গান শুনে কে কী বলল, কে মাথা নাড়ল, কে চক্ষু বুঁজল—কেবল ভুলেও তাদের নাম করতে না যারা গল্প করল—মনে পড়ে? ঠিক সেই ভাবে বলো শেঠজির ওখানে কে তোমার গান

শুনে করল আহা, কে করল উহু আর কে বলল—কী কথাটা যেন? হ্যাঁ শোভানাল্লা, না?"

অসিত হাসি চাপতে পারে না ওর কপালে গাল ঠেকিয়ে বলে: "তোর আজ হয়েছে কী বল্ তো? দুষ্টুমি পেয়েছে বুঝি আগেকার মতন?".

ছায়া (হেসে): ধরেছ। আরো একটু দুষ্টুমি করব? করি?"

অসিত: কী?

ছায়া: জীবনের আলোয়ই তো মানুষ দেহে মনে বাড়ে—তোমরাই তো বলো কবিত্বের ভাষায়, বলো না?

অসিত: বলি।

ছায়া: তা যদি হয় তবে উল্টোটাও তো সমানই খাটবে—অর্থাৎ মরণের ছায়ায় মানুষ কমবে, কেমন না? তাই দেখনা, আমি ফের দেহে মনে সেই ছোট্ট ছায়া হ'য়ে গেছি যে আগে আগে তোমার সঙ্গে খুনশুড়ি করত—সে—ই? মনে আছে? যখন বাপী ছিল (হেসে) কী হাসাটাই যে সে হাসত আমি তোমার মুখ চেপে ধরলে—মনে আছে? বলত: 'ওরে পাগলি, অসিত মুখে কিছু বলে না ব'লেই কি মনে করিস ও আর তুই সমান?'

প্রতিমা যে প্রতিমা, তার চোখেও আজ জল ভ'রে আসে ওর অনর্গল কথা শুনে। কিন্তু সে সামলে নেয়। পারে না প্রীতি: সে উঠে গিয়ে জানলার কাছে মুখ বের ক'রে চোখ মোছে কমলা কথার মোড় ফেরাতে বলে: "হ্যাঁ। শেঠজির ওখানে কী সব কথা হ'ল বলো না ভাই—মোটরে তো আর তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার উপায় ছিল না।"

ছায়া টপ্ ক'রে বলে বিজ্ঞস্বরে : "তা কমলাদি, এ তোমার অন্যায়—আনন্দময়ী মার কাছে যখন অসিদা যাবে তখন কি আর তার মনে থাকতে পারে তোমার আমার মতন তুচ্ছ মেয়ের কথা? অসিদা যতই কেন না মেয়েদের ভালোবাসুক তারা ওকে টানবে যখন সাধু সন্তরা এসে দাঁড়াবে? ক্ষেপেছ? (অসিতের দিকে চেয়ে দুষ্টুমির সুরে) কী অসিদা? ঠিক ধরি নি? বলো তো বুকে হাত দিয়ে।"

প্রতিমা : শেঠজির ওখানে কী হ'ল বলতে যাচ্ছিলে?

অসিত বোঝে, একটু দুঃখও যে পায় না তাও নয়—ছায়া ধরেছে তো ঠিক। সাধুসন্তদের কথায় ওদের খুব আগ্রহ নেই ব'লেই প্রতিমা চাইল শেঠজির দিকেই কথার মোড় ফিরোতে। একটা উঠতি দীর্ঘনিশ্বাস চেপে রাখে : দেবদা তো আর নেই। সে থাকলে জিজ্ঞাসা করত সব আগে আনন্দময়ীর ওখানে কী কথা হ'ল। তবে অবশ্য—মনকে ও বোঝায়—যা খেয়ে খেয়ে এদের মন যে বিগড়ে গেছে আজ। দোষও তো দেওয়া যায় না। তবু···কেন এমন হয়···ভাবে ও বাইরের বকুল গাছটার পানে চেয়ে।

ছায়া : কী ভাবছ অসিদা? (হেসে) মার কথা বুঝি কানেও যায় নি?

অসিত চমকে উঠে বলে : "না না—বাঃ—" ব'লে একটু থেমে সুরু করে শেঠজির সঙ্গে কী কী কথা হ'ল।

আমেরিকা যাওয়ার কথা হ'তেই ছায়ার চোখের দৃষ্টি বদ্‌লে যায়। ওর বড় ইচ্ছে ছিল বিলেত যাওয়ার—প্রায়ই বলত কাশ্মীরে

যে ওর বাপী বলেছে বড় 'হ'লে ওকে পাঠাবে জার্মানিতে গান শিখতে। "তখন কিন্তু—" বলত আবদারের সুরে—"তোমাকে যেতেই হবে আমার সঙ্গে অসিদা, মনে রেখো—আশ্রম টাশ্রম তখনও যে মানব এমন কথা স্বপ্নেও ভেবোনা।"

প্রীতি: শেঠজির মৎলব তাহ'লে তোমাকে মিশনরি ক'রে ওদেশে পাঠানো?

ছায়া: সে তো ভালোই মাসিমা—কারণ গানের মধ্যে দিয়ে যে প্রচার কত তাড়াতাড়ি হয়—বুঝছ না? শেঠজি কিন্তু একটা কথা বলেছিলেন ঠিক—যদিও সেকথা আমি বলেছিলাম তাঁরও আগে, মনে আছে? সে—ই? কাশ্মীরে? মনে নেই? বাঃ।

প্রতিমা (হেসে): কী যে পাগলি তুই! কাশ্মীরে তুই অসিতকে কত কথাই তো বলতিস নিরালায়—

ছায়া (একথা কানে না তুলে): তুমিও তো ছিলে মাসিমা, মনে নেই? সে—ই?

প্রীতি (হেসে): মিড় দিয়ে সে—ই বললেই বুঝি মাসিমারা বোনঝি হ'য়ে দাঁড়ায়? তাছাড়া অসিদার কথা আমাদের মনে থাকবে কেন রে মেয়ে? সে তোর সম্পত্তি—আমাদের দায়ে পড়েছে তার কথা মনে রাখতে!

অজয়: আহা, কী বলেছিলে তুমি নিজেই বলো না ছাই।

ছায়া: সেই বাপী হোহো ক'রে হেসে উঠে বলল: অসিত তুমি আশ্রমে গিয়ে ভালোই করেছ—মনে পড়ছে?

অসিত: এবার পড়েছে। বলেছিল—নৈলে সংসারে তোমাকে সবাই দোহাত্তা ঠকাত—এই তো?

ছায়া (প্রীত) হ্যাঁ। কিন্তু তারপর? ও। তোমারই আর একটা কথা মনে পড়ল :—যারা স্রষ্টা তারা সহজেই ভুলে যায়। কিন্তু অসিদা, আমি নই এদের দলে—কাজেই মুখস্থ করতে পারি—তাই শোনো আমিই বলি।

অসিত : সে-দলে ভরতি হবি তুইও বড় হ'লে।

ছায়া : উঁহুঃ—আমাকে যত বোকা ঠাওরাও তোমরা তত বোকা আমি নই। আমি ভেবে দেখেছি—মেয়েরা স্রষ্টা হ'তে পারে না—কিছুতেই না। কিন্তু সে যাক্—তারপর কী বলছিলাম?

অজয় : তোমার বাপী বললেন অসিত আশ্রমে গিয়ে ভালোই করেছে।

ছায়া : হ্যাঁ বলল। প—ষ্ট মনে আছে আমার। বাপী প্রায়ই বলত যে অসিতকে দেখলে ওর বড় মায়া করে—বলত না অসিদা?

অসিত (হেসে) : বলত তো—কিন্তু তারপরে কী হ'ল বল্ না।

ছায়া : বাপা বলল তুমি আশ্রমে গিয়ে খুব ভালো করেছ নৈলে তোমাকে লোকে হয় ঠকাত—নয় চিনত না। তাতে আমি বলেছিলাম : 'তা হ'তে পারে বাপা, কিন্তু এমন লোকও মিলত দু'একটা যারা তোমাকে শুধু ঠকাত না তাই নয়, একটু একটু চিনতেও পারত। আজ শেঠজির মানুষ চেনার গুমরে আর এই প্রণামী দেওয়ার আগ্রহে সেই কথাই মনে পড়ছে আমার। অসিদা—আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে আজ—কেউ কেউ অন্তত তোমায় চিনতে পারে দেখে!

হঠাৎ ওর চোখে জল ভ'রে আসে। প্রতিমা মুছিয়ে দেয়: "কাঁদে না মাণিক।"

এ-শিশুকে ফেলে যাবে ও কী ক'রে—এ অবস্থায়? গুরুদেব।

* * * *
* *

প্রতিমা যতই ছায়ার চোখের জল মোছে ততই ফের জল গড়িয়ে পড়ে। শুধু নিঃশব্দ ধারাবর্ষণ।

অসিত ঝুঁকে প'ড়ে ওর কপালে গাল রেখে বলে: "লক্ষ্মী নয়নতারা। তুমি অমন করলে আমি কী ক'রে আজ রাতের গাড়িতে যাই বলো দেখি?"

প্রীতি ও কমলা চোখে আঁচল দেয়। কেবল প্রতিমা চুপ ক'রে শিয়রে দাঁড়িয়ে ছায়াকে হাওয়া করে খসখসের পাখায়।

অসিত বলে: "আমি আবার আসব ভাই। তুমি তার করলেই চ'লে আসব—মানে যদি, ভগবান না করুন, তোমার শরীর একটুও খারাপ হয় ফের। তার করেছ কি আমি উড়ে এসেছি—ধ'রে রাখো।"

ছায়ার মুখে আর কথা ফোটে না। বন্যায় হঠাৎ বাঁধ এল কোথেকে? প্রতিমা সন্ত্রস্ত হ'য়ে বলে: "হঠাৎ চুপ ক'রে গেলি কেন মাণিক? শরীর খারাপ লাগছে না তো?"

ছায়া (ঘাড় নেড়ে) না মা।

প্রতিমা: তবে?

ছায়া: বাপীর কথা বড্ড মনে পড়ছে আজ মা, কিছুতে ঠেকাতে পারছি নে। অসিদাও আজই তো রাতে—

বলতে বলতে ও সামলে নেয়। শুধু চোখ উপছে গাল্ বেয়ে জল পড়ে—কিন্তু শান্ত সংযত কান্না।

এবার প্রতিমাও পারে না সামলাতে—জানালার কাছে স'রে গিয়ে চোখ মোছে। কিন্তু অল্পক্ষণের জন্যে। তারপরেই ফের ছায়ার শিয়রে এসে ওর চুলে কপালে গালে হাত বুলিয়ে আদর ক'রে মাথায় চুমো দিয়ে বলে: "কাঁদে না মাণিক। তুমি সুবুদ্ধি মেয়ে, তোমাকে কী বোঝাবো বলো? সবই তো বোঝো—আর আমাদের চেয়ে হয়ত ভালোই বোঝো।"

ছায়া (কান্না জোর ক'রে চেপে): আমি সুবুদ্ধি মেয়ে কোথায় মা? হ'লে কি তোমাদের এত ভোগাই?

প্রতিমা কোনোমতে চোখের জল সামলায় ফের, বলে: "তুমি তো ভোগাও না মা। ভুগি আমরা অদৃষ্টের দোষে।"

ছায়া অসিতের একটা হাত হঠাৎ টেনে নেয় ওর হাতের মধ্যে: "অসিদা।"

অসিত: কী দিদি?

ছায়া: কিছু মনে কোরো না ভাই। ভেতরে কী একটা যেন নড়চড় হ'য়ে গেছে আজ আমার। নৈলে সবার সামনে একগলা চোখের জল ফেলি? কত লজ্জা যে হয় এর জন্যে—পরে। কিন্তু—(দীর্ঘনিশ্বাস) সাম্‌লাতে পারি না। তবে তুমি ক্ষমা করবে জানি—তুমি যে জ্ঞানী—বাপী বলত মনে আছে অসিদা? সে—ই? (চোখের জলে ওর হাসি ফুটে ওঠে) আর

তুমি মনে খুসি হ'য়েও বাইরে দেখাতে 'কী যে বলো কী যে বলো' ভাব? মনে পড়ে?

অসিত (আদর ক'রে): ভেতরে নড় চড় হ'য়ে গিয়েছে কি না জানি না—কিন্তু বাইরে যে দুষ্টুমি ঠিক তেমনি খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে একথা হলপ ক'রে বলতে পারি।

নার্স (দ্রুতপদে এসে): ডাক্তারেরা সবাই এসেছেন।

ওরা সবাই বেরিয়ে যায়—যাবার সময়ে প্রতিমা মৃদুস্বরে অসিতের কানে কানে বলে: "তুমি থেকো ভাই—ডাক্তারের সঙ্গে আজ অনেক কথা আছে আমাদের। হয়ত একটু দেরিই হবে।"

ঘরে শুধু ওরা দুজন। ছায়া একদৃষ্টে চেয়ে থাকে অসিতের চোখের পানে।

ঘড়ি করে টিক টিক টিক।

* * * *

* *

"কী ভাবছেন আবার নয়নতারা।"

"বলো তো দেখি?" ছায়া হাসে। "কী তোমার কথাটা যেন? ভাবগ্রাহী জনার্দন, না? দেখ অসিদা, শুধু যে তোমার গানই মনে রাখি তাই নয়—কথাও। এমন ছাত্রী আর পাবে ভেবেছ?"

একথা যে কত সত্য অসিতের চেয়ে বেশি জানে কে?...সে বাইরের দিকে চেয়ে ছায়ার ম্লান কপালে হাত বুলিয়ে দেয়...গালে... চুলে...পিঠে। হঠাৎ এত দুর্বল মনে হয় নিজেকে। মনে মনে ডাকে গুরুদেবকে, আনন্দময়ীকে। সত্যিই কি এমন ফুলটি আফোটা

ঝ'রে যাবে? করুণা কি অন্য পথ বেয়ে দেখা দিতে পারে না? ভাবতে কিন্তু আবার গ্লানি আসে। এ তো নয় আত্মসমর্পণের পথ। যা আসবে তাকেই না নিতে হবে বরণ ক'রে? ও ডাকে ভগবানকে: বল দাও। আমি দুর্বল, বুঝতে পেরেছি—আর কেন? ছায়াকে শিখিয়েছিল কবি নিশিকান্তের একটি গান—আজ মনে পড়ে কেবলই ঘুরে ফিরে:

হে অচল, আছ আমার চলায়,
জানি—তবু জানি না যে!
শুধু বাঁধন সাধিয়া মরি যে কাঁদিয়া
বারে বারে ব্যথা বাজে—পথমাঝে।
তোলো—মোরে তোলো
ভব-বন্ধন পরি' এসো তুমি হরি,
বন্ধন মম খোলো—মোরে তোলো।

"কী? বললে না কিছু! আচ্ছা অসিদা—বেশ। চিনবে—যখন হারাবে।"

অসিত চমকে ওঠে: এ-ও যে ওরই কথা—বলে তাড়াতাড়ি: "অমন কথা ঠাট্টা ক'রেও বলতে নেই ছায়া।"

"কেন নেই?" ও হাসে। "গুরুর কথার প্রতিধ্বনি করার নামই তো ভক্তি অসিদা—তোমরাই বলো।"

"কিন্তু আমি তো তোমার গুরু নই দিদি—আপন ভাই—বন্ধু।"

"না অসিদা, আমি শুধু তোমাকেই মানি গুরু ব'লে, আর কাউকে নয়। দুঃখ পেয়ো না ভাই—কিন্তু জানো তো সবই।"

অসিত জানত। জানত যে রাজুর মৃত্যুর পর থেকে ওর মন এত বিমুখ হ'য়ে গিয়েছিল যে এমন কি গুরুদেবের কথায়ও আর পারত না সাড়া দিতে। কেবল গানের সময়ে হ'ত উল্টোগতি তখন মনের বিদ্রোহ যেত নিস্তেজ হ'য়ে হৃদয়ের দুয়ার যেত খুলে—সে কোন্ নীড়ের দিকে?…কেউ কি জানে?"

"জানি দিদি। তাই তো আরো প্রার্থনা করি তোমার জন্যে।"

ছায়া (প্রফুল্ল হবার চেষ্টা ক'রে): আচ্ছা, কী প্রার্থনা করো অসিদা? বলো না।

অসিত: শুনতে কি সত্যিই ইচ্ছা করছে?

ছায়া: অন্য সময়ে হ'লে করত না। কিন্তু—

অসিত: কী?

ছায়া: আজ করছে।

অসিত: কেন?

ছায়া ওর চোখের দিকে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে বলে ম্লান হেসে: "এটুকুও বুঝতে পারো না?—তবে তুমি কিসের যোগী?"

অসিতও হাসে মনমরা হাসি, বলে: "আমি যে যোগী নামের কত অযোগ্য ভাই, তা আমার চেয়ে বেশি কে জানে?"

ছায়া ওর দুটি হাত টেনে নিয়ে নিজের হাতের মধ্যে, বলে: "এই জন্যেই আমি সবচেয়ে দুঃখ পাই অসিদা, জানো?"

"কী জন্যে?"

"বুঝতে পারো না? আমার 'পরে তোমার টান একটু বেশি হ'য়ে পড়লে তোমার কষ্ট হয়—ভাবো যোগ বুঝি তুমি তেমন চাও না।"

অসিত চম্‌কে ওঠে···কিন্তু কী বলবে এর উত্তরে?

ছায়া তর্জনী তুলে শাসিয়ে বলে: "বলো? ধরি নি ঠিক?—অসিদা! যোগ না করলেও কেউ কেউ অন্তর্যামী হ'তে পারে—মান্‌ছ?"

অসিত চুপ ক'রে থাকে: এ কি সেই ছায়া?

ছায়া বলে কোমল কণ্ঠে: "কিন্তু ঠাট্টা আর না। সত্যি, দুঃখ পেয়ো না ভাই আমার জন্যে। আমি দুর্বল কিন্তু স্বার্থপর নই—বিশ্বাস কোরো।"

"সে-কথা শুধু আমি কেন দিদি, সবাই বিশ্বাস করে।"

ছায়া একটু চেয়ে থাকে ফের ওর চোখের দিকে, বলে: "কিন্তু তোমাকে আমি যা বিশ্বাস করাতে চাই অসিদা—সেটা সবাই যেটুকু করে তার চেয়ে হয়ত কিছু বেশি।"

"কী?"

"যে আমি বুঝি।"

"কী বুঝিস শুনি?" অসিত জোর ক'রে প্রফুল্ল হ'তে চেয়ে 'তুই' ধরে।"

ছায়া একটু চুপ ক'রে থাকে, পরে চোখ নামিয়ে নিয়ে অসিতের গলার রুদ্রাক্ষের মালাটা নাড়তে নাড়তে বলে: "যে—তোমার—ক্ষতি হয় আমার—আমাদের কাছে বেশি এলে।"

"কী পাগল!"

"ফের ভোলাবার চেষ্টা? চোখে ওর জল আসে ফের, কিন্তু সাম্‌লে নিয়ে বলে থেমে থেমে: "শোনো···কারণ আর হয়ত বলার সুযোগ

হবে না কখনো—কিন্তু না, থাক্ কী হবে মিছিমিছি তোমার দুঃখের বোঝা বাড়িয়ে ?"

অসিত ওর চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বলে: "এত শত যে বোঝে সে কি শুধু এইটেই বোঝে না যে এরকম ক্ষেত্রে দুঃখ থেকে বাঁচাতে চাইলেই বেশি দুঃখ দেওয়া হয় ?"

ছায়া খানিক্ষণ একদৃষ্টে অসিতের পানে তাকিয়ে থেকে বলল: "আচ্ছা বলব। কিন্তু শুনে হয়ত তুমি বলবে তাচ্ছিল্যের সুরে—'ও মা, এই! একটা স্বপ্ন বৈ কিছুই নয় ?"

"স্বপ্ন ? কখন ?

"আজই সকালে। কিন্তু শোনো, আগে একটা প্রশ্ন আছে—ঠিক উত্তর দেবে ?"

"যদি জানি।"

ছায়া অতিষ্ঠ সুরে বলে: "তুমি জানো অসিদা, তবু কেন না-জানার ভঙ্গি করো ? এত অসাধ ধরা দিতে ? কেন ?"

অসিত হেসে বলে: "তোমার অসিদাকে তুমি ঠাউরে আছ সবজান্তা, অথচ আসলে সে এখনো 'জান্তা'ও হ'তে পারে নি—যার জন্যে তার সব চেয়ে দুঃখ হয় কখন শুনবে ?"

"কখন ?"

"যখন সে তোমার কাছে আসে। কারণ তখন মনে হয় কেবলই—আহা যদি সত্যি জানতাম।"

"রাখো রাখো—আমার জানা আছে। না অসিদা, আজ তোমাকে বলতেই হবে আমাকে—কোনো ওজর নয়।"

অসিত হেসে ফেলে: "তুই কী মুশকিলেই যে ফেলিস মানুষকে! সাধনা না করলে কি কেউ পূর্ণজ্ঞানী হয় রে?"

ছায়া বলে অতিষ্ঠ স্বরে: "পূর্ণজ্ঞানীদের পর্ণ বাণী আমি চাই নে অসিদা, তোমার ম'ত অপূর্ণেরো অর্ধজ্ঞানেই আমার চলবে। না, অর্ধজ্ঞানই বা বলি কেন?—তুমি যা জানো বোঝো তার সিকির সিকির সিকির সিকিও যদি আমি বুঝতে পারি বলব নিজেকে—বা রে আমি!"

অসিত একটু চুপ ক'রে থেকে বলে: "তোর কথায় বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে দিদি! মনে হয়—আহা, আমার গুরুকে যদি আমি এমন ভক্তি করতে পারতাম!"

ছায়া বলে: "ভক্তি টক্তি আমি জানি না অসিদা—সাফ কথা তবে বিশ্বাস কাকে বলে একটু হয়ত বুঝি। তোমাকে আমার পুরো বিশ্বাস হয়। তাই জানতে চাইছি।"

"বল্। আমি যা জানি—বলব।"

"কথা দিচ্ছ?"

অসিত হাসে: "এর নাম বুঝি বিশ্বাস-হওয়া?"

ছায়াও হাসে: "এবার নিয়েছ একহাত। আচ্ছা—আর কথা চাইব না।"

"কথা দিচ্ছ?"

ছায়া হেসে ওঠে শিশুর ম'ত।

* * * *

* *

অসিত হাসে : "জানতে চেয়েই মুখে চাবি !"

ছায়া বলে আচম্‌কা : "করুণা কাকে বলে অসিদা ?"

অসিত চম্‌কে ওঠে বলে : "এই প্রশ্নই যে আমি আজ করেছিলাম আনন্দময়ীকে—"

"তাঁর কথা কে শুনতে চাইল ?—আমি চাই শুধু তোমার কথা শুনতে। তুমি জানো—করুণা কাকে বলে ?"

"কিছু জানি। আর—"

"আর—কী ?"

"হয়ত ঐটুকুই জানি—তার বেশি যেটুকু সে শোনা কথা।"

"তাহলে আমি ঐটুকুই শুনব—তার বেশি না। বলবে এবার ? মানে যেটুকু শুধু তুমি জানো ?—ব্যস্‌।"

অসিত বিপন্ন বোধ করে : "তুই যে কী মুশকিলে ফেলিস সময়ে সময়ে। —তবু···রোস্‌ আমি যাচাই ক'রে নিই কতটুকু আমার জানা কথা আর কতটা শোনা।" একটু ভেবে : "শোনো দিদি, ছেলেবেলা থেকে আমি খুব বেশি আদর যত্ন পেয়ে মানুষ। যখন মা মারা যান তখন আমার বয়স ছয়। কিন্তু বাবার স্নেহের গুণে একদিনও মার অভাব বোধ করি নি। করুণা প্রথম বুঝি বোধ হয় এই উল্টো পথেই : যা প্রায় সবাই পায় পাই নি আমি—মানে মার স্নেহ—একে অকরুণা বললে অন্যায় হয় না। কিন্তু ঠিক এই পথেই পেলাম যা খুব কম লোকেই পায় —অর্থাৎ বাপের মধ্যে বাপ ও মায়ের মিলিত স্নেহের চেয়েও বেশি স্নেহ। অঙ্কে দুই আর দুইয়ে চার। কিন্তু স্নেহে

দুই আর দুইয়ে পাঁচ। কেন না স্নেহের তৃপ্তি নিবিড়তা থেকে। আমি জানি—যদিও প্রমাণ করতে পারি না—যে মাতৃহারা হওয়ার দরুণ বাবার কাছ থেকে যে-স্নেহ পেয়েছিলাম তার তৃপ্তি বাবা মা দুজনের স্নেহের তৃপ্তি ঠিক্ দিলে যা হয় তার চেয়েও বেশি। স্পষ্ট হচেছ্ কি ?"

"বিলক্ষণ। আমি কি আর সেই ছায়া আছি না কি? তারপর? থেমো না ভাই। এইই আমি চাই আজ শেষদি—না না—আজকের দিনে: শুধু তোমার কথা—আর কারুর নয় কিন্তু।"

অসিতের বুকের মধ্যে ফের টন টন ক'রে ওঠে। জোর ক'রে বলে সহজ মুখে: "কিন্তু তখন একে করুণা ব'লে চিনতে পারি নি তাব'লে। পারলাম যখন বাবা মারা গেলেন। আমার বয়স তখন ষোলো। তিন ঘন্টার মধ্যেই মারা গেলেন হঠাৎ—মাথায় রক্ত উঠে। শেষ নাম নিয়েছিলেন আমারই। দেখা হয় নি। আমি ছিলাম ফুটবল মাঠে, ফিরে এলাম যখন বাবা অজ্ঞান—মুখ বিবর্ণ, ঠোঁট নীল। যাঁর কখনো বিষম লাগলে আমার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠত—তাঁর দেখলাম হঠাৎ ঐ অবস্থা—জ্যোতির্ময় মুখ মুহূর্তে অন্ধকার।—তার পরে শুধু ছায়া আর ছাই।...

ছায়ার চোখ জলে ভ'রে আসে।

অসিত ওর চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলে: সে-শূন্যতা আমি ভুলতে পারব না। কারণ আমি জানতাম আমার বাবা সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তিনি শুধু কবি ও প্রতিভাবান ছিলেন ব'লে বলছি না একথা। মানুষের মধ্যে তাঁর চেয়ে বড় কবি দেখেছি

এক আধটা—কিন্তু কবিদের মধ্যে তাঁর চেয়ে বড় মানুষ দেখি নি—এক গুরুদেব ছাড়া অবশ্য। কিন্তু গুরুদেবকে তো ঠিক মানুষ বলা যায় না। তাই সে-সময়ে মনে হ'ত বাঁচব কী ক'রে?"

ব'লে একটু থেমে: "কিন্তু সেখানেও করুণা দেখা দিল বড় আশ্চর্য পথে। সব বলার আজ সময় হবে না—হয়ত বলা যায়ও না। তবে মোটামুটি ব্যাপারটা এই—" অসিত একটু ইতস্তত করে, তার পর বলে: "শুনলে তোর অবাক লাগবে ভেবেই বলতে কুণ্ঠা আসছিল—কিন্তু তবু বলবই আজ। শোন্: আমি কিশোর বয়সেই শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবেসেছিলাম···মনে হ'ত তাঁকে না পেলে আমার চলবে না। তাঁর কাহিনী পড়তাম আর আমার দু'চোখে ব'য়ে যেত নদী।···তারপর ভালোবাসলাম পরমহংসদেবকে। না—বিবেকানন্দকে না। শুধুই পরমহংসদেবকে। দেশের কাজ করব—দরিদ্রসেবা করব এসবে উৎসাহ আসত অবিশ্যি সময়ে সময়ে—কিন্তু ধোপে টিঁকত না —হৃদয়ের সব তারগুলি বেজে উঠত শুধু পরমহংসদেবের কথায়: 'জগৎ কি এতটুকু গা যে তার উপকার করবে?—তুমি শরণ নাও তাঁর—যিনি জগৎ চালাচেছন। তারপর যদি তাঁর আদেশ পাও কোরো কর্ম—তাঁর যন্ত্রী হয়ে। কিন্তু তার আগে না। কারণ তাঁকে পাওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য—স্কুল কলেজ হাঁসপাতাল করা নয়।' এই ধরণের তাঁর আরো কত কথামৃত।"

"রোসো। ভগবানকে না জেনেই মেনে নিলে যে তিনিই জীবনের উদ্দেশ্য?"

"নিলাম। আর এইটেই হ'ল আমার জীবনে করুণার বোধহয় সবচেয়ে বড় প্রমাণ। কারণ আমি স্বভাবে দারুণ অবিশ্বাসী। সংশয় বিচার তর্ক প্রশ্ন আমার শুধু রক্তে নয়—অস্থিতে মজ্জায়—উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া—অথচ আমি চেয়ে বসলাম কিনা সেই সত্যকে যাকে তর্কে মেলে না—যার বনেদ হ'ল অন্ধ বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা এ যে আমি কী ক'রে পারলাম ভাবতে আজও ধাঁধা লাগে—কেন না কোনো শোক তাপ পেয়ে আমি ঝুঁকি নি ভগবানের দিকে, কোনো আশাভঙ্গের ঘা খেয়েও না। সংসারে মানুষ যা যা কাম্য মনে করে ছিল আমার সবই—অঢেল। তবু যে আমি কেন ঝুঁকলাম ভগবানের দিকে—আজও জানি না। তবে গুরুদেবের কাছে এর আংশিক উত্তর পাই: তিনি বলেন যে শুধু আমরাই যে ভগবানকে চাই তা নয়—ভগবানও চান আমাদেরকে—শুধু তাই নয় অনেক সময়ে তিনি আমাদের টেনে উপ্‌ড়ে আনেন আমাদের নিজেদের চিরপরিচিত জন্মভূমি থেকে—যেমন অনেক গাছকে মানুষ উপ্‌ড়ে আনে শিকড় শুদ্ধু অন্য মাটিতে বসাতে। আমারো সত্যিই মনে হ'ত—আমাকে তিনি ঠিক তেম্‌নি—গায়ের জোরেই বসিয়েছেন তাঁর নিজের জমিতে। কিন্তু একথা তোমাকে মুখের কথায় কী ক'রে বোঝাব বলো?"

ছায়া একটু ভাবে, পরে বলে: "একে তুমি বলছ করুণা—কিন্তু অপরে তো উল্টো নামেই ডাকতে পারে?"

অসিত হাসে: "শুধু পারে বলছিস কেন?—ডাকছেই তো। আমার আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে প্রায় পনের আনার সঙ্গে সব সম্বন্ধ চুকে গেছে তো এই জন্যেই রে। অথচ এও যে সেই

করুণারই প্রকাশ বুঝি—যখন শুনি তাঁর বাঁশি। তখন মনে হয় যে এ-ডাক যে শুনেছে তার কাছে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন ধনজন, যশোমানের কী-ই বা দাম? অথচ এই প্রত্যেকটি জিনিসের প্রতি আমার আসক্তি ছিল প্রবল। কিন্তু সবচেয়ে বেশি আসক্তি ছিল যেখানে, সবচেয়ে বড় বদল এলও ঠিক সেই খানেই। কিন্তু সেকথা তোমাকে বলবার নয়—তুমি হয়ত বুঝবেও না।"

ছায়া ম্লান হাসে: "তুমি আমাকে যত ছেলেমানুষ ভাবো আমি তত ছেলেমানুষ নেই অসিদা। তাই জানি তুমি কী বলতে চাইছ অথচ কুণ্ঠা বোধ করছ। জোর আমি করব না—যা বলতে বাধে না-ই বললে: কিন্তু অন্তত এটুকু আমাকে বলতে পারবে কি যে, সবচেয়ে বড় আসক্তি ছিল, তোমার যেখানে ঠিক সেইখানেই যে সবচেয়ে বড় বদল হয়েছে এ তুমি টের পেলে কেমন ক'রে?"

অসিত চমকে ওঠে। ছায়া যতই বড় হোক, এধরণের চিন্তা বা প্রশ্ন যে ও ভেবেছে বা ভাবতে পারে তা ওর কখনো মনে হয় নি। তাই যেদিন ও বলেছিল "দুধারা" ওর কী যে ভালো লেগেছিল সেদিন অবাক্ হ'লেও এই ভেবে কথাটাকে ডিশমিশ ক'রে দিয়েছিল যে দুধারার আসল বক্তব্যটা কী ও টেরই পায় নি; কিন্তু একথার পরে তো আর সন্দেহ করা চলে না। বলল: "একথার উত্তর দিতে সংকোচ হয় ছায়া—বিশেষ তোমার কাছে।"

"কেন অসিদা?"

"বলব? না থাক্।"

ছায়া ধ'রে পড়ল : "অন্তত এইটুকু বলো যে 'বিশেষ আমার কাছে' কথাটার মানে কী?"

'কারণ—করুণার সবচেয়ে বড় প্রমাণ পেয়েছি আমি তোমাকে চিনে তবেই।—শোনো এতটাই যখন বললাম তখন বলি আর একটু—নৈলে কথাটা একটু যেন হেঁয়ালি-মতনই থেকে যাবে।"

ছায়া সাগ্রহে বলল : "হ্যাঁ বলো ভাই।" ব'লেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে : "তাছাড়া আজ না বললে আর হয়ত কোনোদিন শোনাও হবে না আমার।"

"অমন কথা বার বার বলে? ছি!"—ব'লে জোর ক'রে প্রফুল্ল হবার চেষ্টা করে অসিত : "তাছাড়া তুই সেরে উঠলে আরো কত কথাই যে পুঁজি ক'রে রেখেছি সে-খবর রাখিস নে তো? প্রীতি আমাকে প্রায়ই বলে কথার ঝুলি। কিন্তু সে-ঝুলি যে কী দারুণ মস্ত সে-ও জানে না—তুইও না।"

ছায়া হাসে : "না জানতে পারি কিন্তু মানি। কারণ তুমি ভাই ক—ত দেখেছ, ক—ত শুনেছ ক—ত ভেবেছ, বাপীও বলত। কেবল এইটুকু হয়ত ভেবে দেখো নি যে, ঝুলির সব কিছু সব সময়ে খালি করা যায় না।"

"মানে?"

"এমন কিছু নয়—থাকগে।"

"না থাকবে না। আবদার বুঝি শুধু তোরই একচেটে?"

ছায়ার মুখে কেমন একরকম হাসি ফুটে ওঠে···একটু চুপ ক'রে চেয়ে থাকে অসিতের চোখের পানে, তারপর বলে চাপা সুরে :

"মরণের ছায়ায় অনেক কথা ফাঁশ করা যায়—যা জীবনের আলোয় যায় না—একথা একদিন তুমিই বলেছিলে ভাই, ভুলিনি আমি।"

অসিতের হৃদয় টনটন ক'রে ওঠে। ও ছায়ার কপালে ওষ্ঠ-স্পর্শ করে তারপর বলে: "আচ্ছা বলি তবে—যদিও একটু সংক্ষেপেই বলতে হবে।" সুর নামিয়ে নিয়ে: "আমার সব চেয়ে দুর্বলতা ছায়া, মেয়েদের ক্ষেত্রেই। সে-দুর্বলতা সাধারণ—কিন্তু আমার কল্পনা এত প্রবল যে—যে কী বলব—সাধারণ টানও আমার কাছে দেখতে দেখতে ওঠে ফেঁপে।"

ফের একটু ইতস্তত ক'রে অসিত বলে: "এজন্যে আমি ভুগেছি বিস্তর। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বড় বড় স্খলন থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি এ ও তা নানারকম অবান্তর যোগাযোগে—নিজে মনের জোরে নয়। সেসব খুঁটিয়ে বলবার আজ সময় নেই—তার দরকারও দেখি না। কেবল এইটুকু বলতেই এত ভূমিকা যে, প্রতি ক্ষেত্রেই নিষ্কৃতি পেয়েছি অভাবনীয় ভাবে। তাই আসক্তি অনেকবার গ্রাস করলেও মোহ বাঁধতে পারেনি আমাকে—যে-ই সে গলায় পরিয়েছে ফাঁশ—দড়ি গেছে ছিঁড়ে। এ-ও আমার কোনো নিজস্ব বীরত্বে নয়—সংযমের গুণে তো নয়ই—কেবল ঐ যে বললাম—তাঁর করুণায়।"

অসিত একটু থেমে জোর ক'রে কুণ্ঠাকে দাবিয়ে রেখে বলে: "অথচ আমার কী যে তৃষ্ণা ছিল পবিত্রতার—বললে হয়ত কেউই বিশ্বাস করবে না। কিন্তু তুমি করবে ব'লেই বলছি যে, আশ্রমে না গেলে আমি যে ঠিক থাকতে পারতাম না—এ-ও আমার আশ্রমে

যাওয়ার একটা প্রধান কারণ। আমি মনে প্রাণে চেয়েছি নিষ্কাম অবস্থা পেতে। সংসারে এ আমি পারতাম না…কারণ…কারণ আমার ইচ্ছার রাস আমার ঝোঁকালো প্রবৃত্তিকে কিছুতেই রুখতে পারত না।"

"কিন্তু ইচ্ছার শক্তি কি বাড়ানো যায় না অসিদা?"

"যায়—তবে সেখানেও আমার কাছে অন্তত করুণাই সব চেয়ে বড় শক্তিদাত্রী হ'য়ে এসেছে। কী ভাবে—তোমাকে বোঝাতে পারব না দুকথায়, তাই এইটুকু ব'লে থামতে হবে যে আমি বার বার শক্তি চেয়েছি কাতর হ'য়ে প্রার্থনা ক'রে তবে। দৃষ্টান্ত দিতে বাধে—বিশেষ তোমার কাছে।"

"বিশেষ আমার কাছে—বলছ কেন?"

"কারণ…তোমার কাছেই আমি সবচেয়ে বেশি পেয়েছি পবিত্রতার প্রেরণা। এখানে তাই তুমি আমার ছাত্রী নও—আমিই শিখেছি তোমার কাছে—না শোনো, বাধা দিও না এখন।—কিন্তু"—আরো মৃদু স্বরে: "এ-ও বলব যে এটুকুও সম্ভব হ'ল ভগবানেরই করুণায়। নৈলে সংসার ত্যাগ করার পরেই তোমার দেখা পাব কেন বলো—যার স্বভাবের নিখুঁৎ পবিত্রতা আমার পবিত্রতার আকাঙ্খাকে সবচেয়ে বেশি প্রেরণা দিয়েছে এ-জীবনে?"

"আর একটু খুলে বলো ভাই, লক্ষ্মীটি। তুমি কি ভাবো অসিদা, আমাকে লড়তে হয় নি কখনো? না, কেউই চায় নি আমার দুর্বলতার সুযোগ নিতে? সবাই তো অসিদা নয় ভাই।"

গভীর স্নেহে অসিতের মন আবিষ্ট হ'য়ে আসে, ও বলে: "কিন্তু আমাকে তুমি যা ভাবছ আমি তা নই দিদি। তোমাকে

তাই তো চেয়েছিলাম এত কাছে···অথচ প্রার্থনা করেছি যে কত···যেন কোনোদিন এতটুকু দাগও না লাগে তোমার দেহে মনে। কি জানো দিদি, আমি বড় বেশি চেয়েছি এমন একটি আধার যাকে তেম্‌নি অকুণ্ঠে ভালোবাসতে পারি যেমন ভাবে আমার হৃদয় চায়--অথচ যেন তার সত্তার কোথাও আমার হাজারো অশুচি অশান্তি মলিনতার এতটুকু আঁচও না লাগে—মতিভ্রমে কোথাও যেন ভুল ছন্দ ঠাঁই না পায় স্নেহের লেনদেনে। ভগবানের কাছে কতদিন যে করেছি এই প্রার্থনা—তুমি জানবে কী ক'রে? তাই তো সে-প্রার্থনায় মিলল সাড়া—পেয়েছিলাম তোমাকে দিদি—ঠিক যেমনটি আমি চেয়েছিলাম।"

"কেবল এক জায়গায় নয় অসিদা—বাড়িয়ে বোলো না।"

"না, সে-জায়গায়ও। তুমি জানো না—এখানে তোমার হৃদয় কী চায়। কিন্তু বড় হ'লে জানবেই—তবে হয়ত ঘা খেতে হবে আরো—ভুগতে হবে।" কিন্তু সে যাক। এসূত্রে আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তা এই যে তোমাকে আমি চেয়েছিলাম—শুভ্র ফুলটিকে যেভাবে চায় পূজারী। ভগবান আমার প্রার্থনা শুনেছেন—তোমাকে হাতে পেয়েও যে এতটুকু মলিন করি নি, এতখানি প্রভাব পেয়েও যে তার অপব্যবহার করি নি নিজের স্বার্থের জন্যে—সব চেয়ে বড় কথা: এত অসাবধান হ'য়ে সাধতে গিয়েও যে বাঁধা পড়ি নি—করুণার এর চেয়ে জলন্ত নিদর্শন আর কী হ'তে পারে? কারণ আমি তো জানি নিজের মনের জোরে এ-অসাধ্যসাধন আমার পক্ষে কিছুতে সম্ভব হ'ত না।"

"কেমন ক'রে জানলে?"

"এর উত্তর তোমায় কী ক'রে দেব ছায়া? তবে একটা কথা আজ ব'লে রাখি পরে কোনোদিন হয়ত বুঝবে: যে, যদি আমার মনের গভীরে করুণার উপর বিশ্বাস না থাকত আমি কখনই সাহস পেতাম না তোমার সঙ্গে এতখানি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ চাইতে, এড়িয়ে যেতাম তোমাকে—ভয় পেতাম তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হ'তে। কারণ আমার গুণগ্রাহীরা যাই বলুন না কেন, আমি নিজে তো জানি আমি এখানে কত দুর্বল। এখানে আমার শত্রুরাই সত্যবাদী।"

ছায়া একটু চুপ ক'রে থাকল, পরে হঠাৎ বলল: "তোমার মনে আছে অসিদা—একদিন তুমি একটা কথা বলেছিলে যার উত্তরে আমি বলেছিলাম—'অসম্ভব'?"

"কী?"

"তুমি বলেছিলে তোমার মধ্যে আছে আত্মপ্রতারণা। আমি বলেছিলাম—না, দোষত্রুটি থাকতে পারে মানুষ মাত্রেরই আছে—কিন্তু প্রতারণা—তোমাতে অসম্ভব। সেই কাশ্মীরে? মনে আছে?"

"আছে দিদি।"

ওদের মধ্যে কথার সব ফাঁক যেন ভ'রে যায় নীরবতার কল্লোলে।

* *　　　　* *

*　　　　*

ছায়াই প্রথম ভাঙল নীরবতা, বলল: "অসিদা! আমি তোমার মতন বলিয়ে নই—তাই ক্ষমা কোরো আমি তোমাকে বলতে

পারলাম না ব'লে—যা যা আমি বলতে চাই। কেবল এইটুকু শুনে রাখো যে—কী বলব—আমি মুখে যতটা বলি মনে তার চেয়ে বেশি বুঝি···এমন কি যেখানে বুঝি না ভাবি সেখানে সেই না-বোঝার মধ্যে দিয়েও এমন অনেক কিছু বুঝি· যাকে কথায় বোঝাতে পারি না। এরই একটা হ'ল আমার গান। গানে আমি ডুবে যাই। গান আমার কাছে আনন্দ—সত্য···কিন্তু আনন্দ বলতে আমি যা ভাবতাম তার সঙ্গে মেলে নি। কী একটা খুলে যায় আমার গানের মধ্যে দিয়ে আর আমার 'মন হাত বাড়ায়। কিন্তু অমনি গান যায় থেমে···. আর···আর···সে-ফাঁকটাও বুঁজে আসে···তখন লজ্জাও আসে কিসের জন্যে হাত বাড়াচ্ছি ভেবে।···হয়ত এখানে আমি সত্যিই ছেলেমানুষ আছি তাই এত ভয় হয় পাছে ছেলেমানুষি বে-আব্রু হ'য়ে পড়ে। তাই না তোমাকে বলি আমি আমার একমাত্র গুরু···মুখের কথায় নয় ভাই, বলি আমার প্রতি রক্ত বিন্দু দিয়ে। তোমাকে ব্যথা দিতে বাধ্য হই সেও এই জন্যেই: গানে তুমি আমার কাছে যে-রাজ্যের সন্ধান এনে দিয়েছ তার চেয়ে বড় সন্ধান যতদিন কারুর কাছে না পাচ্ছি ততদিন তার কাছে হাত পাতব না। এইটুকু তুমি বুঝো যখন—যখন আমাকে নাস্তিক ব'লে বিচার করবে—কেমন? বিশ্বাস করতে চেষ্টা কোরো যে, যেদিন আমি বুঝব যে আর কেউ তোমার চেয়েও বড় কিছু আমাকে দিতে পারবেন সেদিন আমি তাঁর কাছে হাত পাতব খুবই সহজে। কেন পাতব না ভাই? আমি তো চাই—মনেপ্রাণেই

অথচ···অসিদা—কী যে আমি চাই—বুঝি আজো জানি না···যদিও কী কী চাই না জানি—খানিকটা অন্তত। তাই জানি—সুখ বলতে যা বোঝায় আমি চাই না—যে-ঠাটে যে-কাঠামোয় সবাই বেশ সুখে থাকে চাই না আমি সে-ঠাট কাঠামো—এতে ভুল নেই। এইখানেই তুমি আমাকে দিয়েছ সব চেয়ে বেশি—কারণ আমি যাঁদের দেখেছি—মানে, কাছ থেকে—তাঁদের মধ্যে এমন কাউকেই দেখি নি যাঁরা এই চলতি ঠাট বা কাঠামো ভেঙে ফেলেছেন এককথায়···মানে—যাঁরা চান জীবনের এক নতুন ঠাট—কাঠামো। তাই আমি তোমাকে গুরু বলি ভাই—শুধু গানের জন্যে ভেবো না—যদিও—" হঠাৎ একটু হেসে—"যদিও একথা তোমাকে যে কোনোদিন মুখ ফুটে বলবার আমার সাহস হবে আমি কি স্বপ্নেও কখনো ভাবতে পারতাম?"

থেমে ও বালিশে কাৎ হ'য়ে শুয়ে হাঁপাতে থাকে। অসিত উদ্বিগ্ন হ'য়ে ওঠে, ও যতক্ষণ বলছিল ও ভুলেই গিয়েছিল ওর অসুখের কথা, কাজেই ওকে সাবধান ক'রে দেবার কথা মনেও হয় নি। কিন্তু ওর দুর্বল শরীরে ঝোঁকের মাথায় এত কথা বলা যে ভালো নয়—মনে পড়ল ওর হঠাৎ হাঁপানি দেখে। বলল উদ্বিগ্ন কণ্ঠে: "কী দিদি? কষ্ট হচ্ছে? দেখ তো, আমারই ফের ভুল হ'ল—"

ও মুখ তুলে হাসল···আশ্চর্য—দেহের ক্লান্তি ওর চোখের উজ্জ্বলতাকে এতটুকুও ম্লান করে নি···এতটুকু ভয়ের চাঞ্চল্য নেই সে-স্থির নির্মল দৃষ্টিপ্রদীপে। বরং মুখের ম্লান পাণ্ডুরতার

পাশে ওর চোখের আলো যেন আরো দীপ্তই হ'য়ে উঠেছে। ও বলে: "কী ক্ষতি ভাই তাতে? মনে করো ফের তোমার নিজেরি কথা—যে, মরণের ছায়ায় যা বলা যায় জীবনের আলোতে বলা যায় না সব সময়ে। ধরো আজ তোমার আমার মধ্যে যে-ধরণের মন-জানাজানি হ'ল সে-ধরণের মন-জানাজানি কোনো আনন্দের আবহাওয়ার মাঝে হ'তে পারত—ভাবতে পারো?"

অসিত ওর মাথায় হাওয়া করতে করতে বলে: "তাহোক ছায়া, তুমি খানিক চুপ ক'রে থাকোতো চোখ বুজে, আমি একটু প্রার্থনা করি।"

"না অসিদা, আমার স্বপ্নের কথাটা তাহ'লে হয়ত বলাই হবে না—কেউ এসে পড়বে—না না তুমি ক্রমাগত অতশত ভাবো কেন? এরকম হাঁপাই আমি চব্বিশঘণ্টাই দেখো নি কি স্বচক্ষেই—একটু কম আর বেশিতে কী আসে যায় বলো? শোনো স্বপ্নটা—একটু জল দেবে ভাই?"

অসিত একটু জল এনে ধরল। ও এক চুমুক দিয়েই বলল: "হয়েছে। আমার খুব কাছ ঘেঁষে বসবে ভাই? আরো ঘেঁষে। —জানো অসিদা, আমার এখানে ভারি একটা দুর্বলতা আছে। যাকে আমি যত ভালোবাসি তার তত কাছ ঘেঁষে বসতে চাই—আমার আদুরী কলঙ্ক রটেছে কি সাধে?"

অসিত হেসে বলে: "তোর মুখে কলঙ্ক কথাটা শুনে ভারি মজা লাগে আমার—জানিস? কেমন মজা লাগে—বলব?"

ছায়া শুধু তাকিয়ে ভঙ্গি করল, ভাবটা: "কেমন?"

"যেমন মজা লাগে যখন তোরা আমাকে বলিস জ্ঞানী।"

"ফে—র ?"

"ফের না রে। ভক্ত বললেও বুঝতাম।"

"অসিদা! কেন আমাকে তাতাচ্ছ কেবল কেবল? ভক্ত আমি ঢের দেখেছি—যাঁরা কেবল কেঁদে ভাসাতেই জানেন। জ্ঞান বিনা শুধু ভক্তির জোরে কেউ কথা বলতে পারত তোমার মতন? ঈ—শ্! না—অসিদা, রাগ কোরো না ভাই, আমাকে পোষ মানানো খুব সহজ নয় এ তো জানো ভুক্তভোগী হ'য়ে?"

"জানি, কিন্তু একথা এখানে আসে কোথেকে?"

"এই থেকে যে শুধু নির্ভেজাল ভক্ত হলে তার কথায় কান দেব এমন পাত্রীই আমি নই। তোমার কথায় কোন্ জিনিসটা আমাকে কাবু করে বলব?"

"একটু—আস্তে—দিদি।"

"আঃ। আজ ওরকম কোরো না—বলা তো আমার পায় না এরকম। কিন্তু কী বলছিলাম? ঐ দেখ—বাধা দিলে খেই হারিয়ে যায় এত।" বলে ও কাঁদ কাঁদ সুরে।

"আচ্ছা আচ্ছা—কেবল একটু র'য়ে স'য়ে ভাই—লক্ষ্মীটি।"

"রাখো ওসব। এখন ধরিয়ে দেবে—কী বলছিলাম আমি?"

"বলছিলি আমার কথায় কী জিনিসটা তোকে কাবু করে।"

"ও—হ্যাঁ।" ব'লে ও হাসে কেমন যেন একরকম হাসি, তার পরেই গম্ভীর হ'য়ে যায়, বলে: "তোমার একদিনের একটা কথা বলি শুধু। মনে আছে সেই বাপী যেদিন মারা গেল—আমি

রাতে সিলেটে তোমার কাছে শুয়ে কেবল কাঁদছিলাম তোমার গলা জড়িয়ে ধ'রে? সেদিন আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম খু—ব রাগ ক'রে, মনে আছে কি তোমার?"

"না।"

"মনে নেই? সে—ই? আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আকাশের ভগবানের শক্তি যদি থাকে থাকুক, কিন্তু তাঁর করুণার কথা কেন বলে মানুষ--বাপীর মতন লোক কি তাহ'লে এভাবে মরে?"

"মনে পড়েছে।"

"তাতে তুমি কী উত্তর দিয়েছিলে মনে আছে, না সেটাও ভুলে গেছ?"

অসিত আদর ক'রে বলে: "তোর কাছেই শুনি।"

"তুমি বড় বড় কথা বলো নি—শ্লোক আওড়াও নি, শুধু বলেছিলে কি এক পোলদেশের কবির একটি সুন্দর নাটুকে গল্প। গল্পটি এই যে, ভগবান যখন জীবজন্তু মানুষকে সৃষ্টি ক'রে পাঠালেন পৃথিবীতে—তখন তার খাবারের ব্যবস্থা করতে নিশুত রাতে চুপিচুপি এক রাশ শস্যের বীজ ছিটিয়ে দিলেন। ভোরবেলা শয়তান উঠে দেখে—অগণ্য বীজ প'ড়ে রয়েছে যেখানে সেখানে। তখন বহু গবেষণা ক'রে সে ঠাওরাল যে নিশ্চয়ই ঐ দুষ্টু ভগবানটার কীর্তি—হয়ত এতে ক'রে জীবজন্তুর উপকার হবে—কে বলতে পারে? তাই মাথায় তার এক ফন্দি গজালো: সব বীজগুলো সে ফেললো পুঁতে। ফলে ফসল ফলল দেখতে দেখতে। গল্পটির শেষে তুমি বলেছিলে যে এটা শুধু একটা মজার গল্প নয়—ভগবান সত্যিই এমন কি শয়তানের

অজান্তেও তাকে দিয়েই রকমারি কাজ হাসিল করিয়ে নেন নিত্যনিয়ত, কিন্তু হলে হবে কি, আমাদের চোখ কেবল বাইরের দেউড়িতেই পড়ে বাঁধা—কোনো কিছুরই অন্দরমহলে ঢুকতে পারে না—কাজেই ওপর ওপর বিচারের পথে আমরা কেবল জগতের দুঃখ কষ্ট মন্দটাই দেখি—কিন্তু মন্দের ফলেও যে ভালোর ফসল ফলে সেটা দেখতে হ'লে চাই জ্ঞান। দেখছ অসিদা, কত মন দিয়ে শুনি আমি তোমার কথা ?”—ব'লে একটু দম নেয় ফের, তার পরে বলে: “এই জিনিষটাই আমাকে পোষ মানায়—তুমি জানো না অনেক সময়েই আমার মনের মধ্যে কী গুম্‌রে গুম্‌রে ওঠে জগতের দুঃখ কষ্ট অবিচার দেখে। ভাবি—এর পরেও যারা ভগবানের অপার করুণার কথা বলে তাদের হৃদয় থাকতে পারে কিন্তু চোখ আছে বলা যাবে কেমন করে? কিন্তু তোমার এই ধরণের কথায় আমি বোকা ব'নে যাই—এ যে কতবার হয়েছে! আজ আবার সেই একই অস্ত্রে তুমি আমাকে বাগ মানালে। না, শুধু আজ ব'লে নয়—ক-দিন ধরেই মনে হচেছ কেবল তোমার কত কথা। আজ ফের যখন শুনলাম তুমি কত দুঃখ পেয়েছ অথচ তবু প্রতি দুঃখেই পেয়েছ যাকে বলছ করুণা···তখন···কী বলব···এত ভক্তি হয় যে ভয় করে তোমাকে আপনজন ভাবতেও।”

অসিত ওকে আদর ক'রে হেসে বলে: “কিন্তু একটা কথা তুই উল্টো বললি এবার—ভয় করার কথা এখন তোর নয়—আমার। কারণ এখন তো শুধু গানে নয়—বাক্যেও যে তোর বিদ্যে দেখি প্রায় গুরুমারা হবার কাছাকাছি।”

ছায়া ওর হাতে চাপড় মেরে বলে রাগ ক'রে: "যা-ও। ঐ ঐ—তোমার আর একটা অস্ত্র—ঠাট্টা, যাতে আমাকে তুমি বেকায়দা করো। তোমার হাতিয়ার কি একটা অসিদা? কিন্তু তোমার সব চেয়ে বড় অস্ত্র কী—তুমি জানো না—জানি আমি।"

"শুনি।"

"বলো তো কী?"

"গান?"

"দুয়ো। হেরে গেলে।"

"তবে?"

"ওর মিলটা কি?"

"ও। জ্ঞান?"

"দুয়ো। ফের হেরে গেলে। আর একটা মিল আছে। এবার হয়ত পারবে—চেষ্টা করো।

অসিত হেসে বলে: "বার বার তিনবার দুয়ো সইতে পারবো না দিদি হার্ট ফেল করবে, তুই-ই বল্।"

"প্রাণ। তোমার গানই বলো আর জ্ঞানই বলো—কিছুই লাগে না তোমার প্রাণের কাছে। বলো তো—হুবহু ধরি নি আমি?"

অসিতের এবার চোখে জল উপছে পড়ে, কোনোমতে সাম্লে বলে মুখে মিথ্যে হাসি টেনে: "আমার ছোট্ট নয়নতারা আজ হঠাৎ গগনতারা হ'য়ে উঠলেন কোন্ যাদুতে শুনি?"

"ঐ একটিরই ছোঁয়াতে। নৈলে কি আমার মতন মেয়ে এমন অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে? তা তুমি বলতেই দিলে না তার কথা—কী করব?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ বল্।

"বলব বৈ কি। যেমন খালি খালি বলবে—চুপ চুপ চুপ!—কক্ষনো বলব না। খুব হয়েছে, বেশ হয়েছে—শুনতে পেলে না কী স্বপ্ন দেখেছিলাম। তুমিই ঠকলে।"

"কখন দেখলি স্বপ্ন?"

"বললাম না? সকাল বেলা।"

"কী দেখলি বল্ ভাই লক্ষ্মী দিদি আমার। শাস্তি দিয়ে কি তোদের আশ মেটে না?"

ছায়ার চোখ হঠাৎ ছলছলিয়ে ওঠে: "অমন কথা বলে? রোসো—আমি বলছি। আর একটু জল—ভাই।"

অসিত জল দিল।

ছায়া একটু চুপ ক'রে কাৎ হ'য়ে থাকে চোখ বুঁজে—অসিতের হাত দুটো নিজের দুই মুঠোয় চেপে ধ'রে। তার পর ওর চোখের পানে তাকায়। সে দৃষ্টিতে দুষ্টুমির আর লেশও নেই··· গভীর উদাস নির্মল দুটি দীপশিখা—শ্রান্ত অথচ নির্বিষণ্ণ··· অসিত মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থাকে।

"কী দেখছ?"

"এ চোখ স্বপ্ন দেখবার জন্যেই গড়া। কিন্তু আর বলব না—তুই বলবি ঠাট্টা, কি যা—ও। বল্ স্বপ্নটা।"

"দেখলাম"···বলে ও থেমে থেমে থেমে···"যেন তুমি পাশে ব'সে প্রার্থনা করছ···যেমন রোজই করো না? ঠিক তেম্নি—ঐ পাশের খাটে ব'সে। তোমার পাশে মা ঘুমচ্ছে অঘোরে

যেমন প্রায়ই ঘুময় শেষ রাতে ক্লান্ত হ'য়ে—বেচারি। আমিও ঘুমচ্ছিলাম। হঠাৎ যেন উঠলাম জেগে। সত্যিকার জাগা নয়. অবিশ্যি—ঘুমের মাঝেও যেমন অনেক সময়ে জেগে উঠি না? সেই রকম জাগা। অর্থাৎ স্বপ্নেই দেখছি যেন ঘুমচ্ছিলাম—পরে ফের যেন জাগলাম—অথচ সত্যি সত্যি জাগি নি—বুঝেছ কী বলছি?"

"তার পর?"

ছায়া বলে আরও মৃদু সুরে: "হ্যাঁ। স্বপ্ন দেখছি--যেন ঘুমের মাঝেই উঠেছি জেগে—এটা বুঝে নিয়েছ তো? আচ্ছা। তার পরে দেখছি কি--তুমি প্রার্থনা করছ। শুধু দেখছি না—স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি প্রার্থনার কথাগুলি।"

অসিত চম্‌কে ওঠে, বলে সাগ্রহে: "কী শুনলি বল্‌ তো?"

ছায়া বলে: "শুনছি তুমি ডাকছ—আমি নিরাশ্রয়, বলছ বাপী তোমাকে বলেছিল আমায় দেখতে কিন্তু তোমার শক্তি নেই তো। তাই ভগবানকে ডাকছ—তাঁর যে-করুণা তুমি পেয়েছ সে-করুণা যেন আমিও পাই। আহা। কী সুন্দর যে সে-প্রার্থনা! সাধে বলি ভাই তোমার প্রাণের কথা?" চোখে ওর জল আসে ফের।

অসিতেরও চোখ অবাধ্য হ'য়ে ওঠে প্রায়, অতিকষ্টে সাম্‌লে ওর চোখের জল দেয় মুছিয়ে। বলে গাঢ় স্বরে : "তার পর?"

"তার পর কী হ'ল ভালো মনে নেই···তবে এইটুকু মনে আছে যে···খুব একটা শান্তি এল। সে যে কী অপূর্ব শান্তি

অসিদা! সমস্ত তাপ যেন গ'লে···কী বলব···আলো হ'য়ে গেল···ঠাণ্ডা আলো। যতদূর মনে আছে যেন নীলরঙের আলো ···অথচ যে নীল রঙ আমরা দেখি সে-নীল নয়···কী ক'রে বোঝাব জানি না···তবে সে বড় নিখুঁৎ আলো ভাই। আহা! এই দেখ তার কথা মনে করতেও গায়ে আমার কী রকম কাঁটা দিয়ে উঠেছে—আমি জানি তোমার প্রাথনার ডাকেই এসেছিল এ-আলো।"

অসিত ওর চোখ মুছিয়ে দেয় ফের: "তারপর?"

"দাঁড়াও, মনে করি। তার পর যেন···কী একটা মন্ত্র শুনলাম—মনে নেই···তবে তার মধ্যে 'শান্তি' কথাটা ছিল···তার পর···দেখলাম···সে কী সুন্দর যে অসিদা!"

এবার অসিতেরো গায়ে কাঁটা দেয়, বলে: "একটি হাত?"

"হ্যাঁ। কী ক'রে জানলে?"

"বল্ তুই। আমি পরে বলব।"

ছায়া ব'লে চলে আরো গাঢ় স্বরে: "সে যে কী সুন্দর হাত ভাই···অপূর্ব রঙ···তার চারদিকে ঐ নীল আভা কিন্তু হাতটা যতদূর মনে পড়ছে কাঁচা সোনার রঙ···অথচ··· সে রকম রঙ আমি কক্ষনো চোখে দেখি নি। আরো আশ্চর্য··· সেই হাতটা আস্তে আস্তে এসে যেন ঠেকল আমার মাথায়। অমনি আমার শরীরের সব অস্বস্তি, সব হাঁপানি, সব যন্ত্রণা যেন জুড়িয়ে জল হ'য়ে গেল। সত্যি বলছি···বিশ্বাস কোরো— যা—ও, তুমি বিশ্বাস করছ না, হাসছ—'কী ছেলেমানুষি উচ্ছ্বাস' ব'লে।"

"না ছায়া। কারণ তখন আমি তোরই পাশে ব'সে।"

"কখন?"

"আজ সকালবেলা। আর ঠিক ঐ প্রার্থনাই আমি করছিলাম হাতটাও দেখেছিলাম—অবিশ্যি স্বপ্নে নয়—ধ্যানে।"

"ও মা! সত্যি?"

"তোর গা ছুঁয়ে বলছি দিদি।"

"এতক্ষণ বলো নি কেন?"

"জানিস না—কেন?"

"আমি বিশ্বাস করব না ব'লে? ছি অসিদা, আমি স্বপ্নটা না হয় বাদ দিতাম ভক্তের বা কবির কল্পনা ব'লে: কিন্তু তুমি যে দেখলে এর মূল্য কি আমার কাছে কমতে পারে ভাই? এটুকু তোমাকে কোনোদিনই বোঝাতে পারলাম না।"

"কেন ভাবছ পারো নি?"

"পেরেছি অসিদা? সত্যি?"

"না হ'লে কি আশ্রম ছেড়ে তোমার কাছে এসে দুদিনও থাকতে পারতাম—মনে করো তুমি?"

ছায়া ওর চোখের দিকে চেয়ে রইল চুপ ক'রে—তারপর ঠোঁটদুটি উঠল কেঁপে—কিন্তু ঐ পর্যন্ত।

অসিত বলল: "কী?"

ছায়া হঠাৎ বলে: "অসিদা ভাই, একটা কথা রাখবে আমার? রাখতেই হবে, আমার শে— না, অনুরোধ। কিন্তু বলো রাখবে? কথা দাও।"

"কী ?"

"ভয় নেই। তুমি যা ভাবছ তা নয়। শোনো লক্ষ্মীটি, অসিদা, আমি চাই না যে তুমি আর থাকো আশ্রম ছেড়ে। অন্তত আমার জন্যে।"

"কেন ছায়া ?"

"না। আমার ভালো লাগে না। আমাকে ভুল বুঝো না কিন্তু ফের। বলো বুঝবে না ?"

"এত কথার পরেও ?"

"জানি অসিদা—"ওর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে—"তবে···অভিমান আমাদের দিয়ে কত কিছু বলিয়ে করিয়ে নেয় জানোই তো ভাই। সেইটে আর হ'তে দিও না—কিছুতে না। কথা দাও।"

অসিত মুখ নিচু ক'রে থাকে একটু—তার পর বলে : "দিচ্ছি।"

ছায়া ওর দুটো হাতই টেনে নেয় নিজের দুহাতের মধ্যে, বলে : "আর—একটা কথা শুধু···শেষ কথা। বলো রাখবে ?'

"রাখব দিদি !"

"আমার জন্যে দু:খ কোরো না। কখনো মনে করতে পাবে না যে তুমি আমাকে আনন্দ ছাড়া আর কিছু দিয়েছ। বলো মনে করবে না ?"

"একথা উঠল কেন দিদি ?"

ছায়া ওর চোখের দিকে খানিক তাকিয়ে রইল চুপ ক'রে, পরে বলল : "কেন জানো না ?"

"না।"

"কারণ··· আমি যে ভুলতে পারি না তোমাকে কত দুঃখ দিয়েছি।"

এ কি সেই ছায়া? অসিত কথা খুঁজে পায় না। ছায়া বলে থেমে থেমে : "শোনো অসিদা। ক্ষমা চাইব না ঘটা ক'রে···কেন না তুমি এটুকু অন্তত জানো যে, যে-দুঃখ আমি তোমাকে দিয়েছি শুধু যে ইচ্ছে ক'রে দিই নি তাই নয়··· না দিয়ে আমার উপায় ছিল না। আর কেন উপায় ছিল না তা-ও তুমি জানো। জানো না?"

"দুঃখ তুমি আমাকে দাও নি দিদি, তবে—"

"ওসব ছেলেভোলানো কথা আজ নয়—অসিদা, লক্ষ্মীটি। দুঃখ না দিয়ে পারি?···যার জন্যে তুমি সব ছেড়েছ···তার ডাক আমি শুনতে পাই নি এ-দুঃখ তোমাকে বাজবে না তো বাজবে কাকে শুনি?"

অসিত চুপ ক'রে থাকে।

"কিন্তু অসিদা—"

"কী!"

"সে-ডাক আমি শুনতে পাই নি মানি। কিন্তু কিছুই যে পাই নি তা-ও নয়। যদিও কী যে পেয়েছি--তার খবর দিতে গেলে আমাকে—" ও হেসে ওঠে--"অর্থাৎ কেঁচে গণ্ডূষ ক'রে সেই শিশু ছায়া হ'তে হবে, মানে--বলতেই হবে ফের : বো—ঝা—তে পারি না।"

অসিতও হাসে স্নিগ্ধ হাসি : "কিন্তু এখন আর ওকথা কেন দিদি? কাল যা সত্যি ছিল আজ তো আর সত্যি নয়।"

ছায়া মাথা নাড়ে: "সত্যি—সমানই সত্যি অসিদা, বিশ্বাস কোরো। কারণ…কারণ…কী ক'রে বোঝাবো সেকথা—যাকে ছুঁতে পাই অথচ…অথচ…ধরতে পারি না।"

"তবু?"

ছায়া গুন্ গুন্ ক'রে ধরে:

"আমি চাহি গভীরে
তব অকূল স্বনে
ঘন তুফানতীরে
ধ্রুব তারা-স্বপনে।"

ব'লেই থেমে: "কিন্তু এ-গানটির কোন্ কথাগুলি আমার সবচেয়ে ভালো লাগে বলো তো দেখি?"

অসিত ওর কপালে হাত বুলোতে বুলোতে হাসে, তারপর উত্তর দেয় গুন্ গুন্ ক'রে:

"এসো ছায়া-পাথারে—"
দলি' মায়া-আঁধারে—

ছায়া ওর হাতে চিম্‌টি কাটে: "এখনো দুষ্টুমি?" মৃদু হেসে: "আমি কি তুমি অসিদা, যে সব তাতেই নিজের নামের ধুয়ো শুনতে চাইব? না, সে-অধিকারই আমার আছে? শোনো—আমার ভালো লাগে সব চেয়ে এর সঞ্চারীটা—" ব'লেই ধরে ফের গুন্‌গুনিয়ে:

"তুমি জানো তা প্রিয়,
মোর প্রাণ-দুরাশা

যাচি শুধু অমিয়,
তাই বহি পিপাসা।

—বুঝলে কি এবার কী আমি পেয়েছি—আর তোমারই—না রাগ করতে পারবে না আজ—আর কারুর আশীর্বাদে এ আমি মানুব না—শুধু তোমারই আশীর্বাদে।"

অসিতের চোখের জল আর বাধা মানে না।

ছায়া ওর গালে মাথায় কপালে হাত বুলোয়: "ছি অসিদা—দোষে তুমিও—"

পিছনে পায়ের শব্দ। অসিত তাড়াতাড়ি চোখ মুছে স্থির হ'য়ে বসে।

ছায়া চেঁচিয়ে বলে: "কে? কমলাদি? এসো না ভাই।"

কমলা ঢুকে স্নিগ্ধ স্বরে বলে: "হ্যাঁ। ডাক্তারদের কনসাল-টেশন শেষ হয়েছে। তাঁরা আসছেন সবাই সদলবলে।" ব'লেই অসিতকে: "কিন্তু ঘরে এইমাত্র যেন গুন্‌গুন্ শুনলাম না?"

ছায়া সকৌতুকে ব'লে ওঠে: "কেমন ঠকিয়েছি। অসিদা বেচারিকে একলা পেয়ে শুনিয়ে দিয়েছি গান—আর কোন্‌টা জানো?" ব'লেই ধরে গুন্‌গুন্ ক'রে:

তুমি জানো তো প্রিয়—
মম প্রাণ-দুরাশা
যাচি শুধু অমিয়—"

"ও মা গো মা!"

অসিত বিষম চমকে ওঠে—প্রমীলার এত উচ্চকণ্ঠ সে আর শোনে নি।

অদূরে প্রমীলা, পাশেই নির্মল। হাতে তার টর্চ। পিছনে পরাণ। ডাকবাংলোর পাহাড়ি চাকরটার হাতে একটা প্রকাণ্ড লণ্ঠন।

"কী হয়েছে?" বলে অসিত।

"কী আর হবে?" বলে নির্মল "ও ভেবে ব'সে আছে—তুই আর নেই এ ভূভারতে—"

প্রমীলা বলে রাগ ক'রে: "তা ব'লে অসুস্থ মানুষটা কোথায় গেল হুট ক'রে বেরিয়ে একটিবারও খোঁজ না নিয়ে সারাদিন শুধু rocking chair-এ দুললেই চলবে বলতে চাও? চমৎকার বন্ধু বটে!"

নির্মল হেসে বলে: "অসিত, আমার কিন্তু দোষ নেই ভাই। আমি ওকে কত বোঝালাম কত চোখা চোখা যুক্তি দিয়ে—"

"কী বোঝালে শুনি?" বলে প্রমীলা ঝংকার দিয়ে।

"যে ছেলেরা মেয়ে নয়—একলা থাকতেও চায়।"

পরাণ বলে: "সাধুদাদা আর দেরিটি নয় গো। ঐ মেঘ বাবাজি যে ফুল্যা উঠছেন—"

অসিত বলে: "তাই তো বটে!—কখন মেঘ ক'রে এল খেয়ালই করি নি—চল্ চল্—"

পথে ওরা দ্রুত চলে—কিন্তু বৃথা। ঝড় ওঠে—হঠাৎ—পাহাড়ে ঝড়। গাছগুলো হ'য়ে ওঠে উতলা।

প্রমীলা বলে: "এই ওয়াটার প্রুফটা পরো অসিদা, লক্ষ্মীটি।"

অসিতের কানে যায় না। ওর চোখে ভেসে ওঠে একটি স্নিগ্ধ উদাস রোগপাণ্ডুর মুখ···চোখে যার এক আশ্চর্য আলো— মৃত্যুর সর্বগ্রাসী ছায়াও যাকে পারে নি ঢাকতে···আর কানে বেজে ওঠে একটি অপরাজেয় কণ্ঠ—যা আর কোনোদিন বেজে উঠবে না ওর প্রাণের আকাশে বাতাসে:

"যাচি শুধু অমিয়

তাই বহি পিপাসা"···



দিলীপকুমারের গ্রন্থাবলী

উপন্যাস : মনের পরশ, দুধারা, রঙের পরশ, বহুবল্লভ, দোলা, তরঙ্গ রোধিবে কে, আশ্চর্য, নানারূপী, ছায়ার আলো, THE DELIVERANCE (শরৎচন্দ্রের "নিষ্কৃতি"-র অনুবাদ)। THE UPWARD SPIRAL (যন্ত্রস্থ)

কবিতা : অনামী, সূর্যমুখী, দিনে দিনে, প্রতিদিনের তীরে, ভাগবতী কথা, ভাগবতী গীতি, Eyes of Light (যন্ত্রস্থ)

প্রবন্ধ : ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকা, ভূস্বর্গ-চঞ্চল, সাঙ্গীতিকী, ছান্দসিকী, তীর্থঙ্কর, শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে, এদেশে ওদেশে, আবার ভ্রাম্যমাণ, উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল, AMONG THE GREAT, THE SUBHASH I KNEW.

স্বরলিপি : গীতশ্রী, নবগীতিমঞ্জরী

নাটক : আপদ, জলাতঙ্ক, শাদাকালো, FALL OF MEVAR (দ্বিজেন্দ্রলালের "মেবার পতন"-এর অনুবাদ)